



તાવાણ જાતકાલ



અપકા

અજક



ଅମରକମ୍ପା ଅଜହତା

[ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୁରସ୍କାର-ସନ୍ତ ୧୯୭୧]

ନାରାୟଣ ମାନ୍ୟାମ

ଡା ର ଡୀ ରୁ କ ମ୍ ଟ ଲ

ଅକାଶକ ଓ ପୁସ୍ତକ-ବିକ୍ରେତା

ରମାନାଥ ମଜୁମଦାର ସ୍ଟ୍ରିଟ୍, କଲିକାତା-୨

প্রকাশক :

শ্রীকৃষ্ণীকেশ বারিক

৬, ব্রহ্মনাথ মহম্মদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৮

তৃতীয় সংস্করণ : ১৯৭৩

মূল্য পঞ্চমক দ্বিক্রা মাত্র

মুদ্রক :

শ্রীবংশীধর সিংহ

বর্ণ মুদ্রণ

৯২, ময়েন সেন কোয়ার্টার, কলিকাতা-৯

কৈফিয়ৎ

দেবদূতরাও যেখানে সম্ভর্ণ পদসন্ধারে সঙ্কুচিত, সেখানে কেন ছড়মুড় করে ঢুকে পড়েছি, তার কৈফিয়ৎ দিতে বসে প্রথমে সেই দেবদূতদেরই কৈফিয়ৎ দাবি করার ইচ্ছা জাগছে। পৃথিবী যদি আজ, ভারতবর্ষকে জিজ্ঞাসা করে তোমার ওখানে কোন্ স্থাপত্য-কীর্তি দেখতে যাব, ভারতবর্ষ বোধ করি তার উত্তরে বলবে—অজস্তা-ইলোরা, কোণারক আর তাজমহল। পৃথিবী আজও তাই দেখতে ভারতবর্ষে আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, সেই অজস্তাকে দেখাবার, বোঝাবার কোন আয়োজন আমরা আজও করি নি। অজস্তায় প্রতি বছর লক্ষাধিক দর্শক আসেন, অজস্তার নামে সরকার লক্ষাধিক মুদ্রা প্রতি বছর ব্যয় করেন, তবু অজস্তা-বিষয়ে প্রকৃত গাইড-বই এখনও ছাপা হয় নি। প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে প্রকাশিত ডঃ ইয়াজদানীর যে গ্রন্থটিকে অজস্তা-বিষয়ে শেষ প্রামাণিক পুস্তক বলতে পারি তা দীর্ঘদিন ছাপা নেই; তার মূল্যও বোধ করি সহস্র রজতখণ্ড। ভুল তথ্যে-ভরা কিছু নিয়মানের পুস্তিকামাত্র অজস্তার কাছে-পিঠে পাওয়া যায়। ইউনেস্কোর এ্যালবামে অথবা আকাদেমী প্রকাশিত চিত্র-সম্ভারে কিছু ভালো ছবি আছে; কিন্তু তাদের কোন পরিচয় নেই। জাতক-কাহিনীগুলির সঙ্গে ঐ চিত্রগুলির কি সম্বন্ধ, কোথায় তাদের অবস্থিতি তা উপলব্ধি করা যায় না। ডাব-না-করা ফেলিনি বা বেয়ারিম্যানের চলচ্চিত্র দেখে আপনি, আমি যতটা রস গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবী আজ ডলার-রুবল্-ফ্রাঁস্টালিনের বিনিময়ে শুধু ততটাই রস আহরণ করে নিয়ে যায়।

বিদেশীদের কথা যাক। সে দায়িত্ব ভারত সরকারের; কিন্তু ভ্রমণ-পাগল অগণিত বাঙালী যাত্রীকে আমি অজস্তায় দিশেহারা হয়ে ফিরতে দেখেছি। চম্পেয়া-জাতকের মর্মস্পর্শী চিত্রকে সাপুড়ের ছবি বলে হেসে ওড়াতে স্বকর্ণে শুনেও এসেছি। অজস্তার পূর্ণ-রসাস্বাদনের সহায়ক কোন নির্দেশক গ্রন্থের অভাবে তাঁদের অপরিসীম অনুশোচনাও অনুভব করেছি।

চিত্র-শিল্প, স্থপতি ও ইতিহাসের উপর যাদের প্রকৃত অধিকার আছে, সেই দেবদূতদের কেউ যাত্রীদের সে অভাব মোচন করতে আজও এগিয়ে আসেন নি বলেই অনধিকারী, বর্তমান গ্রন্থকারের এই মূর্খামি।

আমার সবচেয়ে সঙ্কোচ, সবচেয়ে আপসোস চিত্রগুলির যথার্থ অনুকরণের ব্যর্থতায়। অসিত হালদার, নন্দলাল, ডরোথি লার্চাব প্রভৃতির আঁকা-ছবির পাশাপাশি আমার স্কেচগুলিকে দেখে বারে বারে মনে দ্বিধা জেগেছে এগুলির ব্লক আদৌ করানো উচিত কিনা। কিন্তু গ্রন্থকারের অসহায়ত্বের কথা বিচার করে পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, এটুকু ভরসা রাখি। প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে কটো নিয়ে ব্লক করানো প্রায় অসম্ভব, কোন প্রকৃত অধিকারী চিত্র-শিল্পীকে দিয়ে এগুলির অনুকৃতি করালে এ পুস্তকের মূল্য বোধ করি চতুগুণ বৃদ্ধি পেত এবং যে ভ্রমণ-বিলাসী মধ্যবিত্ত বাঙালী রসপিপাসুর জন্ম বইটি লিখতে

বসেছি, তাঁদের নাগালের বাইরে চলে যায়। তাই আমি সবিনয়ে নিবেদন করব, আমার আঁকা ছবিগুলিকে পাঠক যেন শুধু নির্দেশক-চিত্র বা 'ইণ্ডিকেটরি-স্কেচ'-রূপেই গ্রহণ করেন। মূলের নাগাল না পেলে অন্ততঃ গ্রিফিথ, হেরিংহাম, ইয়াজদানী অথবা ইউনেস্কো এ্যালবামে খুঁজ নেবাব জন্মই যেন শুধু আমার স্কেচগুলিকে কাজে লাগানো হয়। আমার আঁকা স্কেচ দেখে মলচিত্রের বিচার করতে বসলে অজন্মাব তো বাটেই, আমার উপবেও অবিচার করা হবে।

একই কারণে কোন বহু-বঙা চিত্রের সংযোজন করা গেল না।

ভজন্তা অতি দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের পথে চলেছে। আজ যা আছে হয়তো দশ বছর প. তাও থাকবে না। এ অবক্ষয়ের কাবণ নির্ণয় করবেন বিশেষজ্ঞরা, তাব গতিবোধ করবেন ভাবত সবকার। আমি শুধু শতাব্দীর দুই পাবের দুটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ প্রসঙ্গের ছেদ টানব। প্রথমটির লেখক স্যার জেমস্ ফাণ্ডসন (*Cave Temples of India by Fergusson & Burgess, London 1880, P.-312*)। গত শতাব্দীর শেষপাদে তিনি লিখেছিলেন :

"Mr. Griffiths proposed years ago that doors and shutters should be employed to shut out bats and nest-building insects from the few Caves that contain much painting, but this excellent suggestion was only carried out in the case of Cave I."

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দেও আমি দেখে এসেছি ঐ প্রথম বিহার পাব হয়ে দ্বিতীয় বিহারে এ পঁচাশি বছরের মধ্যেও হাত পড়ে নি। অল্প কোন গুহায় আজও কাঠের দরজা বা জানালা তৈরি করে বলাবালি ও পাখাদের গতিরোধ করা হয় নি। মনুষ্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু স্মৃতিব্য ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফাণ্ডসন ষোলটি গুহায় চিত্র দেখতে পেলেন ও-কথা বলেছিলেন, ১৯৬৫-তে আমি দেখে এলাম মাত্র চাবটিতে। বাবোটি গুহাব চিত্র শেষ হয়েছে এই পঁচাশি বছরে !

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি স্টেটস্ম্যান পত্রিকায় ৯/৮/১৯৬৫-তে প্রকাশিত একটি সংবাদ :

"New Delhi, Aug 8th—A UNESCO Mission which toured India recently recommended the use of modern techniques for preservation of murals and sculptures of Ajanta and Ellora Caves, says U. N. I. The Mission consisted of Mr. Harord Plenderleith, Director of International Centre for the Preservation & Restoration of Cultural Property & Mr Paul Coremans, Head of Belgium's Royal Inst. for the Preservation of Cultural Property. Mr. Coremans has since died."

"In its report the Mission has said that the Paintings at Ellora and Ajanta have suffered deterioration both from natural causes and at the hands of restorers. The report says that some of the paintings and murals have suffered because of defective techniques, over-restorations of sculptures and architectural elements, scrapping, smudging and over-painting on the frescoes. Bulk of the

damages has, however, been caused by the *weathering* of facades, cracks and seepage of water, crystallization of salt and the staining of murals because of *smoke and heat*. The Mission has suggested investigation on and paintings by microscopy and microchemistry to reveal the underlying strata of murals showing whether there is more than one layer of painting, the depth of vernishes, impregnants and such other details, examination by ultra-violet fluorescence and by infrared photography and a complete humidity survey of the Caves by surface measurements at different seasons of the year. In addition there should be a scientific diagnosis of the structure, composition and condition of the walls and materials."

"The Mission has also submitted to UNESCO proposals to set up a system of museum laboratories and a regional Centre for South Asia to train technicians specialising in conservation methods." (ইটালিক্স অক্ষর বর্তমান লেখকের)

এ সম্প্রদায় আমার চিত্রশাস্ত্র এ নয় যে, এইসব বিজ্ঞান-ভিত্তিক নির্দেশনায় কতটা কর্ণপাত কবা হুবেছে . পবস্তু আমার প্রশ্ন . যে চিত্রগুলি এখনও অবশিষ্ট আছে তার হাত কয়েক দূর দিয়ে অন্ততঃ একটা কবে কাঠের বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা কবা যায় কিনা ! অসংখ্য যাত্রীকে আমি দেখেছি হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পবখ কবতে—ছবি থেকে রঙ উঠে আসে কিনা । অযুত যাত্রীকে আমি দেখেছি ছবি-আঁকা দেওয়ালে পা তুলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আরামে সিগারেট ধবাত্তে । না, গুহাব ভিতর ধূমপানে আপত্তি নেই । অজস্র গুহা তো সবকাবী বাস অথবা পবিত্র সিনেমা-গৃহ নয় !

অজস্র সম্বন্ধে লিখতে বসে মনে যে সব প্রশ্ন জেগেছে এবং যাব সমাধান আমি নানা গ্রন্থ হাতড়ে খুঁজে পাই নি, তা প্রকৃত পণ্ডিতের উদ্দেশ্যে প্রশ্নবোধক চিহ্নকপেই আমি বেখে গোছ । কেউ যদি অনুগ্রহ কবে আমার সন্দেহ নিবসন কবেন বাধিত হব এবং এ গ্রন্থের যদি কখনও সংস্করণ হয়, সে-সব তথ্য স যোজন কবতে পাবব ।

সবশেষে বলব মুদ্রাকব প্রমাদেব কথা । তাব জন্যে আমিই একান্তভাবে দায়ী । যে কাবণে কোন বিদগ্ধ চিত্রকবকে দিয়ে চিত্রগুলি আঁকিয়ে নিতে পাবি নি, সেই একই কাবণে প্রফ দেগাব দায়িত্ব নিজে গ্রহণ কনেছিলাম . দুখ শুধ এটুকুই যে, এত কবেও বর্তমান বাজারে বইটির মূল্য এমন একটি অঙ্কে নামাতে পাবি নি যাতে নিয়মপাবিত ভ্রমণ-পাগল বাঙালীর নাগালেব মধ্যে থাকে ।

নারায়ণ সান্যাল

বাসটা আমাকে অজস্ৰ-গুহামুখেৰ সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল তাৰ গন্তব্য পথে। সে বাস থেকে নামলুম আমি একাই। বা-বগলে বাগিয়ে ধৰেছি বেডিংটা, ডান হাতে স্যুটকেস। কয়েকদিন থাকতে হবে এখানে। হঠাৎ স্থিৰ কৰেছি সেটা—রিসার্ভেসান কবানো নেই কোথাও।

গুহা-মন্দিৰেৰ দৰজা খোলে সকাল ন'টায়, বন্ধ হয় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় লক্ষ্য কৰে দেখি, ইতিপূৰ্বেই খান চাব-পাঁচ মোটৰগাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে। অৰ্থাৎ আমাৰ আগেই এসেছেন অনেকে আজ। কিন্তু ওঁবা হুছেন দৈনিক-যাত্ৰী। এসেছেন সকালে ফিৰে যাবেন সন্ধ্যায়। আমাৰ তা নয়। প্ৰথমেই মাথা গৌজাব একটা আশ্ৰয় খুঁজে নিতে হবে আমাকে। জলগাঁওয়ে টুৰিস্ট অফিসই খোজ পোৱাৰি যে, এখানে একটা টুৰিস্ট-লজ সন্তঃসমাপ্ত। ফলে স্থানাভাব হবে না। তাছাড়া গুহামুখ থেকে মাঠল তিনেক দূৰে ফদাপুৰে ডাকবাংলো বা বেস্ট-হাউস আছে। কিন্তু সেসব জায়গায় থাকতে হলে আগে-ভাগে লিখিত অনুমতি আনাতে হয়। আমাৰ তা নেই। বাসটা যেখানে দাঁড়ালো, সেখানে দেখি চমৎকাৰ একটা দ্বিওল বাড়ী। শুনলাম, এটাই নবনিৰ্মিত টুৰিস্ট-লজ। কিন্তু কী দুৰ্ভাগ্য আমাৰ শোন' গেল সবকাবী খাতায় বাড়ীটি এখনও বাসোপযোগী হয় নি। অৰ্থাৎ বাস্তবে শেষ হলেও যাত্ৰীদেৰ কি ভাবে ভাড়া দেওয়া হবে তাৰ হিসাব এখনও কৰে বাৰ কৰা হয় নি। সন্তঃসমাপ্ত টুৰিস্ট-লজেৰ ভাবপ্ৰাপ্ত ওভাৰসিয়ারবাবু মাথা নেড়ে হিন্দীতে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে দিতে পাৰিছি না বলে আন্তৰিক ছঃখিত। তাছাড়া কি জানেন, সেপটিক্-ট্যাংক্ৰেৰ সঙ্গে স্থানিটাৰী প্ৰিভিৰ কনেক্সন পাইপটা

আমি বাৰা দিয়ে বলি সেজন্তু কি, চাবদিকেই তো ফাকা মাঠ।

প্ৰবলভাবে মাথা নেড়ে ওভাৰসিয়ারবাবু বলেন মাফ্ কিজিয়ে সা'ব। বহ্ নেহী হো সক্তা। যবতক এঞ্জিনিয়াৰ সা'ব ছুকুম নেহী দেতে তাবপর একটু হেসে বলেন : আপ্ নেহী জানতে সা'ব, পি ডাবলু কি কানুন বহুৎ কড়া হ্যায়।

আমাৰ মুখ দিয়ে আচমকা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা বেৰিয়ে গেল মায়েৰ কাছে মাসীৰ গল্পো আব নাই ঝাডলে ভাই।

ওভাৰসিয়ারবাবু বলেন ক্যা বোলতে হে ?

আমি হেঁ হেঁ কৰে সামলে নিই নিজেকে। হিন্দীতে প্ৰশ্ন কৰি, বন-বিভাগেৰ ডাকবাংলোতে থাকা যাবে ?

: যেতে পাৰে। চেষ্টা কৰে দেখুন। বন-বিভাগেৰ অফিসাবদেৰ অগ্ৰাধিকাৰ আছে। ওৱজ্জ্বাবাদেৰ ডি এফ ও পাঠে-সাহেবেৰ রিসার্ভেসান ছাড়া, তবে হ্যা, ঘৰ খালি থাকলে চৌকিদাৰ আপনাকে বিমুখ নাও কবতে পাৰে।

অগত্যা একটি লোকের মাথায় স্মার্টকেস বিছানা চাপিয়ে সেদিক পানেই রওনা দিই। বন-বিভাগের ডাকবাংলোটি বাঁকের মুখে। সুন্দর ছিমছাম। প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গেলুম। যেমন করেই হোক এখানে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে নিতে হবে। একটু হাঁকাহাঁকি করতেই চৌকিদার মহাপ্রভু বেরিয়ে এলেন। স্থির করলুম, এবার আর ভুল করবো না। প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে অসি চালনা করতে হবে। টুরিস্ট-লজের ওভারসিয়ারবাবুর সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক ডয়েল লড়তে গিয়েই বেকায়দায় পড়েছিলুম। এবার হার মানে আক্ষরিক অর্থে পথে বসা! চৌকিদার বেবিয়ে আসতেই হিন্দীতে বলি—কোন্ ঘর রিসার্ভেসান হয়েছে আমার জন্য?

চৌকিদার একটু হতচকিত। সামলে নিয়ে বলে : আপ কাঁহাসে আতে হেঁ সা'ব ?
জবাবে খেঁকিয়ে উঠি : কেন, পাঠে-সাহেবের চিঠি পাও নি ?

পাঠে-সাহেবের নামোল্লেখই অধিক কাজ হয়। চৌকিদার এবার আমাকে একটি সেলাম করে বললে—জী নেহী সা'ব।

আমি কণ্ঠস্বর একেবারে সপ্তমে তুলে গালাগাল কবতে শুরু করি। কড়া-মেজাজী বন-বিভাগের একজন হোমবা-চোমবা অফিসাবের ভূমিকায় অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে। সবকারী ডাক-বিভাগ থেকে শুরু করে মায় আমার ভাগাকে গাল পাড়তে থাকি এক নাগাড়ে। আমি আক্রমণাত্মক খেলা শুরু করতেই দেখি চৌকিদার বাবাজীবন আত্মরক্ষামূলক খেলা খেলতে আবিস্ত কবেছে। পাগড়ির প্রান্তভাগে মুখটা মুছে নিয়ে বলে—আপনি নাবাজ হচ্ছেন কেন সা'ব ? ঘব তো চারটেই খালি পড়ে আছে। যেটা ইচ্ছে দখল করুন না।

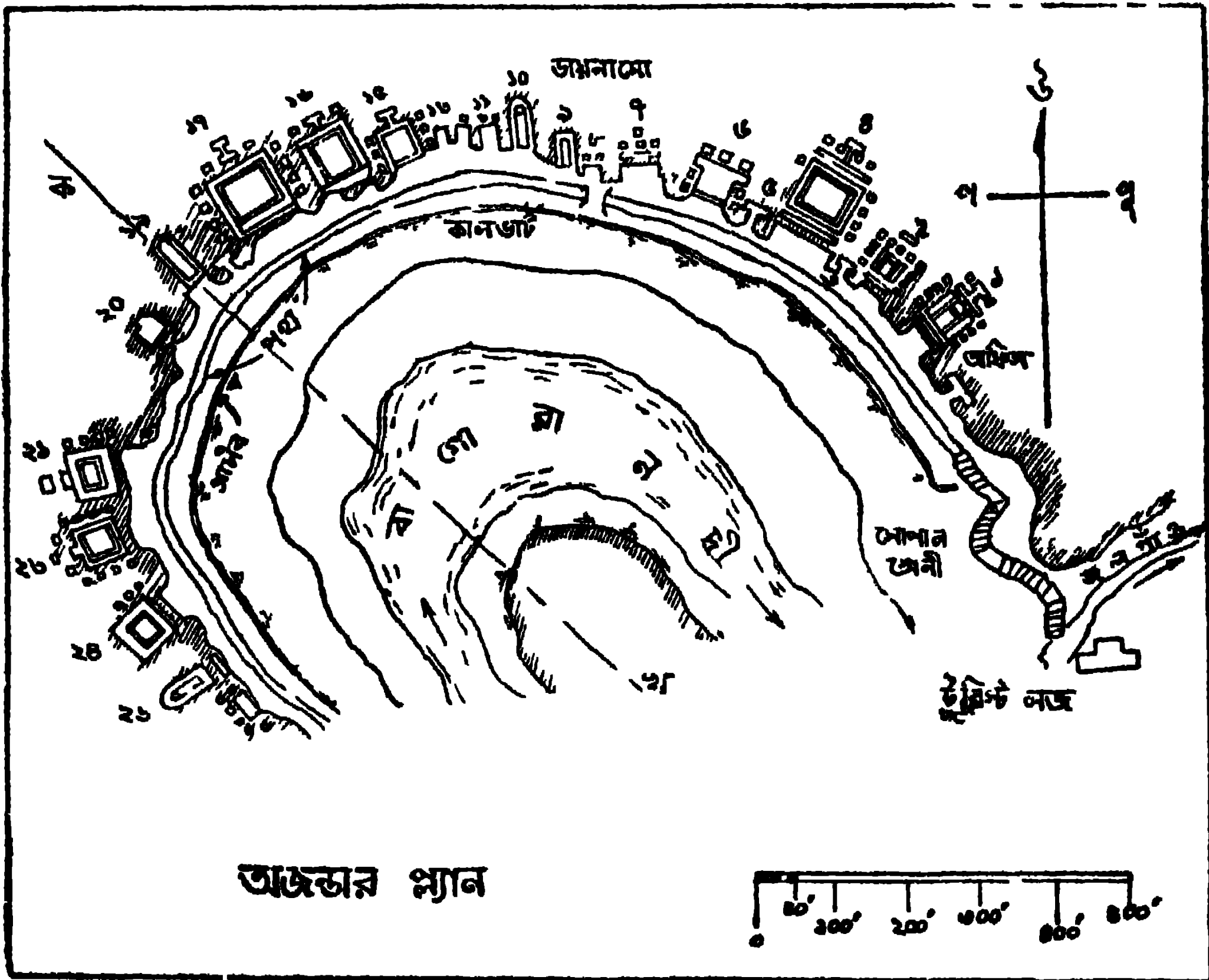
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে আমাব। বলি—চা খাওয়াতে পার ?

: আভি লাতা ছ' সা'ব !

চৌকিদারটি লোক ভাল। শুধু চা নয়, বিস্কুটও খাওয়াল। মধ্যাহ্নে কি খাব জেনে নিয়ে বললে রাত্রে ওকে কিছু ছুটি দিতে হবে। নিজেই বাক্ত করে কারণটা। চৌকিদার স্থানীয় লোক। মাইল তিনেক দূরে ওর গ্রাম। ওর স্ত্রী গ্রামে আছে। আসন্নপ্রসবা। আজ সকালেই খবর এসেছে—বাতে ওকে বাড়ী যেতে হবে। এক কথায় রাজী হয়ে যাই।

চা-পর্ব শেষ হতেই বেলা ন'টা বাজল। স্কেচ-বই, নোট-বই ইত্যাদি ঝোলা ব্যাগে ভরে নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি গুহা-মন্দিরের উদ্দেশ্যে। এখান থেকে আধ মাইলও হবে না। বাগোড়া নদীটি এখানে অশ্বখুরের আকারে মস্ত একটি বাঁক নিয়েছে। দু-পাশেই দেড়-দুশ' ফুট উঁচু পাহাড়। এর নাম ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একদিকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। অন্যদিকে তাপ্তী নদীর উপত্যকা। বাগোড়া নদীটি এই পাহাড়ের বুক চিরে ছুটে গেছে গভীর খাদের মধ্য দিয়ে পথ কেটে। পর পর সাতটি জল-প্রপাতের পথে নেমে এসেছে সমতলে। তার শেষ ধারাটি যেখানে আধখানা চাঁদের মত বাঁক নিয়েছে সেখানেই অজন্তা-গুহা।

চিত্র—১-এ অজন্তার একটি প্ল্যান ঠেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। একেবারে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে টুবিষ্ট-লজটি দেখানো হয়েছে এটিই সত্যঃসমাপ্ত যাত্রিনিবাস। বাস ঐ পর্যন্ত আসে জলগাঁও থেকে। সেখান থেকেই শুরু হয়েছে সোপান। ঐ সোপান বেয়ে উঠে আসতে হবে গুহামুখের সমতলে যে পথটি আছে তার কাছে। গুহামুখগুলিকে যুক্ত করে ঐ পথটি নদীর বাঁক অনুসারে ঘুরে গেছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। প্ল্যানের উপর থেকে দেখছি বলে বুঝতে পারছি না যে, বাস্তাটি বাগোডা নদীর জলতল থেকে অনেক উপরে আছে।



চিত্র -১

চিত্র—২-তে একটি সেক্সান একে ব্যাপাবটা বোঝাবার চেষ্টা করা গেছে। প্লানে ক-খ চিহ্নিত সবলবেখায় যদি আমরা খাড়াভাবে ঐ ভূখণ্ডকে কাটতে পারতুম, তবে সেটার চেহারা দাঁড়াতো ঐ চিত্র ২-এর মত। প্লানে দেখুন, সর্বসমেত ২৬টি গুহা-মন্দির দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ এখানে আরও কয়েকটি গুহা আছে, যা প্লানে দেখানো যায় নি। সর্বসমেত গুহার সংখ্যা ৩০টি।

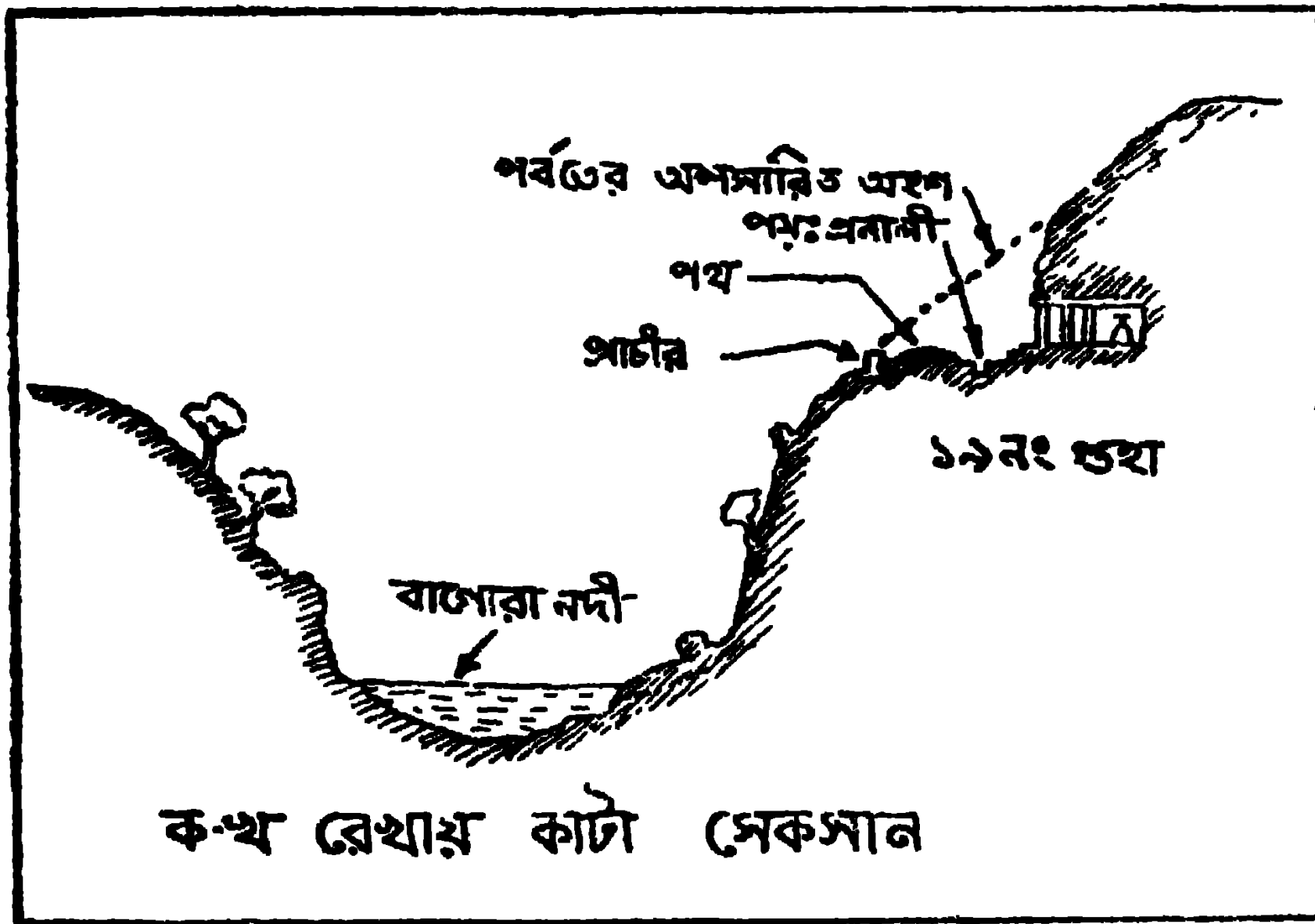
সোপান-শ্রেণী বেয়ে ধাপে ধাপে উঠে এলুম গুহার সমতলবর্তী ঐ পথটিতে।

প্রথম গুহার পাশে অফিসঘর। বেশ পয়সা দিয়ে এখানে টিকিট কিনতে হল। প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ মন্দিরে অন্ধকার গুহার ভিতরে আছে অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্রসম্ভার। এই চারটি মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে যাত্রীদের ছবিগুলি ভাল করে দেখাবার ব্যবস্থা আছে। সেজন্য পাঁচ টাকা দিয়ে একটি পৃথক টিকিট কিনে নিলুম।

অফিসঘর ছেড়ে ছুঁপা এগিয়ে যেতেই সমস্ত অজন্তা উপত্যকা মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আমার দৃষ্টির সম্মুখে। ঠিক এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে অর্ধ-শতাব্দী পূর্বে শিল্পী মুকুল দে তাঁর প্রথম অজন্তা দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছিলেন—

বাঁকের মুখে গুহা মন্দিরগুলি সর্বপ্রথম দেখে আমার মনে কী প্রচণ্ড আলোড়ন হয়েছিল তা আমার পাঠককে বোঝাতে পারব না। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে গেলুম। ধ্যানস্তিমিত মহামৌন পর্বত যেন দুই প্রসারিত বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। আমি এবং আমার সহযাত্রী দীর্ঘ সময় এখানে নির্বাক দাঁড়িয়েছিলুম। মনে হল দীর্ঘ পথযাত্রার যা কিছু ক্লান্তি, যা কিছু মানি সব যেন ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। আমি পরমপ্রাপ্তি লাভ করলুম মন্দিরে প্রবেশ করার পূর্বেই।

ছেলেবেলায় রূপকথায় পড়েছি সোনার কাঠিব ছোঁওয়া পেয়ে শতাব্দীর নিদ্রা ভেঙে রাজকুমারী চোখ মেলে চেয়েছিলেন। অজন্তা যেন সেই রূপকথার রাজকুমারী। সহস্রাব্দীর নিদ্রা-অন্তে সভ্যজগতের দিকে চোখ মেলে হঠাৎ সে তাকিয়েছিল ১৮১৭



চিত্র—১

খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় একদল ইংরাজ সৈন্য অজন্তা পাহাড়ের অপর দিকে শিবির সংস্থাপন করেছিল। হঠাৎ কয়েকজন লক্ষ্য করে দেখে নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি খিলান আর স্তম্ভ। দুঃসাহসী কয়েকজন সেই খাড়া পাহাড় বেয়ে নামল নদীতে। লতা-গুল্ম ঝাঁকড়ে আবার উঠল ওদিকের পাহাড়ে—ঐ গুহাগুলির সমতলে। বহুজন্তু আর বাহুড়ের আস্তানায় দীর্ঘ দিন পরে আবার পড়ল মানুষের পদচিহ্ন। ওরা স্তম্ভিত হয়ে গেল!

কিছুদিন পরে পল্টনের দল ফিরে এল লোকালয়ে। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গুরুত্ব দেয় না কেউ। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বিছোৎসাহী

বাপাবটা যাচাই করতে বেনিয়ে পড়েন। সেনাবাহিনীর লোকদের কাছ থেকে তাঁরা পথের মোটামুটি নির্দেশও পেয়েছিলেন। হায়দাবাদ বাজার খান্দেহ জেলায় ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালায় একটি ঘাট বা উপত্যকা আছে। এই ইন্দ্রাদ্রি পর্বতের এপারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, ওপারে তাপ্তী নদীর অববাহিকা। বাগোডা নামে একটি নদী এই পাহাড়ের মাঝখানে ফাঁক দিয়ে একেবেকে এগিয়ে চলেছে। এই বাগোডাই সাতকুণ্ড জল-প্রপাতের কাছাকাছি একটি অশ্বখুবাকৃতি গাক নিয়েছে। সেখানেই নাকি এই গুহাগুলির অবস্থান।

অনেক খুঁজে খুঁজে বিদ্যোৎসাহী দল অবশেষে এসে পৌঁছালেন অজস্রা-গুহায়। লোকালয়ে ফিরে গিয়ে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ করেন। সেটা হল ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ, অর্থাৎ অজস্রা পুনর্বাবিষ্কারের এক যুগ পবে। কিন্তু তবু কলাবসিক মহলে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাদা জাগল না। কাটল আরও প্রায় দশ বছর। তাবপব জেমস্ ফাণ্ডসনের নজরে পড়লো এই প্রবন্ধটি। ফাণ্ডসন ছিলেন সত্যিকারের পণ্ডিত ও কলাবসিক। তাঁর উৎসাহও ছিল প্রচণ্ড; বিশেষ করে ভারতীয় স্থপতির বিষয়ে। শুধু স্থপতিই বা কেন, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, পুৰাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই তাঁর পার্গুত্যা ছিল প্রগাঢ়। এসব বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ আজও প্রামাণ্য। এতবড় পণ্ডিত যখন স্বয়ং এই গুহাগুলি দেখে এসে বয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রবন্ধ লিখলেন, তখন অন্ধের পক্ষেও আর চোখ বুজে থাকা সম্ভবপব হল না। তাঁর প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিবেক্টারদের এবার টনক নড়লো। তাবা মাদ্রাজ পণ্টনের সৈন্যধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ববার্ট গিলকে পাঠালেন চিত্রগুলির অনুলিপি তৈরি করার কাজে। মেজর গিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে অজস্রায় কাজ করেছিলেন। কী প্রচণ্ড অধ্যবসায় ছিল তাঁর তা কল্পনা করলে স্তম্ভিত হতে হয়। তিনি বস্তুতঃ একাই কাজ করেছিলেন সেখানে, এবং এই দীর্ঘ সময়ে ত্রিশটির ওপব বৃহদায়তন তেল-বুড়ের ছবি একে শেষ করেন। এগুলি ক্রমে ক্রমে বিলাতে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। কিন্তু কী আপসোসের কথা, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিডেনহ্যামের ক্রিস্টাল প্যালেসে একটি প্রদর্শনীতে মান পাঁচটি পট ছাড়া বাকি পঁচিশখানি ছবি পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কেমন করে এমন সবনাশা আগুন লাগল জানি না, শুধু এটুকু জানি যে, সে ক্ষতি অপূরণীয়। তাব কারণ মেজর গিল যখন অজস্রা-গুহাতে চিত্রগুলি দেখেছিলেন, তখন সেগুলি ছিল প্রায় অক্ষতই। আজকাল আমরা যে ক্ষতচিহ্ন-লাঙ্ঘিত প্রাচীর-চিত্রগুলি অজস্রায় গিয়ে দেখতে পাই, তাব অধিকাংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গত দেড়শ' বছরে। তাছাড়া মেজর গিল এমন কয়েকটি চিত্রের অনুলিপি করেছিলেন যেগুলি আজ বাস্তবে একেবারে অবলুপ্ত। যাই হোক, অবশিষ্ট পাঁচখানি ছবি কেনসিংটন সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত করা হয়। শুনেছি, সেখানে ভারতীয় শাখায় এগুলি আজও সযত্নে রাখা আছে।

সে যাই হোক, মেজর গিলের পর এখানে যিনি এগিয়ে এলেন তিনি হচ্ছেন বোম্বাইয়ের শিল্প বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জর্জ গ্রিফিথ। এজ্ঞাও ফার্গুসন সাহেবের কাছে আমরা ঋণী : কারণ, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে মেজর গিলের ছবিগুলি পুড়ে যাওয়ার পর স্যার জেমস ফার্গুসন ও ডাঃ বার্জেস ভারত সরকারকে এ নিয়ে পুনরায় গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। তাঁদের উৎসাহেই সরকার এজ্ঞা টাকা অনুমোদন করেন এবং অধ্যক্ষ গ্রিফিথ তাঁর বিদ্যালয়ের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রকে নিয়ে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কাজ শুরু করেন। প্রায় দশ বছর পরে (এর ভিতর বছর তিনেক অবশ্য কাজ বন্ধ ছিল) তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি দেখতে পাওয়া গেল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। ছাত্রদের আঁকা এই ছবিগুলি নিয়ে গ্রিফিথ ফিরে এলেন সভাজগতে। সর্বসমেত চিত্রের সংখ্যা ৩৫৫। গ্রিফিথ সাহেবের হিসাব অনুযায়ী দেখছি তিনি আঁকিয়েছিলেন :

১ নং গুহায়...১৭৭টি	১৬ নং গুহায়...১৮টি
২ " " ... ৫০ "	১৭ " " ... ৫১ "
৬ " " ... ৫ "	১৯ " " ... ১ "
৯ " " ... ১১ "	২১ " " ... ২ "
১০ " " ... ১৮ "	২২ " " ... ১ "
১১ " " ... ১ "	মোট—৩৩৫টি

মহানন্দে অধ্যক্ষ গ্রিফিথ এই অমূল্য চিত্রসম্ভার পাঠিয়ে দিলেন বিলেতে। পশ্চিম জগৎ দেখুক এবার অজন্তার স্বরূপ! সাউথ কেনসিংটন সংগ্রহশালায় অতি যত্নে নিয়ে যাওয়া হল সেগুলিকে।

কিন্তু ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর পরিহাস! আবার এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ১২ই জুন, ১৮৮৫ তারিখে এই অনবদ্য চিত্রসম্ভারের অধিকাংশ চিত্রই নষ্ট হয়ে গেল। ৮৭-খানি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত; আর ১৯২-খানি আংশিকভাবে ঝলসে গেছে, অবশিষ্ট ৫৬-খানি ছবি ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট সংগ্রহশালার ভারতীয় শাখায় আজও শোভা পায়।

অদম্য উৎসাহ বলতে হবে গ্রিফিথ সাহেবের। এই সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডের পরেও তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন নি। দেখছি, তা সত্ত্বেও এই অগ্নিকাণ্ডের এগারো বছর পরে তিনি তাঁর অমর গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছেন—The Paintings in the Buddhist Caves of Ajanta, London 1896. যে ছবিগুলি রক্ষা পেয়েছিল এবং যে সব স্কেচ ওঁর কাছে ভারতবর্ষেই ছিল, তারই উপর নির্ভর করে দু-খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিই অজন্তার বিষয়ে প্রথম প্রামাণিক দলিল! বইটির ভূমিকা ও সম্পাদনার পারিপাট্য দেখলেই বোঝা যায় যে, এর পিছনে কী পরিমাণ পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য আর অনুসন্ধিৎসা আছে। জাতকের কাহিনী-গুলির অধিকাংশই গ্রিফিথ জানতেন না—তাই অনেকক্ষেত্রে দেখছি তিনি চিত্রগুলির মর্মমূলে প্রবেশ করতে পারেন নি। তবু অজন্তা-তীর্থের যে তিনিই পথিকৃৎ, এ-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। কয়েকটি বিখ্যাত চিত্রের অক্ষত অবস্থায় কী রূপ ছিল, তা শুধু তাঁর

এস্বেব মাধ্যমেই আজ জানতে পাবি। বর্তমান গ্রন্থে অনেকগুলি চিত্র গ্রিফিথ সাহেবের মূল গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকবার চেষ্টা কবেছি—ফলে সেগুলি প্রায়শঃই অক্ষত। বাস্তবে আজ অজন্তাব ছবিগুলি এ-গ্রন্থে প্রদর্শিত চিত্রের মত অক্ষত নয়।

ইতিমধ্যে কিন্তু অজন্তায় লুঠেবার দল মহানন্দে লুঠেব কাজে লেগে গেছে। অরক্ষিত গুহা থেকে তাবা ছবি চুৰি কববার মতলবে ছিল। কিন্তু এ তো আর সংগ্ৰহ-শালাব দেওয়ালে টাঙানো ফ্রেমে-বাধানো ছবি নয়—এ চুৰি কবা যাবে কেমন কবে? ওবা তাই ছুটে এল কোদাল আর চুৰি নিয়ে—পলেশ্তারা-সমেত ছবিগুলিকে চেষ্টে তুলে নিয়ে যাবে। এ দলের মধ্যে নিজামের কমচাবীবাই ওধু নয়, বোম্বাইয়ের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক ডাঃ বাদ-ও জুটে গিয়েছিলেন। অবশ্য, এই সব ডাকাডলের ভাগো লাভেব অঙ্কে পড়েছিল শুধুই কয়েক সব বাদন বুলো, আর বিশ্ব-ললিতকলাব লোকসানের খতিয়ানে যে গল্পটা পড়লো তা সুবীজন নিশ্চয় অনুমান কবতে পাবছেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে হিস এন্ডালটেড হাইনেস নিজাম বাহাদুরেব চৈতন্য হল—তিনি আইন কবে এই লুঠেবাদের ঠেকাবাব চেষ্টা কবলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই অযত্নে, ঝড়-জলের অত্যাচারে, আর লুঠেবাদের কবামাত্তে অজন্তাব অনেক ছবিই নিঃশেষ হয়ে গেছে।

১৯০৬-৭ খ্রিষ্টাব্দে লেডী হেবিংহাম ভাবতবর্ষে আসেন এব অজন্তা দর্শন কবে মুগ্ধ হয়ে যান। তিনি অনর্ভাবিলম্বেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ভাবতবর্ষে ফিরে আসেন এ চিত্রগুলিব নকল কবানোব এত নিয়ে। তাবই উদ্যোগে অজন্তাব কতকগুলি গুহাচিত্রেব নকল কবা হয়। এই নকলগুলি লেডী হেবিংহাম লণ্ডনেব ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে উপহার দেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে সোসাইটি সেগুলি দু-খণ্ডে প্রকাশ কবেন—‘অজন্তা ফ্রেস্কোস’ নামে।

বাংলা দেশেব বিদ্বৎসমাজেব কানেও অজন্তাব গৌরবমণ্ডিত চিত্রসম্ভাবেব কথা এসে পৌঁছাল। ফলে, শিল্পাচার্য নন্দলাল, অসিত হালদার, সমবেন্দ্র পুপু, মুকুল দে প্রভৃতি বণ্ডনা হলেন অজন্তাব উদ্দেশ্যে। এবাও নিয়ে এলেন অসখা অনুলিপি।

লেডী হেবিংহামকে তাব গ্রন্থ-বচনায় যাবা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য কবেছিলেন, তাবের মধ্যে মিস ডবোথি লার্চাবেব নাম সবপ্রথমে কবতে হয়। নন্দলাল, অসিতকুমার, সমবেন্দ্র গুপ্তেব চিত্রও তাব গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ-ছাড়া সৈয়দ আহম্মদ ও মহম্মদ ফজলদীনেব অনুলিপিও আছে তাব গ্রন্থে। পবোক্ষভাবে তাকে সাহায্য কবেছিলেন ভগ্নী নিবেদিতা, ববীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

শিল্পী মুকুল দে আসেন তাব অল্প কিছুদিন পাবে। প্রথমবার ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে ও দুই বছর পবে দ্বিতীয়বার। বিখ্যাত জাপানী শিল্পী আব আই এ-ব সঙ্গে তাব অজন্তাতেই সাক্ষাৎ হয়।

তাঁব অনেকগুলি চিত্রেব অনুলিপি ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ‘মাই পিলগ্রিমেজ টু অজন্তা এ্যাণ্ড বাঘ’ নামে একটি গ্রন্থে স্থান পায়।

হায়দাবাদেব নিজাম ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সবকাবে একটি পুৰাতত্ত্ব বিভাগ খোলেন এবং অজন্তার গুহাচিত্রগুলি স বক্ষণে যত্নবান হন। বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিজামের প্রাচষ্টায় ও অর্থে দুজন ইটালিয়ান বিশেষজ্ঞ, প্রফেসর লবেনৎসো চেচ্চোনি আর কাউন্ট অর্সিনি বহু পৰিশ্রম করে গুহা-চিত্রগুলিকে সাফ্ করে। ইতিমধ্যে চিত্রগুলিকে মেবামত কববার সত্বাদাশ্য যে সব নিকৃষ্ট শিল্পী খেয়ালখুশিমত বাজে বড় লাগিয়ে অজন্তার চিত্রগুলিকে অনবধানতাবশত সবনাশের পথে ঠেলে দিয়েছিল, এই দুজন তাদের সেই অপকর্মগুলি, অর্থাৎ নূতন বড়ের আস্তর ঘষে ঘষে তুলে ফেললেন। তার উপর আঠার মত স্বচ্ছ এমন একটি প্রলেপ দিলেন যাতে বড়গুলি জলে না যায়, দেওয়াল থেকে খসে না পড়ে। এঁরা দু'জনেই ছিলেন এ কাজে অভিজ্ঞ। ইটালিতে এই জাতীয় কাজ ইতিপূর্বেও হয়েছে সিস্তিন চ্যাপেলে। ইটালির একটি মনাস্টারির স্মার্তসৈতে নীচু ঘাবব দেওয়ালে ঝাক। লেওনাদো দা ভিঞ্চির বিশ্ববিখ্যাত 'শেষ সাযমাশ' প্রাচীর-চিত্রটিকে এভাবেই উদ্ধার করা হয়েছিল।

নিজাম সবকাবের পুৰাতত্ত্ব বিভাগ আরও একটি ভাল কাজ করলেন। ডা গোলাম ইয়াজদানির সম্পাদনায় বি. এ. চার খণ্ড অজন্তার একটি গ্র্যালবাম প্রকাশ করা হল। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে, শেষ খণ্ডটি ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই চার খণ্ড চিত্রসম্প্রদায়ের অধিকাংশ ছবিই ই-এল ডেসি নামে একজন অভিজ্ঞ আলোকচিত্র-শিল্পীর বড় বড় ফোটোগ্রাফ থেকে নেওয়া। গ্রিফিথ তার গ্রন্থে চিত্রসম্প্রদায়ের পূর্ণ প্রত্যেকটি গুহাব প্লান ছাড়া দেওয়ালের প্লান-ও এর দিয়েছিলেন, ফলে চিত্রগুলির অবস্থান বুঝে নেওয়া সহজ হয়েছিল। অনেক পবে প্রকাশিত হলেও ইয়াজদানি সবক্ষেত্রে চিত্রগুলির অবস্থান দেখিয়ে সাক্ষাতিক নক্সা দেন নি ফলে, তার গ্রন্থ অনুসরণে বাস্তবে চিত্রগুলিকে সনাক্ত করা শক্ত হয়ে পড়ে। তার গ্রিফিথের চেয়ে ইয়াজদানির একটা বড় সুবিধা ছিল। ইতিমধ্যে পুৰাতত্ত্ব ও ইতিহাসের পাণ্ডিত্য ফরেন্সিসের সঙ্গে জাতক-বর্ণিত কাহিনীর সম্পর্ক আবিষ্কার করে যাচ্ছিলেন। ফলে গির্গাথের চেয়ে ইয়াজদানির পক্ষে চিত্রের সমালোচনা করা সহজ হতো।

এছাড়া ইউ-এন-ই-এস-সি-ও বা ইউনেস্কো অজন্তা সম্বন্ধে ৩১টি বড় বড় ছবিসম্বন্ধে একটি চমৎকার গ্র্যালবাম প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, এর মূল্য বেশী হওয়ায় ইউনেস্কো সেই গ্রন্থটির একটি স্বল্পমূল্যের পকেট এডিসান-ও প্রকাশ করেছে। মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে পকেট বইটিকে অপূর্ব বলা যেতে পারে।

স্বাধীনতার পৰ ভারত সবকাবের ললিতকলা একাডেমি অজন্তার উপর একটি গ্র্যালবাম প্রকাশ করেছে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। এতে আছে বিশটি ছবি ১৪ X ১১' মাপের। মূল্য মাত্র দশ টাকা। আট আনায ঐ মাপের একখানি বড় ছবি নিশ্চয়ই খুব সস্তা, কিন্তু তবু বলব এতে যে সব বড় ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলি ঠিক বাস্তবায়ন হয় নি সব ক্ষেত্রে। সহজলভ্য করতে গিয়ে একাডেমি এ-জাতীয় বড়ের স্বেচ্ছাচারিতা

অপরূপা অজন্তা

না কবলেই ভাল কবতেন। বোধ করি, এম চেয়ে শুধু বেথায় অধিকাংশ চিত্র একে নমুনা-স্বরূপ ছ'একখানি বড়িন চিত্র দিলে খুব ভাল হত এবং যদি সেই ছ'একখানি বড়িন চিত্র গ্রিফিথ, ইয়াজদানি বা ইউনেস্কো'র গ্রন্থের মতো বাস্তবায়ন হত! তবু ললিতকলা একাডেমি যে অজন্তার বিষয়ে একটি সহজলভ্য আলোচন প্রকাশ কবেছেন, এজন্যই তাঁরা ধন্যবাদার্থ।

একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। অজন্তা পুনরাবিস্কৃত হয়েছে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে—কিন্তু সেখানে তখন কি দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তাব বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা পাই না। সেটা পাই প্রায় ষাট বছর পরে। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ বার্জেস গুহাগুলি পরিদর্শন করে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি তখন ১৬টি গুহার ভিতর চিত্র দেখতে পেয়েছিলেন। সেই ষোলটি গুহা হচ্ছে—১, ২, ৪, ৬, ৭, ৯, ১০, ১১, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২০, ২১, ২২ আর ২৬। আগেই বলেছি, এর ভিতর ১১টি গুহা থেকে গ্রিফিথ সাহেব তাঁর ছবিগুলি ঐকৈছিলেন। সে হিসাবে গ্রিফিথ যে গুহা থেকে কোন চিত্র আঁকেন নি, সেগুলির সংখ্যা হচ্ছে ৪, ৭, ১৫ ও ১০। গ্রিফিথ ও ডাঃ বার্জেস প্রায় ২৫মার্মায়িক, ফলে অনুমান করতে পারি গ্রিফিথ এই চারটি গুহা থেকে চিত্র আঁকেন। ন হুঁ! কবেই, চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে বলে নয়। কিন্তু আজ এই বিংশ শতাব্দী যখন পর্য্যটন বছরের বৃদ্ধি, তখন দেখছি মাত্র ছটি গুহায় আছে দর্শনীয় চিত্রসম্ভার। সেগুলি ১, ২, ৯, ১০, ১৬ আর ১৭। তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াল? অজন্তার চিত্রগুলির জন্ম খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত। এগারশ' বছর অজ্ঞাত উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল অজন্তা—সহস্রাব্দীর ঝড়-ঝঞ্ঝা-বষণ, বন্যজন্তু ও পাখীর অত্যাচারেও চিত্রগুলি ছিল অগ্নান। আর আধুনিক সভ্যজগৎ তাব সন্ধান পাওয়ার পূর্ব, তাব সঙ্গে ঘব কবতে শুরু কবা মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যেই শুকিয়ে যেতে বসেছে অজন্তা!

জানি, আপনি বলবেন এম জন্ত দায়ী সভা (?) মানুষের কালাপাহাড়ী অত্যাচার। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে বর্তমান শতাব্দীর জন্মমূহূর্ত পর্য্যন্ত পঁচিশ-ত্রিশ বছরে মানুষের অত্যাচারেই ষোলটি গুহার চিত্র কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ছটিতে। হতে পারে। এম জবাব দিতে গেলে জানতে হয়, নিজাম সরকার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আইন করে যখন 'অজন্তা সংরক্ষণের আয়োজন করলেন, তখন কতগুলি গুহায় চিত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। হয়তো পুঁর্বাতন বিভাগের বিশেষজ্ঞরা সে সংখ্যাটি জানেন—আমি জানি না। কিন্তু তবু আমি বলব শুধু তাও নয়। আমার যুক্তির সপক্ষে আমি লেডী হেরিংহাম ও শিল্পী মুকুল দে-র গ্রন্থ দুটি দাখিল করতে চাই। এ দুটি গ্রন্থ যে সব চিত্র দেখছি তাব অনেকগুলি তো আজ বাস্তবে নেই। ডরোথি লার্চাট, নন্দলাল বসু, সমরেন্দ্র গুপ্ত, মুকুল দে, অসিত হালদার প্রভৃতি যখন ছবি ঐকৈছেন, তখন তো কালাপাহাড়ী অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে। তাহলে ?

বিশেষজ্ঞ আর বৈজ্ঞানিকের দল বসেছেন এ নিয়ে মাথা ঘামাতে। আমি বিশেষজ্ঞও নই, বৈজ্ঞানিকও নই—তাই আমার কল্পনার বাণ আলগা করে দেওয়ায় কেউ বাধা দিতে

আসবে না। আমার তো মনে হয়, বৈজ্ঞানিক প্রখর আলোৰ সংস্পর্শেই শুধু নয়, আধুনিক মানুষেৰ গায়েৰ গন্ধেও এই চিত্ৰগুলিৰ বড় জ্বলে যাচ্ছে! হিংসায় উন্মত্ত এই আধুনিক পৃথিবীৰ ঘোৰ কুটিল পথ আৰ লোভ-জটিল জীবনযাত্রা বৰদাস্ত কৰতে পাবছে না অজন্তা। তাই সে শুকিয়ে যাচ্ছে, ঝৰে খসে যাচ্ছে—তাই তাৰ অনুকৃতিগুলিকে অতি সঘৰে সংৰক্ষণেৰ বাবস্থা কৰা সৰ্বেও বাবে বাবে আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি!

অজন্তায় সৰ্বসমেত ত্ৰিশটি গুহা-মন্দিৰ আছে। এখানে একটা কথা বলে বাখি। অনেক সাধাৰণ লোকেৰ ধাৰণা, বৌদ্ধ শিল্পীবা বুঝি প্ৰাকৃতিক গুহায় কিছু দেওয়াল-চিত্ৰ এঁকেছিলেন—আৰ তাকেই বলা হয় অজন্তা-চিত্ৰ। মোটেই তা নয়। এগুলি প্ৰাকৃতিক গুহা মোটেই নয়। বীতিমত পাথৰ কেটে গুহাগুলিকে এঁবা খুঁড়ে বাব কৰেন। তাৰপৰ অমসৃণ পাথৰেৰ দেওয়ালকে ঘষে ঘষে মসৃণ কৰে তোলেন। আৰ তাৰপৰ সেখানে আঁকেন ঐ ফ্ৰেস্কোগুলি। কী-ভাবে তাঁৰা এগুলি খনন কৰতেন, সে সম্বন্ধে পদে আলোচনা কৰব। আপাততঃ সেকথা থাক।

এই ত্ৰিশটি মন্দিৰেৰ ভিতৰ মাত্ৰ পাঁচটি (৯, ১০, ১৯, ২৬ ও ২৯) হচ্ছে চৈত্য বা উপাসনাগৃহ। বাকি পঁচিশটি বিহাৰ বা সজ্জাবাম। এগুলি বৌদ্ধ শ্ৰমণদেব আবাসস্থল। এব ভিতৰ প্ৰধানতম গুহা-মন্দিৰ বোব হয় দশম চৈত্যটি। মোট কথা, ১০, ৯, ৮, ১২, ১৩ ও ৩০ এই ছটি গুহা-মন্দিৰই প্ৰাচীনতৰ যুগেৰ। এই ছটি খ্ৰীষ্ট জন্মেৰ দু'শ' বছৰ পূৰ্ব থেকে দু'শ' বছৰ পৰে—মোটামুটি এই চাবশ' বছৰ সমাযৰ বাবধানে নিৰ্মিত। বাকিগুলি সপ্তম শতাব্দীৰ ভিতৰ তৈৰী। অৰ্থাৎ, হিসাবে দাঁডাল—অজন্তা তিল তিা কৰে গড়ে উঠেছিল প্ৰায় ছ-সাতশ' বছৰ পৰে, আৰ অজন্তা অবজ্জাত হয়ে পড়েছিল আৰও প্ৰায় হাজাৰ বছৰ।

কে বা কাৰা অজন্তা পাহাডেৰ বুকে গুহা-মন্দিৰেৰ কাজ প্ৰথম শুরু কৰেন, আজ আৰ তা জানবাৰ উপায় নেই। সম্ৰাট অশোকের আমলে গয়াৰ বাছে চাবটি গুহা-মন্দিৰ তৈৰি হয়েছিল—শুদামা, কৰ্ণ-কৌপৰ, লোমশ-ঋষি আৰ বিশ্ব-ঝোপড়ি। এগুলি প্ৰাকৃতিক গুহা নয়—মানুষেৰ তৈৰী। অশোকের সময় বৌদ্ধ ধৰ্ম নূতন কৰে প্ৰাণ পেয়েছিল, একথা আমবা জানি। বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ দল লোকালয় ত্যাগ কৰে নিৰ্জন প্ৰান্তৰে তাঁদেৰ উপাসনা-মন্দিৰ এবং সজ্জাবাম তৈৰি কৰতে প্ৰয়াসী হলেন। মৌৰ্য যুগেৰ পৰ সাতবাহন যুগে দেখি, বোম্বাইয়েৰ কাছাকাছি নাসিককে কেন্দ্ৰ কৰে অনেকগুলি গুহা-মন্দিৰ তৈৰি হচ্ছে, ভাজা, নাসিক, কাৰ্লে প্ৰভৃতি স্থানে পশ্চিমঘাট পৰ্বতমালাৰ বুকে একদল বৌদ্ধ শ্ৰমণ অনলস পৰিশ্ৰমে গড়ে তুলছেন কতকগুলি গুহা-মন্দিৰ। প্ৰায় সেই সময়েই অজন্তাৰ দশম গুহা-মন্দিৰটি নিৰ্মাণ শুরু হয়। সে যুগকে আমবা বলি হীনযান বৌদ্ধ যুগ। তখন বুদ্ধদেবেৰ মূৰ্তি খোদাই কৰা হত না। শাক্যমুনিকে বোম্বাৰ জন্তু ব্যবহাৰ কৰা হত কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন—পদ্মফুল, ধৰ্মচক্ৰ, স্তূপ, চবণ-চিহ্ন, বোধিবৃক্ষ বা শূন্য

সিংহাসন অথবা শূণ্য রাজছত্ৰ। অজন্তার অষ্টম, নবম, দশম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহা-মন্দিরগুলি সেই যুগেব। এদেব ভিতৰ যদি বুদ্ধদেবেব কোন মূৰ্তি বা চিত্ৰ দেখেন, বুঝবেন সেগুলি পরবৰ্তী মহাযান যুগেব সংযোজন।

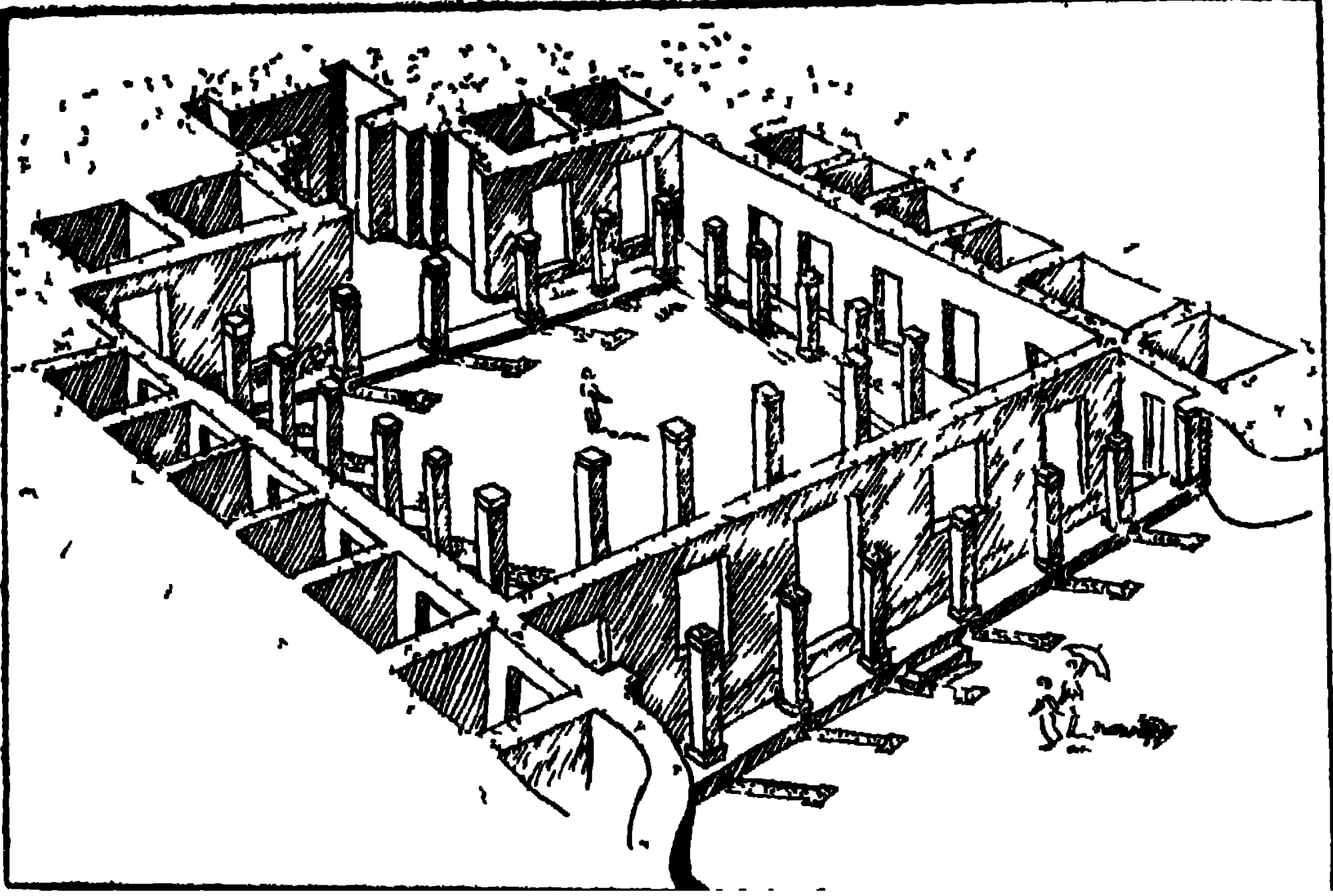
উত্তৰ ও মধ্য ভাৰতে যখন গুপ্ত সাম্ৰাজ্যেৰ স্বৰ্ণযুগ, তাৰ প্ৰায় সমসময়ে দাক্ষিণাত্যে কতকগুলি শক্তিশালী রাজ্যেৰ সন্ধান পাই ইতিহাসে। বাকাটক ও পবে বাদামিৰ চালুকা রাজবংশ (বৰ্তমান মহীশূৰ) এবং বাৰ্দ্ধকুটবা। বৌদ্ধ ধৰ্মেৰ তখন মহাযান যুগ। অৰ্থাৎ, তখন শাক্যমুনিৰ মূৰ্তি তৈৰি কৰাব বেওয়াজ শুক হয়েচে। অজন্তাৰ অধিকাংশ গুহা-মন্দিৰ এই মহাযান যুগে।

দীৰ্ঘ 'সাত-আটশ' বছৰ ধৰে তিল তিল কৰে গড়ে টঠেছিল অজন্তা। প্ৰথমে হয়তো ছিল কয়েকজন একান্তবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ নিৰ্জন আবাসস্থল, ন'-নম্বৰ চৈত্যাটিকে ধিৰে। ক্ৰমে হয়তো এব স্থান-মাহাত্ম্যে যুক্ত হয়ে আসতে শুরু কৰেন অগ্ৰাণ্য ভিক্ষু এবং অহঁতেরা। মহাযান যোগাচাবেৰ প্ৰবৰ্তক মহাভিক্ষু আসঙ্গ যে দীৰ্ঘদিন এখানে বাস কৰে যান, তাৰ প্ৰমা। পাওয়া যায় বৌদ্ধ শাস্ত্ৰে। সে-যুগে অজন্তাৰ কী নাম ছিল, আজ আব তা জানবাব উপায় নেই। সপ্তম শতাব্দীৰ চৈনিক পৰিব্ৰাজক হিউ-এন-ৎসাঙ অজন্তায় পদাৰ্পণ কৰেন নি, তৰে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব কাছ থেকে শুনে তিনি এব উল্লেখ কৰেছেন তাঁৰ ভ্ৰমণ-বৃত্তান্তে।

নবম বা দশম শতাব্দীতে অজন্তা সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিত্যক্ত হয়েছিল বলে অনুমান কৰা হয়। কিন্তু কেন, তা আজও জানা যায় নি। ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মেৰ ধ্বজাধাবীবা অথবা মুসলমানবা এসে এই নিজন গুহাবাসী বৌদ্ধ ভ্ৰমণদেব যে আক্ৰমণ কৰে নি, তা অনুমান কৰা শক্ত নয়। মূৰ্তিগুলিৰ নাক ভাঙা নয়; দেওয়াল-চিত্ৰগুলি অক্ষত অবস্থায় আছে—অগ্নিকাণ্ড, লুট-তবাজেব কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি। যদি মনে কৰি, কোন বাৰ্দ্ধনৈতিক কাৰণে অথবা কোন ব্যাপক মহামাৰীৰ ভয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুৰ দল কোনও নিৰাপদ আশ্ৰয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন আব কিৰে আসাব সুযোগ পান নি, তাহলেও প্ৰশ্ন থাকে, সেক্ষেত্ৰে গুহা-মন্দিৰগুলি তাৰা আলুগা পাথৰ দিয়ে বন্ধ কৰে গেলেন না কেন? বহুজন্ত ও পাথৰ অতাচাব থেকে গুহাচিত্ৰগুলিকে বন্ধ কৰাব এ সহজ ব্যবস্থাটুকু নিশ্চয় তাৰা সেক্ষেত্ৰে কৰে যেতেন। তা তাঁৰা কৰে যান নি। প্ৰায় হাজাৰ বছৰ পৰে হঠাৎ যেদিন অজন্তা পুনৰাবিষ্কৃত হল, সেদিন গুহামুখগুলি খোলাই পাওয়া গিয়েছিল, অথচ বৌদ্ধ ভ্ৰমণদেব ব্যবহৃত কোন বস্তু পাওয়া গেছে বলে শুনি নি। ভিক্ষাপাত্ৰ, জপেন মালা, যষ্টি, বাসনপত্ৰ—কই কিছুই তো ছিল না গুহা-মন্দিৰে! কেন?

একেব পৰ এক গুহা-মন্দিৰগুলি দেখতে থাকি। ভবিষ্যৎ যাত্ৰীৰ সুবিধ হৰে মনে কৰে বিচিত্ৰিত গুহা-মন্দিৰগুলিৰ একটি কৰে প্ৰাণ এবং বিখ্যাত শিল্প-নিদৰ্শনগুলিৰ অবস্থান যতদূৰ সম্ভব এখানে সন্নিবেশিত কৰে দিলুম। আমবা বাড়ীৰ প্ৰাণ দেখতে অভ্যস্ত, তবু প্ৰাণ বলতে কি বোঝায় একটু আলোচনা কৰে নেওয়া উচিত।

প্রথম গুহা-মন্দিরটিকে যদি আমরা মাটির সমান্তরালে বসুন্নায কেটে ছ-আধখানা কবতে পারি এবং উপরের আধখানা সবিয়ে ফেলতে পারি, তাহলে এবোপ্লেন থেকে গুহা-মন্দিরটির আলোকচিত্র নিলে সেটি চিত্র—৩-এর মতো দেখতে হবে। এটাকেই আমরা সাক্ষেতিক চিত্র—৪-এ প্ল্যান বলে বোঝাতে চেয়েছি। চিত্র—৩ ও চিত্র—৪ মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে প্ল্যান বলতে কি বোঝায়। নেহাৎ অসুবিধা হলে কোন এঞ্জিনিয়ার বা ওভারসিয়ার বন্ধুকে বলুন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে। এটা না বুঝে নিলে প্ল্যান দেখে

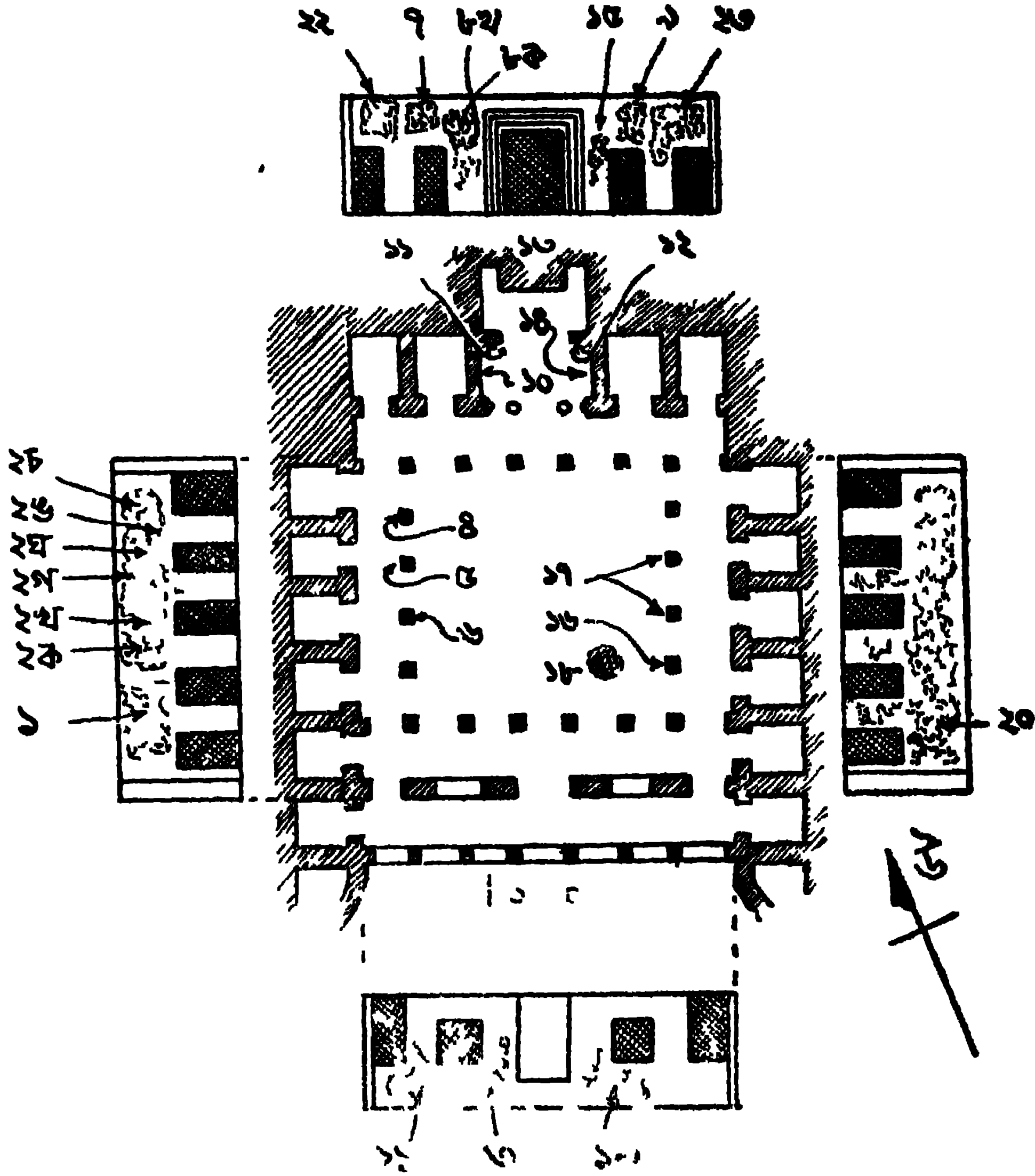


চিত্র ৩

প্রথম গুহা মন্দিরের উপরের পাহাড় সবিয়ে নিলে যেমন দেখানো।

পরে শিল্প-নিদর্শনগুলিকে সনাক্ত করতে পারাবেন না মনে রাখাবেন, অজ্ঞতায় আপনাকে নিশ্চয় যেতে হবে একদিন, আর তখন হাতে সময় থাকবে অন্যান্ত অল্প। ফল, প্ল্যান দেখে কেমন হবে বস্তুর অবস্থান চেনা যায়, সেটা শিখা নিতেই হবে।

কিন্তু মশকিল হচ্ছে, প্লানে তো শুধু মেনোনারাই দেখছি অথচ শিল্প-নিদর্শনগুলি আছে দেখালে। প্লানে তো দেখালেব ছবি দেখা যায় না। তাই এখানে প্লানের চার-পাশে চাবটি দেওয়াল এক দেওয়া হয়েছে। ব্যাপারটা কেমন জানেন? মনে করুন চিত্র—৫-এ একটি কাচের বাস দেখা যাচ্ছে, যার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম প্রাচীরের ভিতরদিকে ক, খ, গ, ঘ—এই চাবটি অক্ষর যথাক্রমে লেখা আছে। এই কাচের বাসটির প্লান হচ্ছে নিচের কেন্দ্রস্থলে ঝাঁকা আয়তক্ষেত্রটা। কিন্তু প্লানে আমরা দেওয়ালের লেখাগুলি দেখতে পাচ্ছি না। এবার মনে করুন, ঐ কাচের বাসটির চাবটি দেওয়াল খুলে মাটিতে পেতে দেওয়া হয়েছে। আর তাবপর আমরা তাব প্লান এঁকেছি। তাহলে ঐ কেন্দ্রস্থলের প্লানের চারপাশে চাবটি দেওয়ালকে দেখতে পার। মাটিতে পেতে দেবার পর অক্ষরগুলি কোথায়

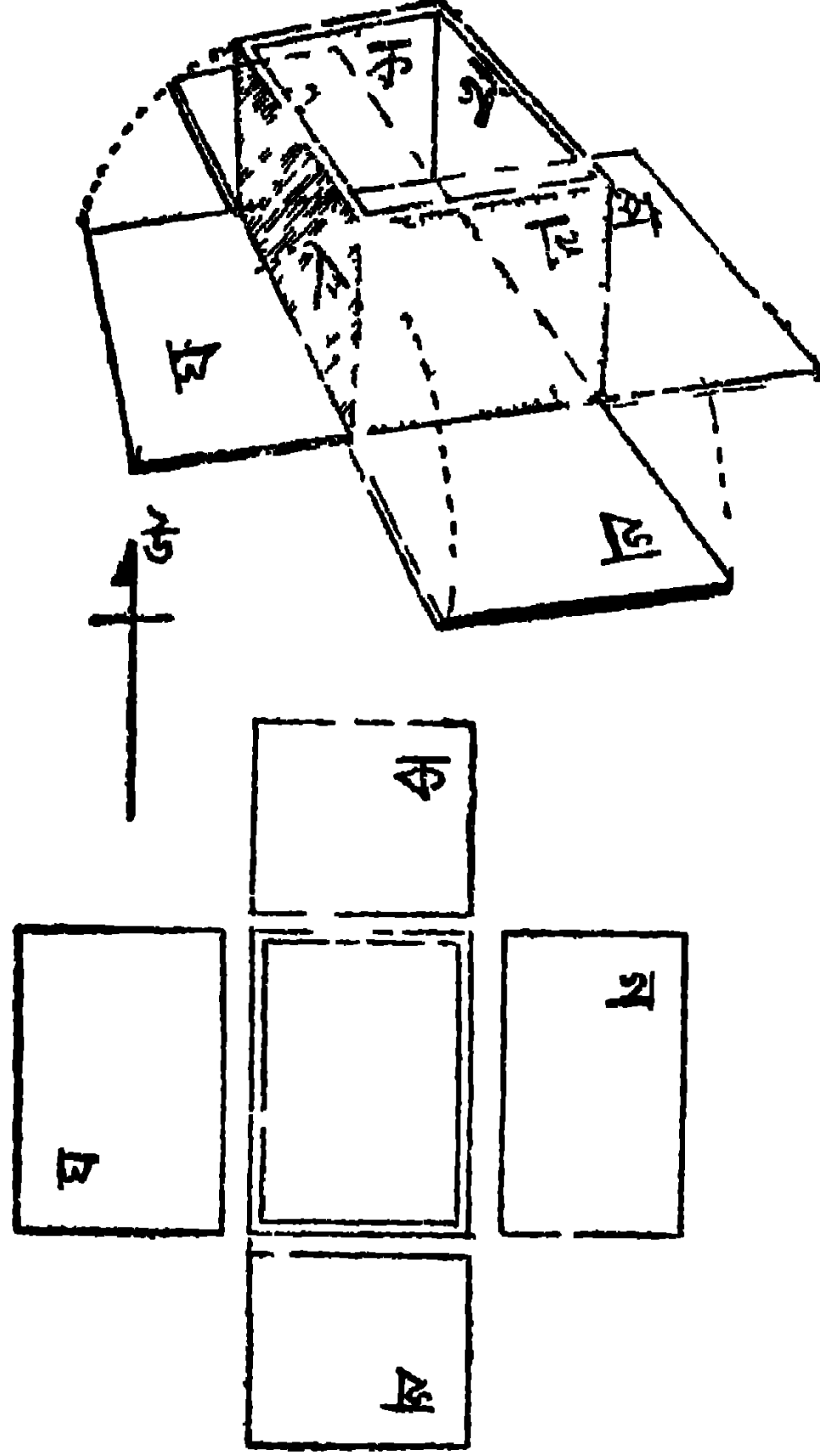


চিত্র ৭

প্রথম গুহ মন্দিরের প্লান

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|--|
| ১ | মহাপাল জাতক | ১১ | মার ত্তক বুদ্ধের তপস্তাভঙ্গের চিত্র |
| ২ | মহাজনক জাতক | ১২ | গজা (প্রস্তর মূর্তি) |
| ৩ | মহাজনক ও সীতলী (চিত্র ৭) | ১৩ | যুনা (প্রস্তর মূর্তি) |
| ৪ | মহাজনক সন্ন্যাসী দর্শনে চলেছেন | ১৪ | বাবনাথ মুগ্ধদান পদ্মাসনে বুদ্ধদেব (প্রস্তর মূর্তি) |
| ৫ | হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী দর্শন | ১৫ | সহস্র বুদ্ধ অ বস্ত্রীয় ঘটনা |
| ৬ | প্রবজ্যাগহণ (চিত্র ৮) | ১৬ | কৃষ্ণা রাভুনারী (চিত্র ১) |
| ৭ | শিবির তাতক | ১৭ | মহাস্ত্রী (প্রস্তর মূর্তি) |
| ৮ | নাগরাজা স্তম্ভমূলে প্রণামবত | ১৮ | বাব চরিত্রের এক মাথা (প্রস্তর মূর্তি) |
| ৯ | যুবধান বগুঘ | ১৯ | পারস্ত্র সস্ত্রাট খুসরো ও রানী শৌরীন (?) |
| ১০ | বড়ভুজ বামনমূর্তি | ২০ | চন্দ্রক, বাও দ্বিতীয় পুলকেশের রাজমতা |
| ১১ | রাজপুত্রের অভিষেক-প্লান (মহাজনক ?) | ২১ | চিত্র সনাক করা যায় নি |
| ১২ | অবলাকিতেশ্বর পদ্মপাণি | ২২ | পূববামিনীর দ্বারে মহাভিক্ষু (চিত্র—১৪) |
| ১৩ | অবলাকিতেশ্বরের কৃষ্ণ নারিক | ২৩ | বোধিসত্ত্ব ক অগাহান (মহাজনক জাতক ?) |
| ১৪ | অবলাকিতেশ্বর বজ্রপাণি | ২৪ | চম্পেরা জাতক |

কেমনভাবে দেখা যাবে, লক্ষ্য কবে দেখুন। অর্থাৎ, বাজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকেব দেওয়ালের দিকে তাকালে ‘ক’ অক্ষরটিকে দেওয়ালে যেখানে দেখব, প্রাণের উপরদিকে তাই দেখানো হয়েছে। আবার দক্ষিণ দিকে মুখ কবে দক্ষিণেব দেওয়ালটিকে কেমনভাবে দেখতে পাব জানতে হলে, ছবিটা উলটিয়ে ‘খ’ অক্ষর-চিহ্নিত চতুষ্কোণটিকে দেখুন।



চিত্র—৫

এ ব্যাপারটা যদি বুঝতে পাবেন, তাহলে চিত্র—৪-এব সাহায্যে প্রথম গুহা-মন্দিরে দাঁড়িয়ে কোন্ দেওয়ালে কোন্ ছবিটি কোথায় আছে, তা খুঁজে বার করা নিশ্চয় কঠিন হবে না আপনার কাছে।

অজস্তুৰ প্রথম বিহারটি ৬০০ থেকে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের ভিতর নির্মিত। ‘প্রথম’ বলেছি বলে এটাকে আদিমতম মনে করবেন না। অবস্থান অনুসারে এটা প্রথমে দেখা হয় বলেই এর ‘নাম’ প্রথম গুহা-মন্দির। এটি চালুক্য রাজাদের আমলে তৈরী। মহাযান বৌদ্ধ যুগে। গুহাব সম্মুখে একটি গাড়ি-বাবান্দা বা পোর্ট ছিল—এখন তাব চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমেই

প্রথম গুহা-মন্দির একসারি স্তম্ভ। ছটি পূর্ণকাষ স্তম্ভ আর দুটি অর্ধকাষ, অর্থাৎ প্রাচীর-গাত্রে অর্ধ-গ্রথিত পিলাস্টার। স্তম্ভমূল চতুষ্কোণ, উপবাংশ

আট-কোণ। প্রবেশপথের দুদিকে অর্থাৎ মাঝের স্তম্ভ দুটিতে অলঙ্করণ অল্প ছটি স্তম্ভের চেয়ে বেশী। যো শিল্পী আগন্তুক যাত্রীর দৃষ্টি প্রবেশপথের দিকে কেন্দ্রীভূত করবার জন্যই এভাবে অলঙ্করণ করেছেন। অলিন্দ পাব হয়ে প্রধান প্রবেশদ্বার দিয়ে এবার

গুহার প্রবেশ করা গেল। ভিতরটা বেশ আলো-আধারি। কিন্তু এ গুহাতে বৈদ্যাতিক আলোর ব্যবস্থা আছে। টিকিট দেখালেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী একটি জোবালো বাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রাচীর-চিত্রগুলি আপনাকে দেখিয়ে দেবেন। প্লাগ পয়েন্ট থেকে দীর্ঘ ফ্লেক্সিভ তার দিয়ে বাস্‌ট যুক্ত। ফলে, বাতির উৎস ক্রমাগত সঞ্চবণশীল। অর্থাৎ, প্রাচীর-চিত্রগুলির অবস্থান সম্বন্ধে যদি আপনার পূর্ব-অভিজ্ঞান না থাকে, জাতক-বর্ণিত কাহিনীগুলি যদি আপনার আগে থেকে না শোনা থাকে, তাহলে এই অল্প সময়ে চিত্র-কাহিনীগুলি সনাক্ত করা দুষ্কর এবং তার পূর্ণ বসাস্বাদন অসম্ভব। আর কী দুঃখের কথা, যে কয়দিন আমি সেখানে ছিলাম, দেখেছি অসংখ্য যাত্রী আসছেন, আর চলে যাচ্ছেন। এই বিশ্ব-বন্দিত চিত্রশিল্পের পূর্ণবস তাঁরা পাচ্ছেন না। এবং তাঁরা কি হাবাচ্ছেন তাও তাঁরা জানেন না!



চিত্র-কাহিনীগুলি অধিকাংশই জাতকেব গল্প। গৌতমবুদ্ধ পূর্ব পূর্ব জন্মে যে সব লীলা কবেছেন, সেই জাতিস্মরণ মহাপুরুষ-কথিত সেই সব কাহিনীই জাতকেব গল্প নামে পরিচিত। সর্বসমেত পাঁচশ'র উপর জাতকেব গল্প আছে। এক এক রূপ নিয়ে বুদ্ধদেব ধ্বাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন—তাঁরা পূর্ণ বুদ্ধ নন,—তাঁরা বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধের লাভের পথে বিভিন্ন জন্মচক্রেব মধ্য দিয়ে তারা চলেছেন এ মর্ত্যভূমে নানান লীলা কবে, মহাপরিনিবাণের পথে। জাতক-বর্ণিত চিত্র-কাহিনী বর্ণনা করার সময় প্রথমে আমাদের মূল কাহিনীটি জানতে হবে—তারপর তার চিত্রনাট্যরূপ এবং সবশেষে তার সমালোচনা বা বসোপলব্ধির প্রয়াস। এই পথেই অগ্রসর হতে হবে আমাদের।

প্রথমেই নজবে পড়লো সজ্জপাল জাতকেব কাহিনী (১/১) :

বাবাণসী মহাবাজেব পুত্ররূপে জন্ম নিলেন বোধিসত্ত্ব। তিনি উপযুক্ত হলে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে কাশীবাজ বানপ্রস্থ নিলেন। একটি নির্জন হ্রদেব তীরে কুটির তৈরি করে তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করতে থাকেন। সেই হ্রদে বাস করতে নগবাজ সজ্জপাল। তিনি প্রত্যহ ঐ সন্ন্যাসীর কাছে ধর্মকথা শুনতে আসেন। একদিন পিতাকে দেখতে এসে বোধিসত্ত্ব নগবাজ সজ্জপালকে দেখতে পেলেন। তাঁর মনে নগবাজ হবার বাসনা জাগে। ফলে, পরজন্মে বোধিসত্ত্ব সত্যি নগবাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নগলোকেব বিলাস-বৈভব—নগ-বাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য কিছুই তাঁর ভাল লাগল

না। বোধিসত্ত্ব বুঝতে পাবলেন—দূর থেকে মনে হয়েছিল বুঝি নাগলোকেই আছে অপার শান্তি, বিমল আনন্দ। কিন্তু তা ভ্রান্তিজনক। ভোগে সুখ নেই, ত্যাগেই সুখ।

সজ্জপাল জাতক

বাজাব মনে প্রশান্তি নেই, আছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীও মনে। বোধি-

সত্ত্ব স্থির কবলেন, জগতেব হিতার্থে তিনি আত্মোৎসর্গ কববেন।

নাগলোক ত্যাগ কবে তিনি গ্রামের পথে একটি বন্দীকেব উপর বিশ্রাম নিতে থাকেন। মনে মনে বলেন, আমার এই দেহেব চামড়া দিষে যদি কোন চর্ম-ব্যবসায়ী লাভবান হয় তো তোক। কয়েকজন শিকারী সেই পথ দিয়ে যাওয়াব সময় নাগবাজকে দেখতে পায় এবং তাবা এই মহানাগকে বন্দী কবে। নাকে দড়ি দিয়ে তাঁকে টানতে



চিত্র—৬

সজ্জপাল জাতকের অংশ—১১

টানতে নিয়ে যায় বাজপথ দিয়ে, নানাভাবে উৎপীড়ন কবে। অহিংসাব মান্ত্র দীক্ষিত বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ কবেন না। অবশেষে আলাবা নামে একজন সমৃদ্ধিশালা ভূস্বামী স্বর্ণমূল্যে বোধিসত্ত্বকে উদ্ধার কবেন। মুক্তিলাভ কবে বোধিসত্ত্ব আলাবাকে নাগবাজ্যে নিয়ে যান এবং মহাসমাদবে তাঁকে বাজপ্রাসাদে বাজ-অতিথি কবে রাখেন। বৎসব ধিক কাল আলাবা নাগবাজ্যে বাস কবেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্বের কাছে ধর্মের কথা শোনেন। ক্রমে আলাবাব অন্তবেও জাগে তিতিক্ষা, তিনিও বুঝতে পাবেন ভোগৈশ্বর্যেব মধ্যে শান্তি নেই, অগ্নিকে ঘৃতাভূতি দান কবে নিবাপিত কবা যায় না। শেষ পর্যন্ত আলাবাও সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন বোধিসত্ত্বের কাছে।

কাহিনীটি দীর্ঘ। অত্যন্ত সুসংবদ্ধভাবে স্বল্প পবিসবে শিল্পী এব চিত্র-কাহিনী উপস্থাপিত কবেছেন। উপরে বাম কোণে দেখছি নাগবাজ সজ্জপাল মনুষ্যদেহ ধারণ করে হৃদেব তীবে প্রাক্তন কাশীবাজেব কাছে ধর্মোপদেশ শুনছেন। নাগবাজেব মুখে একটি প্রশান্ত জ্যোতি। সন্ন্যাসীকে ঘিরে বসে আছেন কয়েকজন মুমুক্শু। যুবক-যুবতী

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এমন কি বনের পশু-পাখীবাও। তাব ভিতর দেখছি, একটি মেয়ে বসে আছে সন্ন্যাসীর পদমূলে চিত্রদর্শকের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিবে (চিত্র—৬)। হয়তো এই নারী-মূর্তিটির কথা মনে কবেই গ্রিফিথ সাহেব লিখেছিলেন :

নারীচিত্র অকনে অজ্ঞতার শিল্পী বিভিন্ন ও বিচিত্র ভঙ্গির পরিকল্পনা করেছেন। অনেকগুলি নারীচিত্র বিবসনা অথবা সেগুলি এত স্বল্প বস্ত্রাবৃত যে তাদের দেহমোটর সম্যক উপলব্ধি করা যায়। এমন কি পশ্চাৎ থেকেও সম্পূর্ণ নারী দেহকে আঁকা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

নিচেব প্যানেলে দেখছি, নাগবাজের নাকে দাড়ি দিয়ে কয়েকজন শিকারী তাঁকে পথ দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। শিকারীদের ঐহিক ক্ষমতার তুলনায় নাগবাজকে এত বিশাল করে আঁকা হয়েছে যে, সহজেই বোঝা যায়, নাগবাজ স্বেচ্ছায় এ অত্যাচার সহ্য কবেছেন। তা নাহ'লে এই কয়জন মানুষের পক্ষে ঐ প্রকাণ্ড নাগবাজকে টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর নয়।

এ চিত্রগুলি অধিকাংশই নষ্ট হয়ে এসেছে।

সম্ভবপাল জাতকেব পবে একটি দীঘ কাহিনী মহাজনের জাতক (১১২) :

মিথিলাব মহামন্ত্রী চেদিবাজকুমারের কণমূলে নিবেদন করেন : আপনি ডঃব্রিজিত হবেন না কুমার। আপনি বিদ্বান পণ্ডিত সববিজ্ঞাপাবঙ্গম। এক উদ্ভিন্নযৌবনা চপলা নারীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব হবে না নিশ্চয়ই।

আত্মবিশ্বাসী চেদিবাজকুমার বলেন। আপনিও অহেতুক চঞ্চল হবেন না মহামন্ত্রী। আপনি যান, বাজাস্তম্ভপূর্ব থেকে ডেকে দিয়ে অশ্বশূন্য পণ্ডিতসম্মত্যা আপনারদেব বাজকন্যাকে।

আহ্বানের প্রয়োজন হয় না। এতাত্ত্বিক সদৃশ উগোবজালিকার অববোধ সবিয়ে মণিদীপ্ত কক্ষে পদার্পণ করেন মিথিলাব বাজনন্দিনী বিশ্ববন্দিতা সীবলী।

নিমেষহীন দৃষ্টিতে সেই নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ চেদিবাজকুমার নির্বাক হয়ে যান। ভূগো যান, পিতৃহীন এই বিহ্বল কন্যাটি ঘোষণা করেছে, তর্কযুদ্ধে কেউ তাকে পরাস্ত কবতে পারবে তাবই কণ্ঠে ববমালা দেবে সে। ভূলে যান, পাণিপ্রার্থী কত বাজপুত্র,

কত পণ্ডিত, কাশী তক্ষশীলাব কত সেবা ছাত্রের দল এখানে
মহাশয়ক জাতক

এসে অপমানিত হয়ে ফিবে গেছে। মুগ্ধবিশ্ময়ে তিনি দেখতে থাকেন সুবসুন্দরীনিন্দিত স্মৃতলুকা সীবলীর রূপ। বুঝতে পারেন, দেশ-বিদেশে কেন শোনা যায়—সমস্ত জম্বুদ্বীপে আজ সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী হচ্ছেন গতায়ু মিথিলাধিপতির আত্মজা। শুধু রূপ নয়, গুণে-ও তিনি দেবনাঙ্জিতা। যাব কণ্ঠদেশে এই বববর্ণিনী নারী ববমালা দেবে সেই হবে মিথিলাব অধিপতি। তাই বাব বাব লুপ্ত ভ্রমবের দল ছুটে আসে মিথিলায়—ঐ রূপবহ্নিশিখার পদপ্রান্তে পরাজয়ের স্বাক্ষর বেখে ফিবে যায় আবাব দক্ষপক্ষ পতঙ্গের দল।

সীবলী বলে -আর্য, দূতমুখে শুনেছি আপনি নাকি আমার প্রশ্নের উত্তরদানে প্রয়াসী ?

কণ্ঠস্বর তো নয়, যেন বীণার স্বরব।

চেদিকুমার বলেন—বল তোমার প্রশ্ন সুন্দরী, দেখি চেষ্টা করে।

একে একে সীবলী পেশ করতে থাকে তার কঠিন প্রশ্নগুলি। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত বিজ্ঞা একত্র করেও চেদিকুমার তার সমাধান খুঁজে পান না। মনে হয়, বৃথাই তক্ষণীলায় এতদিন বেদাভ্যাস করেছেন।

কলকণ্ঠে হেসে উঠে সীবলী : বলে -পথশ্রমই সার হ'ল আর্গপুত্রের।

চেদিকুমার মাথাটা আর তুলতে পারেন না।

কিন্তু এভাবে তো রাজ্য চলে না। মিথিলার সিংহাসন শূন্য। অনতিবিলম্বে সে সিংহাসন পূর্ণ করতে হবে। মহামন্ত্রী বলেন—রাজকুমারী, আমি স্থিরনিশ্চয় বুঝেছি তোমার প্রশ্ন সমাধানের অতীত। আমি বরং স্বয়ম্বর সভাব আয়োজন করি। তুমি নিজ অভিরুচি অনুসারে নাকে ইচ্ছা বরমালা দান কর।

সীবলী হেসে বলে -তা তো হয় না মহামন্ত্রী। আমার প্রতিজ্ঞায় আমি অটল। আমার প্রশ্নজালিকাকে ভেদ না করে কেউ আমার অঙ্গস্পর্শ করতে পাববেন।

মহামন্ত্রী ডেকে আনেন গ্রহাচার্যকে ; বলেন : রাজনন্দিনীর করকোটি বিচার করে আপনি বলুন ঐব বিবাহ হবে কি না এবং এর ক্রোড় জন্ম নেবে কি না মিথিলার ভবিষ্য-নৃপতি।

সীবলী সকৌতুকে প্রসারিত করে দেয় পদমকোরক তুলা তার বামহস্ত। গ্রহাচার্য সে রেখা বিচার করে বলেন—রাজকুমারীর বিবাহ আসন্ন। কিন্তু মিথিলার রাজবংশকে ইনি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে যেতে পাববেন না।

কলকণ্ঠে হেসে ওঠে সীবলী : বলে কেন গ্রহাচার্য ? আমি কি শেষ পর্যন্ত কোন নপুংসকের কণ্ঠে বরমালা দিয়ে বসব ?

তক্ষণীর প্রগল্ভতায় গ্রহাচার্য ক্ষণিকের জ্ঞাত্য যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েন। কঠিন-কণ্ঠে বলেন—না রাজকুমারী ; তুমি যাকে বিবাহ করবে, তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনি জনক হবার উপযুক্ত—তিনি মহাজনক। কিন্তু তুমিই তাঁকে তৃপ্ত করতে পারবে না।

শিউরে উঠেন মহামন্ত্রী, কিন্তু প্রগল্ভা রাজকুমারী হেসে বলে—আবার প্রশ্ন করছি, কেন গ্রহাচার্য ? এই অধম রমণীর রূপের মোহে শুনতে পাই আজ সমস্ত জম্বুদ্বীপ উদ্ভাস্ত। যারা আমাকে প্রত্যক্ষ করে নি, তাবাও আমার রূপবর্ণনা শুনে প্রোমোদিত। আর যে হতভাগ্যকে আমি আমার এই দুই মৃণাল ভুজদ্বয়ে বন্দী করবার সামাজিক অধিকার পাব, সে তৃপ্ত হবে না আমাকে পেয়ে ? কেন ?

গ্রহাচার্য বলেন, কেন জানতে চাও রাজপুত্রী ? শোন তার কারণ। এ হবে তোমার অহমিকার দণ্ডভোগ। রূপের অভিমানে সৌন্দর্যের অহঙ্কারে তুমি এযাবৎকাল যত পাণিপ্রার্থীর বুকে শেল হেনেছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপ লাগবে না ভেবেছ তোমার জীবনে ?

মহামন্ত্রী দুই বাছ প্রসারিত করে বলে ওঠেন—ক্ষান্ত হন গ্রহাচার্য !

সীবলী কিন্তু অনমিতা। কোতুক ছলে প্রগল্ভা নাবী হেসে বলে—আপনি অহেতুক ছশ্চিন্তা কববেন না মহামন্ত্রী। জগদীশ্বৰ যদি ঐ বৃদ্ধ গ্রহাচার্যের কোটবগত চক্ষুতে দিয়ে থাকেন অপবের ভবিষ্যৎ দেখাব উপযুক্ত দৃষ্টি, তাহলে এ বাজকণ্ঠ্য নয়ন-কোণেও তিনি দিয়ে বেখেছেন নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত বিলোল-কটাক্ষ।

গ্রহাচার্য সে বাঙ্গ-বিদ্রূপে কর্ণপাত না কবে বলেন—মহামন্ত্রী, আপনি বাজহস্তীকে সুসজ্জিত কবে বাজপথে যুক্ত কবে দিন। মানুষে পাবে নি কিন্তু সে পাবে। বাজহস্তীই নিবাচন কবে দেবে এ বাজ্যের অধীশ্বৰকে।

বাজপুত্রী হেসে বলে—আব আমাব প্রশ্নের উত্তর ?

গ্রহাচার্য বলেন—মনে আছে বাজনান্দিনী। তোমাব শর্তপূৰণ না করে বিবাহ কবতে বাধ্য কবব না আমবা।

কাহিনীর দ্বিতীয় দৃশ্য মিথিলাৰ জনাকীৰ্ণ এক বাজপথ। পথপ্রান্তে ধূলিশযায় শুয়ে আছেন একজন শালগ্রাম মণ্ডাজ যুবাযুগ্ম। কিন্তু তাঁব বসন ছিন্ন, ধূলিমলিন। তিনি হতসবস্ত্র এক সামান্য বণিক। শুয়ে শুয়ে ভাবছেন নিজ দুর্ভাগ্যের কথা। এ ছুনিয়ায় আজ আব তাঁব আপন বলতে কিছু নেই। এক আছেন জননী—সুদূৰ চম্পানগবে। জননীকে সেই পৰ্ণকুটীবে বোথ অৰ্ণবপোতে, গিঁজা-সস্তাব সাজিয়ে সমুদ্রযাত্রা কবেছিলে দীৰ্ঘদিন পূবে। ছবৎ সমুদ্র-ঝটিকায তাবপর হতসবস্ত্র হয়েছেন। আজ তিনি পথের ভিখারীমাত্র। অথচ মাযের কাছে শুনেছেন, তিনি নাকি এক বাজাব কুমাব। তাঁব পিতৃব্য অনায়াসভাবে অগ্রজের সিংহাসন অধিকার কবেন হত্যা কবেন তাঁব পিতাকে। বাষ্ট্রবিপ্লবের দুর্যোগ-বাত্ত তাব গণবতী জননী একাকিনী ছদ্মবেশে পলায়ন কবেছিলেন বাজপুৰী থেকে। গভীর অরণ্যে শেষে জন্ম দিয়েছিলেন তাকে। পিতৃব্য সমস্ত বাজ্য তন্ন তন্ন কবে অশেষ কবেছেন, সেই পলাতকা নাবীর সন্ধান—কিন্তু খুঁজে পান নি তাঁকে। দুর্ভাগিনী নাবী এক পৰ্ণকুটীবে সুগোপনে তাঁকে মানুষ কবে তুলেছেন দীনদবিত্তের মত। গোপন বেখেছেন তাব পৰিচয়। জননীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাব পুত্র একদিন পুনরুদ্ধার কবে পিতৃবাজ্য। হায়, মাযের সে স্বপ্ন সফল কবতে পাবেন নি তিনি হয়েছিলেন বণিক—ভাগ্য-বিপর্যয়ে আজ দীন ভিখারী।

সতসা বণিকের কানে যায় কিসেব কোলাহল। উঠে বসে দেখেন—এক শোভাযাত্রা আসছে বাজপথ দিয়ে। তাব পূৰ্বোভাগে মণিমাণিকে। সুশোভিত এক বাজহস্তী। তাব পৃষ্ঠে সুসজ্জিত এক সিংহাসন, উপরে বাজছত্র। কিন্তু সিংহাসন শূণ্য। কোতহলী বণিক সভয়ে উপলব্ধি কবেন বাজহস্তী তাঁববেগে ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য কবেই। মদমত্ত হস্তীব পদতলে পিষ্ট হবাব আশঙ্কায় বণিক গাত্ৰোত্থান কবতে যান, কিন্তু তৎপূৰ্বেই সেই বাজহস্তী তাঁকে শুণ্ডে আলিঙ্গনবদ্ধ কবে তুলে নেয় নিজ পৃষ্ঠে। অতি যত্নে তাঁকে বসিয়ে দেয় সেই শূণ্য সিংহাসনে। অমনি চতুর্দিকে বেজে ওঠে কাডা-নাকাডা-মঙ্গলশব্দ। স্তম্ভিত বণিকের সম্মুখে শ্রদ্ধানয় প্রণতি জানিয়ে মিথিলাৰ মহামন্ত্রী বলেন—ভদ্র, আপনাব পরিচয়

আমরা জানি না, কিন্তু আপনিই আজ মিথিলা-বাজ্জাব নির্বাচিত মহান অধিপতি। বণিক বিস্মিত হয়ে বলেন—সেকি? কেন? কোন্ অধিকাৰে? মন্ত্রী বললেন—মিথিলাৰ অধীশ্বৰ পোপজনক দীৰ্ঘদিন গতাযু। তাঁর একমাত্র আত্মজাব জন্ত উপযুক্ত সুপাত্ৰেব সন্ধানে বার্থ হয়ে অবশেষে আমবা এই বাজহস্তীকে সে কাৰ্যে নিয়োগ কৰেছিলাম। বাজহস্তী আপনাকেই নিৰ্বাচন কৰেছে।

বণিক বলেন—এমন অদ্ভুত নির্বাচনের কথা তো কখনও শুনি নি।

মহামন্ত্রী বলেন আপনাব নাম এবং পৰিচয়?

বণিক বলেন—পিতৃপৰিচয় জানি না। বিশেষ কাৰণে জননী তা গোপন বেখেছেন। আমি ক্ষম্য, নাম মহাজনক।

মন্ত্রী বুঝতে পাবেন বাজহস্তী নির্বাচনে ভুল কৰে নি। এহাচাৰ্য বলেছিলেন বটে সীবলীর সীমন্তে যিনি সিন্দূৰবিন্দু অঙ্কিত কৰে দেবেন তিনি জনক হবাব উপাত্ত, তিনি মহাজনক।

কিন্তু বাদ সাধল স্বয়ং সীবলী। বলে—অজ্ঞাতকুলশীলে আপত্তি নেই আমাব, কিন্তু আমাব প্রশ্নের সমাধান?

মহাজনক এগিয়ে এসে বলেনঃ কী তোমাব প্রশ্ন শুচিস্মিতে? সীবলী এতক্ষণে আগন্তকের দিকে ফিৰে তাকায়। এবাব স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় তাকে। প্রভাতসূর্যেব মত দীপ্তিমান এই শালপ্রাংশু মহাভূজ কে? ইনি কি ছদ্মবেশী কন্দৰ্প, অথবা স্বৰ্গেন সিংহাসন শূণ্য কৰে নেমে এসেছেন স্বয়ং শচীপতি শত্রু? বাজকত্যা উপলব্ধি কৰে ইনিই তাব বাঞ্ছিত বস্তু, এবই প্রতীক্ষায় এতদিন সে ক্রমাগত প্রত্যাখ্যান কৰেছে আসন্ন-হিমাচলেব অযুত পাণিপ্রার্থীকে। কিন্তু যদি ইনি তাব প্রশ্নেব উত্তৰদানে অশক্ত হন? যে কঠিন প্রশ্নবাণগুলিকে বাজকত্যা এতদিন তাব কোমায়-বক্ষাব ছুঁচ্ছে বম বলে মনে কৰত, সেগুলিকেই আজ প্রিয়মিলন-অন্তরায় লোহ-শৃঙ্খল বলে মনে হল তাব।

মহাজনক বলেনঃ পেশ কৰতে অহেতুক বিলম্ব কৰছ কেন সূচবিত্তে?

ব্রীডাবনতা সীবলী সংবিং ফিৰে পায় লাজনয় কম্পকণ্ঠে একে একে পেশ কৰে তাব কটপ্রশ্নগুলি।

কিন্তু মহাজনক হলেন বস্তুতঃ স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। জ্ঞানেব আকব তিনি, বুদ্ধদেবেব অংশে জন্ম তাব। হেসে বলেনঃ কি আশ্চর্য বাজকমাবী, তুমি এতদূৰ বিচ্যাত্যাস কৰে এ এই সহজ সবল প্রশ্নগুলিব সমাধান জান না?

স্তম্ভিত সীবলী শোনে ক্ষুব্ধাব যুক্তিৰ অশনি-আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় তাব কঠিন প্রশ্নগুলি।

ধীর পায়ে এগিয়ে আসে লজ্জাবনতা কুমাবী। পৰিয়ে দেয অজ্ঞাতকুলশীল মহাজনকেব কণ্ঠে নিজকণ্ঠেব মণিদীপ্ত শতনবী।

বেজে ওঠে মঙ্গলশঙ্খ, নহবতে বাজতে থাকে মিলনসঙ্গীতেব তান। মহাজনক

বলেন বিবাহে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তৎপূর্বে চম্পানগরে পল্যাঙ্কিকা পাঠাও। আমার জননীকে নিয়ে এস এখানে।

এহাচার্য আপত্তি জানিয়ে বলেন—তা যে হবার নয় মহাবাজ। চম্পানগর দীর্ঘদিনের পথ। অথচ গণনায় দেখছি আজ বাত্রি প্রভাতেব মধ্যে যদি বাজপুত্রীবিবাহ না হয়, তাহলে আর তাঁর বিবাহযোগ নাই।

মহাজনক আর কি কবেন? ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ কবে দেন। বুঝতে পাবেন, জননী এ সংবাদে খুশীই হবেন নিশ্চয়। পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখাব স্বপ্ন তিনি দেখে আসছেন আজ দীর্ঘ পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল। এইবার তাঁকে জেনে নিতে হবে তাঁর পিতৃপবিচয়! এখন আর তিনি অবশিষ্টা শর্গকুটীববাসিনী পলাতক অবসহায় পুত্র নন যে, তাঁর পবিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়লে গুপ্তঘাতক তাঁর ক্ষতি করবে। এবার মিথিলাব সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি পিতৃবাব বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কবেন—পুনরুদ্ধার কবেন অজ্ঞাত পিতৃবাজ।

মহা আড়ম্বরে উদযাপিত হয়ে গেল বিবাহ উৎসব। মহাজনক স্বর্ণমণ্ডিত শিবিকা পাঠিয়ে দিলেন চম্পানগরে—জননীকে সম্মানে মিথিলায় আনয়নেব উদ্দেশ্যে।

জাতকেব কাহিনী এ পর্যন্ত ছিল যেন রূপকথা। এখানেই দেখা দিল জটিলতা। পল্যাঙ্কিকা এসে উপনীত হল বাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে। মহাজনক সস্ত্রীক এসে প্রণাম করলেন জননীকে। কিন্তু এ কী? বাজমাতা তো আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরলেন না গুদেব? তাঁর দৃষ্টি বিশ্বস্তবুলায় নাটকাতাড়িত বিহগীব মত বিহ্বল, তাঁর সমস্ত মুখাবয়বে যেন একবিন্দু বস্তু নাই!

জননীকে দুই শালগ্রাম শুভ্রভূষে বেঁধে কবে মহাজনক বলেন—তুমি কি অসুস্থ? পথশ্রমেই কি তোমার এ দশা?

সে কথার প্রত্যুত্তর না করে জননী প্রতিপ্রশ্ন করেন—বিবাহকার্য কি সম্পূর্ণ হয়ে গেছে?

হ্যাঁ মা। কিন্তু তুমি কি সুখী হও নি আমার বাজ্যলাভে? এ অনিন্দ্যকান্ধি, বমণীবন্ধকে পুত্রবধ হিসাবে লাভ করে তুমি কি তৃপ্ত নও?

জননী কোন প্রত্যুত্তর করেন না। নীরবে প্রবেশ করেন অন্তঃপুরে, তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে। মহাজনক আহত হন জননীর এই নিকন্তাপ উদাসীনতায়—ততোধিক মর্মান্বিতা হল সীবলী, এ উপেক্ষায়।

নবাগতা বাজমাতার সেবাযত্নের কোন ক্রটি হল না বাজান্তঃপুরে; কিন্তু বৃদ্ধা জলস্পর্শমাত্র করলেন না। কিন্তুবীর মখে সংবাদ পেয়ে ছুটে এল সীবলী, বলে—মা আপনি নাকি সমস্ত দিন উপবাসী আছেন আজ?

অলস্তু আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়েন বাজমাতা, দিকার দিয়ে ওঠেন—দূর হয়ে যা রাক্ষসি!

স্তুতিত সীবলী স্বশ্রমাতার এ সম্বোধনে দিশাহারা হয়ে পড়ে। বুঝতে পারে, মহাজনক-জননী বিকৃতমস্তিষ্কা !

সেদিন গভীর রাত্রে গ্রহাচার্যের ডাক পড়ল রাজমাতার নিভৃত কক্ষে। বৃদ্ধ আচার্য দীর্ঘদিন এ রাজপরিবারেব শুভাকাঙ্ক্ষী ; যুগে যুগে তাঁকে আসতে হয়েছে এভাবে রাজাস্তঃপুরে--গণনা করে বলতে হয়েছে পুত্রকামিনীদের ললাটলিখন। তাই রাজমাতার আহ্বান মাত্রে আজও তিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর রুদ্ধদ্বার নিভৃত কক্ষে। অনবগুণ্ঠিত রাজমাতা মণিদীপ তুলে ধরে বলেন--আমাকে চিনতে পানেন মিথিলাবাজের একান্ত সখা মহাগ্রহাচার্য ?

এ অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হন আচার্য, রাজমাতার বিকৃতমস্তিষ্কেব কথা ইতিমধ্যেই কর্ণগোচর হয়েছে তাঁর। ভয়ে ভয়ে বলেন : পারি বই কি রাজমাতা। আপনি চম্পানগর থেকে সড়-আগত মহাবাজ মহাজনকের জননী।

রাজমাতা হাসেন। বলেন আপনি কি শুধু ভবিষ্যৎই দেখতে পান আচার্য ? অতীতকে কি দেখতে পান না একেবারেই ?

এবার চমকে ওঠেন বৃদ্ধ। যান বড়দীপেব মৃদু আলোয় বলিবেখান্ধিত ঐ প্রোটাব মুখের উপর ফুটে উঠতে দেখেন দীর্ঘ পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূর্বেকার আর একটি পুত্রসুন্দরীর মুখ। তাকে যেন এখানে, এই ঘরেই দেখেছিলেন একদিন ! স্তুতিত গ্রহাচার্য বলেন--আপনি কি... আপনি কি...

সহসা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পদপ্রান্তে জ্বলন্ত মত লুটিয়ে পড়েন রাজমাতা, আঁতকে বলে ওঠেন : হ্যাঁ তাই। আমিই সেই অভাগিনী নারী ! আপনার প্রিয় বন্ধুব পলাতকা স্ত্রী।

ভূকম্পম্পন্দিত ভূধরের মত একবারমাত্র কোঁপে উঠেই স্থির হয়ে যান গ্রহাচার্য। বলেন--ভাগ্যেব কী বিচিত্র খেলা ! মিথিলাধিপতি অরিষ্টজনকেব নিকদ্ধিষ্ট পুত্র মহাজনক আজ তার পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট, অথচ মহারাজের পলাতকা রাজমহিষী সে আনন্দের দিনে ভূসুগুণ্ঠিতা ! কেন ? না, মহাজনক বিবাহ করেছে তার পিতৃহত্যা পোপজনকেব কন্যাকে--আপন পিতৃব্যকন্যাকে।

সাশ্রনয়নে রাজমাতা বলেন--আপনি আমাকে পথের নির্দেশ দিন আচার্য। এ অসামাজিক অসিদ্ধ-বিবাহ কেমন করে মেনে নেব আমি ?

গ্রহাচার্য তাঁকে বাহুগূল ধরে তুলে বসান, বলেন--তুমি বুঝা মনস্তাপ করছ রাজমাতা। তুমি আমি কুশীলব মাত্র, যে বিচিত্র নাট্যকার অলক্ষ্যে বসে এই অপূর্ব নাটকটি রচনা করছেন--তিনি আমাদের নাগালের বাইরে। অপ্রতিবাদে তাঁর নাটকে আমাদের অভিনয় করে যেতে হবে শুধু।

রাজমাতা বলেন--কিন্তু আমার স্বামীহত্যা পোপজনকেব কন্যা তার পিতৃক্লান শোধ করবে না ?

: করবে বৈকি রাজমাতা।

: কেমন কৰে ? মহাজনকেব মত স্বামী, মিথিলা-বাজ্যেৰ মহাবাণীৰ বিলাসব্যসনেৰ বিপুল আয়োজন— তাৰ দণ্ডভোগ হ'বে কেমন কৰে ?

গ্রহাচাৰ্য হেসে বলেন— ইয়া বাজমাতা, বিলাসব্যসনেৰ মধোই সে দণ্ডভোগ কৰে যাবে। এ বিলাসব্যসন বিষ হুয়ে উঠবে তাৰ কাছে। তাৰ কামনাৰ ধন সে কিছুতেই পাবে না।

: আৰু কি কামনা থাকতে পাবে তাৰ ?

: নাবীজন্মেৰ যা শ্ৰেষ্ঠ সম্পদ। সন্তান।

চমকিতা বাজমাতা বলেন সে কি ? কেন ?

: কাৰণ আপনাৰ পুত্ৰ মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কোনও অনাচাৰ তাঁৰ পক্ষে সম্ভবপৰ নয়। নিজ ভগ্নীৰ গৰ্ভে তাঁৰ সন্তান হ'বে কেমন কৰে ?

বাজমাতা বলেন—ঠিক কথা। আমি পুত্ৰেৰ দ্বিতীয়বাৰ বিবাহ দেব।

গ্রহাচাৰ্য নিকন্তব থাকেন।

পৰদিনই বাজমাতা ডেকে পাঠালেন পুত্ৰকে। বললেন সীবলীকে ত্যাগ কৰতে হ'বে। আমি পুনৰায় তোমাৰ বিবাহ দেব।

মহাজনক প্রশ্ন কৰেন সীবলীৰ অপৰাধ

: সে কথা শোনাৰ কোন পয়োজন নেই তোমাৰ। এ তোমাৰ প্ৰতি আমাৰ মাতৃআজ্ঞা।

মহাজনক এব মুহূৰ্ত্ত নীৰব থেকে বলেন আমাকে মাজনা কৰ। তোমাৰ এ আদেশ আমি মানতে পাবৰ না।

স্তম্ভিত বাজমাতা বোনে তোনাৰ আজন্ম সহচৰ মায়েৰ চেয়ে আজ নববৰই বেশী মূল্যবান ? এই তোনাৰ শিগ্গা ?

মহাজনক বলেন তুমি ভুল কৰছ না। জননীৰ আদেশেৰে চেয়ে এ দুৰ্নিযায় আমি কোন কিছুকেই বেশী মূল্যবান বলে মনে কৰি না। শুধুমাত্ৰ এৰুটি ব্যতিক্ৰম আছে তাৰ।

: কী সেই ব্যতিক্ৰম ?

: আমাৰ ধৰ্ম। মাতৃআজ্ঞায় আমি ধৰ্মকে বিসৰ্জন দিতে অক্ষম।

নিকপায় বাজমাতা আৰাব ডেকে পাঠালেন গ্রহাচাৰ্যকে। বললেন— মহাজনক সীবলীকে ত্যাগ কৰতে বাজী নয়। কিন্তু এ অসামাজিক বিবাহ কেমন কৰে মেনে নেব আমি ?

গ্রহাচাৰ্য বলেন—তোমাৰ এ প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ তো আমি পূৰ্বেই দিযেছি বাজমাতা। মহাজনক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। সংসাবে সে থাকবে না। বামিনীকাঞ্চনে তাৰ কোন মোহ নেই। নাবীমাত্ৰকেই সে জননীজ্ঞানে, ভগ্নীজ্ঞানে শ্ৰদ্ধা কৰবে। এমনকি সীবলীৰ গাত্ৰ-স্পৰ্শও সে কৰবে না কোনদিন।

সহসা দলিতা ভুজঙ্গীৰ মত ঋজুভঙ্গিতে উঠে দাঁডান বাজমাতা। বলেন—না! আমি

তা হতে দেব না ! স্বামীর বংশ আমি নির্বংশ হতে দেব না । সন্ন্যাস নিতে দেব না পুত্রকে ।
এ অসামাজিক বিবাহের কথা শুধু আমিই জানি । সমাজ জানে না । পাপ যদি কারও
হয়, হবে আমার ! আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব —কিন্তু পুত্রকে সুখী করতেই হবে ।

এহাচার্য মৃদু হাসলেন শুধু ।

নিরুপায় হয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন পুত্রবধূকে । সভয়ে সুসজ্জিতা নববধূর বেশে
সীবলী আগাব এসে দাঁড়ায় । কিন্তু আশ্চর্য, এবার আর কোন তিবস্কার শুনতে হল না
তাকে । পুত্রবধূর চিবুক স্পর্শ করে চুম্বন করেন রাজমাতা, স্নেহাঙ্গুষ্ঠে বলেন—সব কথা
তোমাকে বলতে পারব না । শুধু এটুকু জেনে রাখ - আমার পুত্রের ললাটলিখন সে অকালে
সন্ন্যাস হবে । যেমন হবে পাব সে ভাগ্যলিখন বার্থ করতে হবে তোমাকে । এই তোমার
ব্রত ! এই তোমার ধর্ম !

সীবলী শিউরে উঠেছিল সেকথা শুনে । তাব মনে পড়ে যায় এহাচার্যের গভিণাপোষ
কথা । মনে পড়ে যায়, গত ত্রয়ামা যামিনীৰ ক্লান্তিৰ অতিক্রান্তাব কথা । মহাজনক
এখনও গাত্রস্পর্শমাত্র করে নি এই ভুবনবাঞ্ছিতা রূপদপিতা নারীব !

এর পর থেকে শুরু হয়ে যায় এক নূতন অধ্যায়ে ঐ হতভাগা নারীর জীবনে ।
বিলাসবাসন ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে আয়োজনের দৃষ্টি নেই ; কিন্তু রাজা মহাজনক যেন শুভ্র
রাজহংস । সংসারের জলবিন্দু মলিন করে না তাঁর কুন্দশুভ্র পালক । তিনি সর্বদাই
কেমন যেন উদাসী, অন্তমনা । মণিদীপ্ত প্রমোদভবনের নিভৃত বিকচযৌবনা দেববাঞ্ছিতা
সীবলী প্রণয়মধুর কুজনে মহাবাজকে কাছে টানবার চেষ্টা করে, নৃত্যে-গীতে হাস্যে-লাস্যে
চুম্বনরভসে ঐ অনাসক্ত স্থিতপ্রাণ মাতুষটিকে বিহ্বল করে তুলতে চায় ;—কিন্তু হায়,
মন্দভাগিনী স্বতঃই লক্ষ্য করে কোন অসতর্ক মুহূর্তে ঐ তরুণ তাপসের মনের কোণে
বনিয়ে ওঠে আঘাতসঘন জলদগ্ধবক ; তাব দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়—দিগন্তনিবন্ধ দৃষ্টিতে,
পাখিব কোন কিছুই আর তখন নজরে পড়ে না তার ।

সীবলী বলে : তুমি কি আমাকে পেয়ে সুখী হও নি রাজা ?

মহাজনক বলে : তোমার স্নেহের মন্দাকিনীতে অবগাহন করে আমি ধন্য হয়েছি'
সীবলী ! মনে হয়, আমার নিজের কোন ভগ্নী থাকলেও আমাকে এত স্নেহ করত না !

সূর্যোদয়ে পূর্ণেন্দুর মত স্নান হয়ে যায় রাজকণ্ঠা ।

মৃণালভূজের দুটি বাহুতে মহারাজকে বন্দী করে বলে : কিন্তু আমার দেহমনের
নিভৃতে প্রেমাস্পদের জন্ত কী সম্পদ আমি লুকিয়ে রেখেছি তা তো তুমি দেখতে চাইলে না
কোন দিন ।

মহাজনক বলে : শুধু তোমার কেন সীবলী, এই জগতের মর্মমূলে কোন্ গোপন রহস্য
লুকায়িত আছে তাই যে আমি দেখতে চাই । বিশ্বাস কর, এই উপকরণের দুর্গে আমার

যেন শ্বাসবোধ হয়ে আসে, মনে হয় এ বাঁজেশ্বৰ্য্যেব অববোধেব মধ্যে আমাব স্থান নয়, আমাকে সুদূৰ যেন হাতছানি দেয়।

সীবলী গোপনে অশ্রু 'মোচন' কৰে। দৃঢ়তৰ কবতে চায় তাৰ প্ৰেমেষ নিগড়। পৰিচাৰিকাকে বলে—নব আভবে আমাকে সাজিয়ে দাও কিছবী। নিষে এস ইন্দ্রনীল-মণিহাৰ, পৰিয়ে দাও মণিখচিত স্বৰ্ণমেখলা, অলঙ্কৰবাগবঞ্জিত আমাব চৰণে দাও কলহংস-কণ্ঠ-নিঃশ্বনমধুৰ নূপুৰ।

প্ৰসাধনদক্ষাব অনলস কপসজ্জায় কোন কটি থাকে না। বানীৰ সীমন্তে একে দেয় বালকবিন্দু, স্তবকিত মেঘভাবেব মত অলকতুচ্ছে দেয় পুষ্পাভবণ, যৌবনের যুগ্ম-জয়স্তম্ভেব উপর নচনা কৰে বুদ্ধম-চন্দনেব বিচিত্ৰ আলিম্পন।

হানাজ দেখে মুগ্ধ হন, বলেন—আহা কী সুন্দৰ। যেন স্বৰ্গেব দেবী।

ওনে মৰমে মৰে যায় পোণজনক জনবা। আতকণ্ঠে বলতে চায়—ওগো না না, দেবী নয়, চেয়ে দেখ, আমি মত্বেব সামান্য নানবী। আমাব প্ৰতি বোমকুপে কামনাৰ শিহৰণ, আমাব প্ৰতি অঙ্গে সৃষ্টিৰ অভিল'ষ, আমাব শোণিত-সমুদ্ৰ আজ মিলন-ভূষিত যৌবন-জোষাব।

কিন্তু অনাখ্যাত কুমাৰীৰ অববোধ 'কিছুতেই উচ্চাবণ কৰতে পাবে না সেই নিৰ্লজ্জ ভাষ। বুক ফাটে, তবু তাৰ মুখ ফোটো না।

বাজনটীকে নিদেয় দেয় নিত্য নবীন সাজে, নিত্য নতন নৃত্যভঙ্গিমায মহাবাজেব চিত্তবিনোদন কৰাত। কিন্তু বাজৰি মহাজনেব মান পাণ্ডিত্য তাত্ত্বিক বিচলিত হয় না। দিন যায়, মাস যায়, ঋতুও যুবে যুবে আসে উৰ্বশী-নান্দিত কপৰ পশৰা সাজিয়ে সীবলী বুখাং প্ৰহৰ গণে। মহাজনকেব স্নেহ-কল্পনা-নাভে সে বঁধি তান, কিন্তু সে যেন ভগ্নীৰ প্ৰতি প্ৰাভাব প্ৰম। এ লক্ষ্যাব কথা, এ পৰাভায়েব কথা কাউক বলতে পাবে না প্ৰাণ খুলে নিকটতমা সখীৰ কাছত নয়।

গন্তবঙ্গা বয়স্কাৰ দল প্ৰশ্নবাণে জৰ্জৰিত। ক'ব তালে তাদেব প্ৰিয় সহচৰীকে। তাৰা জানতে চায় সখ্যোবিবাহিতা বোবনবতীৰ প্ৰতি-বজনীৰ বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা। সকৌতুকে ওণা কলকণ্ঠে প্ৰশ্ন ক'বে। অত সক্ষেপে ব'লে চলবে না বাজকুমাৰী, আবঙ বিস্তাৰিত ক'ব বল। এস প্ৰশ্নে অনাদৃতা বাজনান্দনীৰ হৃৎপিণ্ড যেন নিষ্পোষিত হয়ে যায়। মন্দভাগিনী মিথ্যাব কুহক বচনা কৰে। স্বকপাল-বল্লিত মিলনেব বৰ্ণনা দেয় যে মিলন আজও হয়নি, যাব স্বপ্ন দেখে সে প্ৰতি বাএ মহাবাজেব পাৰ্শ্বে একাকী বাত্ৰিয়াপনে।

কিন্তু ওদপেক্ষা কঠিন সমস্যাৰ সম্মুখীন হতে হয় ওকে যখন নিঃশব্দ মিলন-বাত্ৰিৰ অবসানে ছাব খুলে বোবয়ে এসে দেখে আলাদেব একান্তে পাপেক্ষা কৰছেন মহাজনক-জননী। পুত্ৰবধূকে বুকে টেনে নিয়ে যখন তিন একান্ত আত্মহে প্ৰশ্নবাণ নিক্ষেপ কৰতে থাকেন : আমাৰ কাছে কিছু গোপন কৰ না মা, বল, সত্য কৰে বল, কবে*দেখতে পাব মিথিলা-বাজ্যেব উত্তরাধিকাৰীকে ? কবে তুমি সফল কৰবে আমাৰ স্বপ্ন।

সে প্রেমের গরলে জর্জরিতা হয়ে যায় যৌবনদৃশ্য সীবলীর কন্ডতলু।

মন্দভাগিনী অনুভব করে আর বিলম্ব করা অনুচিত। মধুমাসের এক পূর্ণিমারাত্রে সে যেন প্রগল্ভা বারবণিতার মত উদাম হয়ে ওঠে। প্রসাধনদন্ডার রূপসজ্জাকে নিক্ষেপ করে দূরে। খুলে ফেলে রক্তাশ্রু পটুবস্ত্র, ময়ূরকণ্ঠিধ্বনি মেখলাবাস, অন্তর্যাসের চম্পকচীনাংগু। সজ্জামাতা নিরাবরণার বেশে সজ্জিত করে অনিন্দ্যাসুন্দর বরতলু। মণি-স্তবকিত বেণীতে দেয় ইন্দ্রনীলের চন্দ্রকণা, কনুকেরে ছলিয়ে দেয় মৌক্তিকনিখার শতনরী, অপাবৃত গুরুনিতম্বে ঝুলিয়ে দেয় মাণিক্যখচিত স্বর্ণমেখলা!

মণিদীপজ্বালা প্রমোদকক্ষে রত্নসিংহাসনে যেখানে প্রতীক্ষা করছিলেন মহাজনক ধীর পদ সেখানে এসে দাঁড়ায়। অপাপবিদ্ধ ছটি মুগ্ধনয়ন তুলে মহারাজ দেখতে থাকেন এই অপরাধা নারী মূর্তিকে—নিরাবরণার সঙ্কুঠ লাজনম্র ভঙ্গী। সীবলী বসে পড়ে তাঁর পাশে—লুটিয়ে পড়তে চায় আশ্রয়-শয়নে; কিন্তু দেখে উদাসী আনমনা হয়ে গেছেন মহারাজ!

আর্তকণ্ঠে রত্নাতুরা সীবলী বলে: আজ আমাকে দেখে তোমার মনে কোন বাসনা—কোন কামনা জাগছে না মহারাজ?

দূর-দিগন্তে নিবদ্ধদৃষ্টি রাজর্ষি বলেন—জাগছে সীবলী! ইচ্ছা করছে আমার মন্দিরের দেবীপীঠে বসিয়ে তোমাকে আজ পূজা করি!

যেন এক আর্ত হাহাকারে ভেঙে পড়ে সীবলী। এতক্ষণে মনে হয়, সে রতি-মন্দির দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রিনীর মত নিরাবরণা নয়, সে প্রগল্ভা নির্লজ্জা বারবণিতার মত নগ্নিকা! দু হাত বাড়িয়ে খুঁজতে থাকে তার লাজবস্ত্র!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। একদিন গোপনে মহারাজ বেরিয়ে গেলেন হস্তিপুষ্ঠে হিমাবলী পবনের সান্নিধ্যের এক সন্ন্যাসীর দর্শনমানসে। সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল। গুরু-শিষ্যে কি কথোপকথন হল জানি না, কিন্তু মহারাজ প্রাসাদে ফিরে এলেন যেন অশ্রু মানুষ। রাজমাতা সীবলীকে জনান্তিকে ডেকে বলেন: ছি ছি ছি! কেন মুহূর্তের জন্তুও শিথিল করেছিলে তোমার আলিঙ্গনপাশ—কেন ওকে যেতে দিলে ঐ সন্ন্যাসীর সান্নিধ্যে?

কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে। মহাজনক তাঁর মনোবাসনার কথা অকপটে জানানলেন সীবলীকে। এতদিনে তিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন। এ রাজৈশ্বর্যের ঝিল্লাস-বাসনে তাঁর অভিরুচি নেই—তিনি সন্ন্যাস নেবেন। উপকরণের এ ছুর্গটিকে ত্যাগ করে যাবেন তিনি।

সীবলী আর্তকণ্ঠে বলে: উপকরণের ছুর্গ কাকে বলে মহারাজ? এ রাজপ্রাসাদ, এ ঐশ্বর্য কেন ঘৃণাই?

মহাজনক বলেন—সে তো তুমি বুঝবে না সীবলী। সে তো কথায় বোঝানো যায় না।

: তবে কেমন করে বোঝা যায় ?

: সময় যখন হবে তখন আপনি বুঝবে ।

এ-মর্যাদাসিক দুঃসংবাদে মহাজনক-জননী শয্যা নিলেন । আর উঠলেন না ! তবু মহাজনক রইলেন অটল । 'বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী সীবলীর অশ্রুবন্তায় ভেসে গেল মেদিনী, তবু মহারাজ তাঁর সঙ্কল্পে অটল । অশ্বপৃষ্ঠে তিনি রাজধানী ত্যাগ করে গেলেন । তাঁর প্রিয় প্রজার দল শঙ্খঘণ্টাধ্বনি করে তাঁকে এগিয়ে দিয়ে এল রাজ্য-সীমান্ত পর্যন্ত । সংবাদ পেয়ে উন্মাদিনীর মত ছুটে এল উপেক্ষিতযৌবনা সীবলী, আতর্কণ্ঠে বললে—আমাকেও সঙ্গী করে নাও । আমি তোমার সাধনার পথে অন্তরায় হব না । বিশ্বাস কর ।

মহাজনক বলেন—এ পথ তোমার নয় শুচিস্মিতে ! এ যে আমার একলা চলার পথ !

আতর্কণ্ঠে সীবলী বলে—আমি এখানে কি নিয়ে থাকব ? স্বামী বনবাসী, সন্তান-লাভে বঞ্চিতা এ নারী কী অবলম্বন কবে বেঁচে থাকবে এর পর ?

অবিচলিতকণ্ঠে মহাজনক বলেন, ধর্মই মানবমাত্রের অবলম্বন ।

সীবলী শেষ আতর্নাদ করে ওঠে—আমি মানব নই মহারাজ, আমি মানবী ! আমি সন্তান চাই, মাতৃহ চাই,—মানবীর তাই যে ধর্ম মহারাজ । আপনার স্বর্গগতা জননীর কাছে আমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

ধূলায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে সীবলী । দীর্ঘ সময় । কেউ তাকে বাহুমূল খরে উঠিয়ে বসায় না । অবশেষে সে নিজেই উঠে বসে । দেখে, বিজন প্রান্তরে সে একাকী ! মহাজনক চলে গেছেন তাঁর মহাপ্রস্থানের পথে ।

সীবলী উঠে দাঁড়ায় । মনস্থির করে । মহাজনক যদি তপস্তা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন, তবে সে-ও সিদ্ধকাম হতে পারবে সাধনার পথে । মহাজনক-জননীর কাছে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, মহাজনক-পুত্রকে সে জঠরে ধারণ করবে ।

একে একে সীবলী খুলে ফেলে তার রত্নভরণ, কেয়ুর-কণ্ঠি-মণিবলয়-সীমন্তী-মেখলা । স্বর্ণখচিত চীনাংশুরের পরিবর্তে অঙ্গে তুলে নেয় ভিক্ষুণীর পীত অজিন । জলদস্তবক-নিন্দিত কেশভার চ্যুত হয় মস্তক থেকে । মুণ্ডিতশীর্ষা শ্রমণীর বেশে প্রস্তুত হয় সে । বিছায় হয় মি, রূপে হয় নি, ভালবাসায় হয় নি—এবার অভাগিনী মেয়েটি শেষ চেষ্টা করে দেখবে, তপস্তায় হয় কি না ! মিথিলা-রাজ্যের সীমান্তে এক আশ্রয়কাননে, ঠিক যে স্থানটিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে মিথিলাধিপতি তাঁর রানীকে শেষ সন্মোদন করে বিদায় নিয়েছিলেন, ঠিক তার পাশেই তৈরি করে নেয় মৃত্তিকালিপ্ত এক পর্ণকুটীর । ভিক্ষুণীর আবাসস্থল ।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী আর বৃদ্ধ গ্রহাচার্য । মহামন্ত্রী বলেন, এ কঠোর তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য কী রানী ?

সীবলী বলে, আর রানী নয় মহামন্ত্রী, আমি এক সামান্য ভিক্ষুণী ! গ্রহাচার্যের দিকে ফিরে বলে, অনেক প্রগল্ভতা করেছি, ক্ষমা করুন, তবু যাবার আগে বলে যান, আমি কি আমার তপস্তায় সিদ্ধকাম হতে পারব না ?

: কী তোমার কামনা সীবলী ?

: মহারাজের পুত্রকে জঠরে ধারণ করা। স্বর্গগতা মহারাজ-জননীর কাছে আমি যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ !

গ্রহাচার্য ম্লান হেসে বলেন, তুমি কি ভেবে দেখছ সীবলী, তোমার সিদ্ধিলাভ মানেই মহারাজের ভ্রতচ্যুতি ?

অচঞ্চল দীপশিখার মত যুক্তকরে সীবলী বলে ওঠে : আচার্যদেব ! মহারাজের কী ভ্রত আমি জানতে চাই না। আমি চলেছি আমার ধর্মপথে ! মাতৃহ-ধর্মের চেয়ে নারীজন্মে বড় ধর্ম নাই ! আপনি বলুন ত্রিভুবনে কি এমন শক্তি আছে, যে আমাকে এই একনিষ্ঠ সাধনা থেকে চ্যুত করতে পারে ? আমার সিদ্ধিলাভে অন্তরায় হতে পারে ?

গ্রহাচার্য আশীর্বাদ করে বলেন, তোমার মুখে আজ স্বর্গের ছাতি দেখতে পেয়েছি সীবলী ! তোমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারে ত্রিভুবনে এমন শক্তি নাই ! তুমি সিদ্ধকাম হবেই।

মহামন্ত্রী শিউরে উঠে বলেন, কি বলছেন আচার্যদেব ! তাহলে কি ব্রাতা হবেন মহাজনক ? তিনি যে স্বয়ং বোধিসত্ত্ব !

: না ! তিনিও সিদ্ধিলাভ করবেন তাঁর কঠোর সাধনায়। চিরকৌমার্যব্রত অনলিন থাকবে তাঁর !

মহামন্ত্রী বিহ্বলের মত বলেন, মার্জনা করবেন গ্রহাচার্য, এবার যে আমাকেই বলতে হচ্ছে—আপনার ভবিষ্যদ্বাণীর কোন যুক্তিনির্ভর পারস্পর্গ থাকছে না !

এবার আর রাগ কবেন না গ্রহাচার্য। বলেন, অযৌক্তিক কথা আমি বলি নি মন্ত্রীপ্রবর ! চন্দ্রদ্বীপের অব্যুত পাণিপ্রাণীর কাছে যে সমস্যা ছিল সমাধানের অতীত, দেখেছি নিশ্চয় মহাজনকের কাছে তা মনে হল সহজ সরল। তেমনি তোমার-আমার কাছে যা নাকি মনে হচ্ছে সমাধানের অতীত সমস্যা—বিশ্বপ্রপঞ্চের এক অলঙ্কা নাট্যকারের কাছে তাহ সহজ সরল। মহাজনক এ জন্মে চরমসিদ্ধি লাভ করতে পারবেন না। তবু সাধনমার্গে অগ্রসর হয়ে যাবেন অনেকখানি। বহু জন্ম পরে শাক্যবংশে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন সিদ্ধার্থ গৌতমরূপে। সেই জন্মেই তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করবেন—হবেন বুদ্ধদেব ! মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন সেই জন্মে। তেমনি ম সীবলীও এ জন্মে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন না। তবে তিনিও অগ্রসর হয়ে যাবেন অনেকটা পথ—তাঁর মাতৃহ-তীর্থের পথে ! বহু জন্ম পরে তিনিও আবার আবির্ভূত হবেন এই ধরাধামে সুপ্রবদ্ধতনয়া যশোধরার ভূমিকায়। সেই জন্মে মহাজনককে মিটিয়ে দিতে হবে সীবলীর দাবি ! সীবলী সেই শেষ জন্মে জঠরে ধারণ করবে বাজপুত্রকে ! সেই ভুবন-বিজয়ী পুত্রের নাম হবে রাজল !

সীবলী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে বলে, রাজল ! রাজল ! এই আশীর্বাদই করুন !

মহামন্ত্রী বলেন, কিন্তু এ পর্ণকুটীর কেন মা ? ঐ অপকৃপ চৈত্যাগৃহের উপযুক্ত ফটিকনির্মিত সজ্জারাম নির্মাণক রিয়ে দিই আমি। তুমি সেখানেই তপস্যা কর।



ଚିତ୍ର—୧
ମହାଜନକ ଜାତୀ—ପ୍ରଯୋଦକମ୍ବ ମହାଜନକ ଓ ମୌବଳୀ
ଅବସ୍ଥାନ—୧।୨କ

সীবলী হেসে বলে : কিন্তু সে ফটিকনির্মিত উপকরণের ছর্গে যে আমার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে মহামন্ত্রী !

মহামন্ত্রী বলেন : তোমার কথা যে আমি বুঝতে পারছি না মা। উপকরণের গর্ভ কাকে বলে ?

অতি দূঃখেও সীবলীর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে অস্তচন্দ্রের মত স্নান হাস্যরেখা। বলে—
এ কথার অর্থ যে কানে শুনে বোঝা যায় না বিপ্রবর !

মহামন্ত্রী বলেন : তবে কেমন করে বুঝতে হয় মা ?

সীবলী বলে : জীবন দিয়ে !

জাতকবর্ণিত মূলকাহিনী ঐটুকুই। অজন্তাব শিল্পী এই কাহিনীটুকু অবলম্বন করে রূপায়িত করেছেন অপরূপ একটি চিত্র-কাহিনী (১১২ক—১১৬)। দেওয়াল চিত্র তো নয়, যেন একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক।

প্রথম অঙ্কে দেখছি (চিত্র—৭ অর্থাৎ ১১২ক), মণিদীপিত প্রমোদভবনে একটি রত্নসিংহাসনে বসে আছেন মহাজনক এবং বানী সীবলী। এ যেন সেই মধুমাসের বিচিত্র পূর্ণিমারাত্রির ঘটনা। মহাবাজের সর্বাঙ্গব্যবে মহামূল্য অলঙ্কারের সমারোহ। কিন্তু রানীর অঙ্গে নেই প্রসাধনদক্ষার নির্বাচিত পটুবাস। ওঁদেব ঘিরে রয়েছে নয়জন পরিচারিকা—ছত্রধারিণী, বাজনিকা, করঙ্কবাহিনী ইত্যাদি। সীবলীর দক্ষিণহস্ত মহারাজের বামজানুতে স্থাপ্ত, আল্লেখ-শয়না এই বিবসনা নারীর অঙ্গের প্রতিটি বেখা যেন মহাবাজের দিকে ছুটে যেতে চায়। আত্মসমর্পণে উন্মুখ এক বতাতুরা নারীমূর্তি। কিন্তু রাজার দৃষ্টি শূন্যে নিবদ্ধ।

বেশ বোঝা যায়, সে দৃষ্টি উদাসীনের, বীতরাগ নিম্পৃহের। প্রমোদকক্ষে কয়েকটি অলঙ্কৃত স্তম্ভ, উপর থেকে ঝুলছে মুক্তামালা। বাজাব সম্মুখে একটি পিকদানী, নিম্নাংশে ইটের গাঁথনিতে জোড়াইয়ের কাজ নিখুঁত। দূরে একটি প্রাসাদেব ইন্দ্রকোষ। অলিন্দের এ প্রান্তে একটি স্তম্ভের কাছে দুটি সখীতে কি নিয়ে যেন জল্পনা করছে, বোধ করি ওবা রাজারানীর অস্তদ্বন্দ্বের কিছুটা আভাস পেয়েছে। দ্বারের বাহিরে রাজনর্তকী তার গীতবাণের সহচরীদের নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—ইঙ্গিতমাত্রে যেন শুরু হয়ে যাবে নৃত্যগীতের আসর। রাজনটীর কবরী কুসুমসজ্জিত, অঙ্গে তাব বুড়িদার পুরো-হাতা জ্যাকেট, তার নয়নকোণে বিলোল কটাক্ষ।

দ্বিতীয় অঙ্কে নীচের প্যানেলে দেখছি, রাজা হস্তিপৃষ্ঠে চলেছেন সন্ন্যাসীর দর্শনমানসে। তিনি একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করছেন। বলা বাহুল্য, এটি রাজপ্রাসাদের প্রধান তোরণদ্বার (১১২খ)।

তৃতীয় অঙ্কে দেখছি, হিমাবলী পর্বতের পাদমূলে মহাজনক বসে আছেন মহাসন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে (১১২গ)। যুক্তকর তাঁর মূর্তিটি সত্যই সত্যাত্মকীয় মুমুকুর। সন্ন্যাসীর হাতে জপমালা, মাথায় জটাভার, বসে আছেন বনকুসুম-লাঙ্ঘিত এক প্রস্তরাসনে। তাঁর



চিত্র—৮

মহাজনক জাতক—মহাজনক প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প জানাচ্ছেন মহাজনকের মহা নিষ্কামণ

অবস্থান ১২২৮

চবণতলে ছুটি উন্মুখ মৃগশিশু উদ্বিগ্ন মুখে যেন তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনছে। এ ধর্মপ্রচাবের দৃশ্যটি আঁকবার সময় কি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অবচেতন মনে সাবনাথ-মৃগদাবে গৌতমবুদ্ধের প্রথম ধর্মপ্রচাবের কথা জাগরক হয়েছিল? তাই কি এই ছুটি মৃগশিশু এ চিত্রের আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে পড়েছে?

তারপর চতুর্থ অঙ্কের আগে দেখছি, একটি ছোট গভাক্ষ দৃশ্য। মহাজনক-জননী সীবলীকে ভৎসনা কবছেন। যুক্তকবে সীবলী তার অপবাদ স্বীকার কবছে। (চিত্র—৮; ১।২ঘ বামপ্রান্তে)

চতুর্থ অঙ্কের দৃশ্যপট প্রথম অঙ্কের মত। সেই সুশোভিত মণিদীপজ্বালা প্রমোদক। সেই বহুসিংহাসনে বসে আছেন মহাজনক আর সীবলী--যাঁদের দেখেছিলাম নন্দবিবাহের কপে এই কক্ষেই প্রথম দৃশ্যে। কিন্তু পটভূমির কি বিবর্ত পবিবর্তন।

শিল্পীর সৃষ্টিহাতের কাজ অনুধাবন করতে হলে প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যটির (অথাৎ চিত্র ৭ এবং চিত্র ৮-এর) একটি তুলনামূলক সমালোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পূর্বদৃশ্যে দেখেছি, সন্তোষবিবাহিত মহাজনকের সবাক্ষে মণিমাণিক্যের পাচুর। তার নগ্নে ক্রমাগত তিন সারি বহুমূল্য মণিহার। এবার সেখানে দেখছি মাত্র একছড়া মাণিক্য। যেন কদ্রাক্ষ! পূর্বদৃশ্যে বাজার দৃষ্টি ছিল শূন্যে নিবদ্ধ, উদাসীন পথপ্রান্ত পাথরের আবিল দৃষ্টি—তার দাক্ষিণ্যহস্তের মুদ্রায় দিশাহাবার ব্যঞ্জনা। এবারে দেখাচ্ছি, তার দৃষ্টি মোদনোন্নিবদ্ধ, বকগাথ আশ্রুত। এবার তার কবাক্ষলিতে দিশাহাবার পথপ্রান্ত নারিবের অভিব্যক্তি নেই ছুটি হাতে তিনি বচনা কবেছেন প্রাবল্যে বমচক্রমুদ্রা। তিনি যে পথের সন্ধান পেয়ে গেছেন এবার। অপবপক্ষে, সাবলার পবিবর্তনটা আরও অববহ, আরও ককণ। পথের দৃশ্যে সাবলা ছিল বস্তুতঃ নিবাবনা, অথবা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বক্রাবৃত্তা, বাজপুত্রের বানভাষ্যে তার দেহভাব ছিল শূন্য। তিনি সেবার এত সুসুন্দর-নন্দিত যৌবনোদ্ধত কণের শিবল পাবে মহাজনককে বেবে বাথতে উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিন্তু এবার দেখছি, তার অঙ্গে উঠেছে লজ্জাবরণ। তিনি আর আগ্রহ-বনা নন। মহাবাহুর সনজ্ঞের দৃঢ়তা ডাঙা কবে সীবলীও নিবাত নিকম দাপাশিখান নত স্বজুভাষ্যের উপাবস্থা।

একটি কথা এহ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বিশেষতঃ যখন দেখছি পূর্বসূরীরা আদিকটা নিয়ে আলোচনা কবেন নি।

বাৎসায়ন-প্রণীত কানসুত্রের টাকায় যশোধর প্রসঙ্গক্রমে একটি শ্লোক সন্ধান কবে বলেছিলেন চিত্রের ছয়টি অঙ্ক।

কপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবল্যাবগায়োজনম

সাদৃশ্যং বণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং বড়ঙ্গকম্ ॥

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ভাবতর্কিনী বড়ঙ্গ’ নিবন্ধে এ-বিষয়ে সর্বশেষ আলোচনা ভারতীয় চিত্রে বড়ঙ্গ কবেছেন। তার মূল বক্তব্যটুকু আলোচনা কবে নিয়ে আমরা যদি আমাদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি তাহলে আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে কিছু সুবিধা হবে।

আচার্য বলছেন, আলেক্সেয়র ছয়টি অঙ্গ। কী তারা? না—রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য আর বর্ণিকাভঙ্গ। এই শব্দগুলির অর্থ কি?

রূপভেদ—অর্থাৎ, পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান। এই প্রপঞ্চময় জগৎ থেকে শিল্পী একটি বা কয়েকটি বিশেষকে বেছে নিয়ে তাঁর আলেক্সেয়র বিষয়-বস্তু নির্বাচন করছেন।

রূপভেদ

সেই বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর যে বাহ্যিক রূপ, সে সম্বন্ধে চিত্রকরের সম্যক জ্ঞান থাকা উচিত। অর্থাৎ, শিল্প-নিদর্শনটি দেখে দর্শক যেন বুঝতে পারে চিত্রের বিষয়-বস্তুটা কী। চিত্রটি নর অথবা নারীর, অল্প অথবা অধিক বয়সী, কোন্ দেশের, কোন্ শ্রেণীর মানুষ ইত্যাদি। হরিণ আঁকলে তাকে অনুদগতশৃঙ্গ মেঘ বলে যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শকদল ভুল করে বসে, তবে বুঝতে হবে শিল্পীর রূপভেদ সম্বন্ধে ধারণা পর্যাপ্ত নয়।

প্রসঙ্গতঃ, এ শতাব্দীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী পিকাসো-র সম্বন্ধে প্রচলিত একটি গল্পের কথা মনে পড়ছে। জগদ্বিখ্যাত শিল্পীর কাছে প্রতিদিন অসংখ্য চিঠিপত্র আসে—যে ডাক-পিয়ন তাঁর চিঠিগুলি লেটার-বাক্সে রোজ রেখে যায়, তার ভারি কৌতূহল ছিল শিল্পীকে স্বচক্ষে দেখার। বেচারির বরাত খারাপ, রেজিস্ট্রী চিঠি এলেও শিল্পীর একান্ত-সচিব সেগুলি সই করে নেন। শিল্পীর আর দর্শন মেলে না। শেষ পর্যন্ত ডাক-পিয়ন দারোয়ানজীর শরণাপন্ন হল। দ্বারপাল শেষবেশে দয়াপরবশ হয়ে একদিন সুযোগমত ওকে বললে, আজ একান্ত-সচিব মশাই বাড়ী নেই। তুমি সোজা ভিতরে স্টুডিওতে চলে যাও।

ডাক-পিয়ন বললে, ভিতরে আর কে আছেন?

: আর কেউ নেই। শিল্পী আর তাঁর দশ বছরের ছেলেটি আছে।

সাহসে ভর করে ডাক-পিয়ন ঢুকে পড়ে ঘরে। দেখে ঘরের চারিদিকের দেওয়ালে শুধু ছবি আর ছবি। শিল্পী আর তাঁর বালক-পুত্র বসে আছেন সেই চিত্র-সত্তারের মাঝখানে। সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে শিল্পীকে রেজিস্ট্রী খামটি এগিয়ে দিল ডাক-পিয়ন। কলম বার করে শিল্পী সই করছেন, ডাক-পিয়নের মনে হল এই অবকাশে কিছু বললে ভাল হয়—তাহলে বন্ধুদের কাছে বলতে পারবে স্বয়ং পিকাসো-র সঙ্গে সে বাক্যালাপ করেছে। তাই অনেক বুদ্ধি খরচ করে ডাক-পিয়ন বললে, ছোটকর্তাও দেখছি তার বাবার মত ছবি আঁকার চেষ্টা করেছে। ভাল, ভাল!

পিকাসো একটু অবাক হয়ে বলেন—এ-কথা মনে করছ কেন?

একগাল হেসে ডাক-পিয়ন বললে—ঐ ঘোড়ার ছবিখানি নিশ্চয় আপনার পুত্রের আঁকা। চমৎকার হয়েছে!

পিকাসো জবাব দেন নি। মুহূর্তে হেসেছিলেন শুধু।

কারণ, চিত্রটি পুত্রের নয়—পিতার আঁকা। বিশ্ববিখ্যাত একটি শিল্পকর্ম, ঘোড়া নয়—হরিণ : 'তু হেড অফ এ কন!'

গল্পটি উল্লেখ করলুম এজন্য যে, এ নিয়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। ডাক-পিয়নও একজন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন দর্শক। সে বেচারি যদি হরিণকে ঘোড়া বলে ভুল করে, তবে কি আমরা ধরে নেব শিল্পী পিকাসো-র 'রূপভেদ' সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞান নেই? এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না। কারণ, স্বয়ং পিকাসো-ই তার জবাব সম্প্রতি দিয়েছেন এবং তাঁর সে স্বীকারোক্তিতে সারা বিশ্বের চিত্র-সমালোচকরা নূতন করে ভাবতে শুরু করেছেন।

সে যাই হোক, রূপভেদের আনুযায়িক হিসাবে এসে পড়ে প্রমাণ, অর্থাৎ নানাবিধ মাপজোখ। বানর ও নরের পার্থক্য শুধু একটি সুদীর্ঘ অঙ্গবিশেষের অস্তি-নাস্তির উপরেই নির্ভরশীল নয়। হাত-পা-মুখ-দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের আপেক্ষিক মাপের বহুবিধ পার্থক্যই প্রমাণ দেয় এ চিত্রটি নরের, ওটি বানরের। আমাদের প্রাচীন শিল্প-সাধকরা শিল্পমূর্তিকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন; যথা—নর, ত্রুর, আসুর, বালা এবং কুমার। এই পাঁচ শ্রেণীর মূর্তি গঠনের জন্য বিভিন্ন প্রকার তাল ও মান নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন নরমূর্তি—দশতাল; ত্রুরমূর্তি—দ্বাদশতাল; আসুরমূর্তি—ষোড়শতাল; বালামূর্তি—

প্রমাণ

পঞ্চতাল; কুমারমূর্তি—ষট্‌তাল। শিল্পীর নিজমূর্তির এক-চতুর্থাংশকে বলে এক আঙ্গুল; এই রকম দ্বাদশ অঙ্গুলিতে বা তিন মূর্তিতে হয় এক তাল। শিল্পাচার্যরা বলেছেন, রাম, রসিংহ, ইন্দ্র, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি হবে নরমূর্তি অর্থাৎ দশতাল। চণ্ডী, ভৈরব, বরাহ প্রভৃতি হবে দ্বাদশতালের ত্রুরমূর্তি। হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, মহিষাসুর প্রভৃতি হবে ষোড়শতালের আসুরমূর্তি। বালামূর্তি হবে বটকৃষ্ণ, গোপাল প্রভৃতি এবং কুমারমূর্তি হবে বামন, কৃষ্ণসখা ইত্যাদির। শুধু তাই নয়, দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ কোন্ মূর্তিতে কত হবে তাও বলা আছে—নরের ও নারীর পৃথকভাবে। প্রশ্ন হতে পারে, এত বাঁধাবাধির মধ্যে মূর্তি গড়তে গেলে বৈচিত্র্য আসবে কোথা থেকে? সবই তো একঘেয়ে হয়ে যাবে। না, তা যাবে না! বৈচিত্র্যের জন্য ঈশ্বর এই ছুনিয়ার আড়াইশ কোটি মানুষের কাউকে চার-হাত ছই-মাথা করেন নি। মানুষের অবয়বের একটি প্রাথমিক পারস্পর্য সত্ত্বেও প্রত্যেকটি মানুষ বিশেষ। তেমনি শিল্প-সম্মত এই সব মাপজোখ মেনে চলা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীরা বৈচিত্র্যের স্বাদ আনতে পেরেছেন তাঁদের শিল্পকর্মে। সে যাই হোক, এই মাপজোখ, এই গাণিতিক হিসাবকেই যশোধর বলতে চেয়েছেন চিত্রের দ্বিতীয় অঙ্গ বা 'প্রমাণ'।

চিত্রের বহিরঙ্গের রূপ দিতে এল রূপভেদ ও প্রমাণ—তার পরের অঙ্গটি হচ্ছে 'ভাব'। সেটি বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গের জিনিস। ভাবের কিছুটা আমরা বুঝতে পারি ভঙ্গীতে। কিছুটা অনুধাবন করতে হবে হৃদয় দিয়ে। ও মেয়েটি গালে হাত দিয়ে

ভাব

বসেছে—ও ভাবছে; এ ছেলেটি তরবারির মুট ধরেছে, এ ক্রোধাক্ত; এগুলি হচ্ছে প্রকট ভঙ্গী; এর ভাব বুঝতে অসুবিধা হয় না! কিন্তু ঐ যে মেয়েটির মেদিনীনিবন্ধ দৃষ্টি ও লজ্জাবনতা—ঐ প্রোষিত-ভর্তৃকার 'অসম্বন্ধ

কবরীপাশ, ওর চুলবাঁধায় মন নেই, এগুলি অনুধাবন করতে হলে আর একটু অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। কিন্তু ভাবের রাজ্য তো ওখানেই শেষ নয়—অধরের একটু কম্পনে, অর সামান্যতম কুঞ্জে, হাতের বিশেষ একটি মুদ্রায় শিল্পী অনেক কিছু অনেক সময় বলতে চান—সেগুলি দেখবার চোখ চাই। কিন্তু এহ বাহ! শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলছেন :

চিত্র করিবার সময় দেখাইব কতখানি এটাও যেমন ভাবিতে হইবে, দেখাইব না কতখানি তাহাও বিচার করিতে হইবে। কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব? প্রচ্ছন্ন বাহা তাহাকে খুলিয়া দেখাইলে তো সে আব প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়ার উপরে আতপের প্রয়োগ করিয়া ছায়াকে তো দেখাইতে পাবিনা—সে যে আতপ পাইলেই দূরে পালায়। কাজেই দেখিতেছি, ছায়া দেখাইতে হইলে আমরা যেমন আতপের সম্মুখে কোনো এক পদার্থ আড়াল করিয়া ধরিয়া—যেমন গাছটি কিম্বা আমার হাতখানি ধরিয়া দেখাই ‘এই ছায়া’, তেমনি চিত্রেও ব্যঞ্জনা দিই আমরা যেটা প্রচ্ছন্ন তাহার আর যেটা স্পষ্ট তাহার মাঝে কিছু একটা আড়াল দিয়া।

কুটিরটি আধখানা লিখিলাম, আর আধখানি গাছের আড়ালে ঢাকিয়া দিলাম, কুটিরের লেখা অংশটি কুটিরের ভঙ্গী বা কুটিরের ভাবের প্রকাশের দিকটা আমাদের দেখাইল, আর গাছের আড়ালে ঢাকা কুটিরের প্রচ্ছন্ন অংশটুকু ইঙ্গিতে জানাইতে লাগিল কুটিরের ভিতরের ভাব, কুটিরবাসীর নানা লীলা। সেদিকটার আমবা করনা করিয়া লইতে পাবি নানা অলিখিত বস্তু।

বস্তুতঃ, এই ভাবের রাজ্যেই শিল্পীর সঙ্গে দর্শকের আত্মীয়তা। সবটুকু যদি শিল্পী বলে দেন, তাহলে ভাবরাজ্যের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়—কিন্তু এই যে কিছুটা ঢাকা, কিছুটা আড়াল-করা ভাবের রাজ্যে শিল্পী একটু আভাস একটু ইঙ্গিত দিয়ে ধেমো যান এবং এই যে সেই আভাস-ইঙ্গিতের পথ ধরে দর্শক ভাবরাজ্যে ভেসে চলেন এতেই চিত্র-দর্শনের প্রকৃত আনন্দ। প্রকৃতিও একজন উচুদরের শিল্পী, তাই তার অনেক রহস্য আজও হৃদয়ের এবং তাতেই তার মাধুর্যের উপাদান। আর তাই ‘মাটির ছায়ার আধেক খুলিয়া আপন গোপন ঘর দেখায় বসুন্ধরা। সবটা যদি খুলে দেখাত তাহলে রহস্যের রোমাঞ্চ শিহরণ থেকে বঞ্চিত হতুম আমরা।

ভাবের পরে বলতে হবে লাবণ্যযোজনার কথা।

লাবণ্য শব্দটির সঙ্গে লবণ শব্দটির ধ্বনি-সাদৃশ্য থেকে আমার মনে একটা কথা জাগছে। কোন একটি তরকারি রাঁধবার সময় আলু, পটল, মাছ ইত্যাদি নির্বাচন করাকে

লাবণ্যযোজনা

যদি বলি ‘রূপভেদ’, বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ স্থির করাকে যদি

বলি ‘প্রমাণ’, তাহলে সেই তরকারিতে লবণ যোগ করাকে বলব

লাবণ্যযোজনা। অল্প ও পরিমাণ অনুযায়ী লবণ যতক্ষণ না যোগ করা হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বিশ্বাস ও আলুনা। কিন্তু আমার এই স্থূল উপমায় লাবণ্যযোজনার মর্মকথা যতটা উদ্ঘাটিত হল, তার চেয়ে অনেক মধুর করে অনেক হৃদয়গ্রাহী করে এই লাবণ্যযোজনার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্ঘাটন করেছেন শ্রীকপ গোস্বামীপাদ তাঁর একটি শ্লোকে :

মুক্তাকলেষুচ্ছায়াস্তরলমিবাস্তরা।

প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ॥

নিটোল একটি মুক্তার আকার আর আয়তন বোঝানো শক্ত নয়, তার বর্ণের কথাও বোঝানো যায় ; কিন্তু তার সর্বঙ্গে যে ঢলঢল তরলিত আভা সেটির বর্ণনা দেওয়া যাবে কেমন করে ? চিত্রকর মুক্তাটির রূপভেদ সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করেন, তার মাপজোখ বা প্রমাণও অনায়াসলভ্য—কিন্তু ঐ ঢলঢল তরলিত আভাটি যদি তিনি রূপায়িত করতে পারেন, তবেই তাঁর মুক্তা আঁকা সার্থক—সেটিই হচ্ছে লাবণ্যযোজনা !

কিন্তু লবণ না হলেও যেমন চলবে না, লবণের আধিক্যও তেমনি সুস্বাদু আহাৰ্যটিকে বিস্বাদ করে দিতে পারে। তাই পরিমিতি-বোধ লাবণ্যযোজনায় মূলকথা।

তুলি-কলমের জাতকর অবনীন্দ্রনাথ অতি অল্প কথায় লাবণ্যযোজনায় এই মর্মকথা ভারি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেইটুকু পাঠককে উপহার দিয়েই এ প্রসঙ্গের ছেদ গৈনব :

রূপকে যেমন পরিমিতি দেয় প্রমাণ, যথোপযুক্ত এবং যথাযথ মনোহর একটি সীমার মধ্যে আসিয়া, তেমনি লাবণ্য পরিমিতি দেয় ভাবের কাষকে বা ভঙ্গীকে অদ্ভুত ও উচ্ছ্বল ভঙ্গী হইতে নিবৃত্ত করিয়া। ভাবের তাড়নায় ভঙ্গী ছুটিয়া চলিয়াছে উন্মত্ত অশ্বের মতো অসংযত উদ্দাম অসহিষ্ণু, এমনকি অশোভনরূপে প্রমাণের সীমা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, লাবণ্য আসিয়া তাহাকে শাস্ত করিতেছে নিজের মধুর কোমল স্পর্শটি ধীরে ধীরে তাহার সর্বঙ্গে বুলাইয়া। ভাবের তাড়নায় রূপ যখন শকুন্তলা-প্রত্যাখ্যানকালে দুর্বাসা ঋষির মতো অপরিমিতরূপে হাত পা নাড়িয়া, দাঁত মুখ বিঁচাইয়া দন্দণ্ড ভঙ্গিতে দাঁড়াইতে চাহিতেছে, তখনই আমাদের লাবণ্য তাহাব কাছে আসিয়া বলিতেছে,— স্থিরোভব। পাগল হইলে যে।

প্রমাণের বন্ধনে যে কাঠাবতাটুকু আছে, লাবণ্যের বন্ধনে সেটুকু নাই, অথচ সেও বন্ধন, স্থনিশ্চিত একটি সুকুমার বন্ধন। সে প্রমাণের মতো জোরে বাশ টানিয়া অশ্বের ঘাড় বাঁকাইয়া দেয় না। কিন্তু তাহাব স্পর্শে অশ্ব আপনি ঘাড় বাঁকাইয়া লয় ও তালে তালে পা ফেলিয়া চলে। প্রমাণ যেন মাস্টার, বেত মাঝিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে, আব লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে হুলাইয়া যথেষ্টাচার হইতে নিবৃত্ত করিতেছেন।

লাবণ্যযোজনায় পর পঞ্চম অঙ্গের আলোচনা করতে হয়। সেটি ‘সাদৃশ্য’।

সাদৃশ্য কি ? না, সদৃশ্য ভাব ইতি সাদৃশ্য। কাব্যে বা সাহিত্যে আমরা উপমার সাহায্য নিয়ে থাকি। কখন ? যখন কোন বস্তু বা ব্যক্তির কোন গুণ প্রকাশ করতে গিয়ে বিশেষণের লগিতে আর এক বাঁও মেলে না, তখন আমরা উপমার দ্বারস্থ হই। তোমাকে

সাদৃশ্য

দেখবার জন্য আমার মন কতদূর ব্যাকুল হয়েছে বোঝাতে আমাকে

বলতে হচ্ছে ‘দেখিবারে আখিপাখী ধায়’। ছেলেকে পেয়ে মা

সব ভুলেছেন, ঘর-সংসার-আত্মীয়-পরিজন সব ছাড়তে তিনি প্রস্তুত, তাই বলেছেন, ‘ধনকে নিয়ে বনকে যাব সেখানে খাব কি ?’ জবাবে নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছেন ‘বিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি’। এখানে আর বিশেষণে কুলাল না, আঁখিকে ‘পাখী’ করে প্রেমিকের, পুত্রকে ‘চাঁদ’ করে মায়ের মনের আকুলতা মিটল।

কাব্য ও সাহিত্যেও যেমন চিত্রেও তেমন, অনেক কথা না বলে উপমা বা সাদৃশ্যের সাহায্যে অল্প রেখায় অল্প রঙে মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। তাকেই বলি 'সাদৃশ্য'।

কাব্যে বা সাহিত্যে উপমা-রূপকের কোথায় শেষ তা আমরা জানি! তাই রসোপলব্ধিতে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। আকাশের চাঁদের সঙ্গে বাছনির মুখচন্দ্রের তুলনায় শুধু চাঁদের দীপ্তি, সৌকুমার্য আর লাবণ্যটুকুকেই আমরা বুঝে নিই—আকার বা আকৃতিগত সাদৃশ্য আমরা খুঁজি না; ঠিক তেমনি চিত্রের বেলাতেও সাদৃশ্যের সীমারেখাটি বুঝে নিতে হবে—কী শিল্পীর, কী দর্শকের পক্ষে।

সেই সীমারেখাটি কী? না, কপে কপে মিলের চেয়ে বড় কথা ভাবে ভাবে মিল। গ্রীক চিত্রকর জিউক্লিসের ড্রাক্সা গুচ্ছ দেখে পাখী ভেবেছিল সত্যিকারের আঙুর। বাস্তবের সঙ্গে চিত্রের এই মিলকে কিন্তু সাদৃশ্য বলছি না, চাঁদের উপমান যেমন চাঁদ হতে পারে না। ঐ সুন্দরীর চোখ দুটি দেখে যদি আমার মনে হয় খঞ্জনের মত সে দুটি চঞ্চল, তবেই বলব খঞ্জন-নয়নার ঐ চিত্রটি সাদৃশ্যের নিরিখে ঠিক উৎরেছে!

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভারতশিল্পে মূর্তি' প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

ষড়-অঙ্গের শেষ অঙ্গটি হচ্ছে বর্ণিকাতঙ্গ এবং এটিই শিল্পীর শেষ সাধনা। সেটি হচ্ছে তুলির উপর রঙের উপর শিল্পীর দখল। মহাদেব পার্বতীকে বলছেন: বর্ণজ্ঞানং

যদা নাস্তি কিং তস্মা জপপূজনৈঃ? যদি বর্ণজ্ঞান না জন্মায়, যদি ঐ বর্ণিকাতঙ্গ

বর্ণিকাতঙ্গটি আয়ত্তাধীন না হয়, তবে ষড়ঙ্গের আর পাঁচটির সাধনা রুখা যাবে। জপ ও পূজায় কোন লাভ হবে না। তুলি ও পট স্পর্শমাত্র না করেও শুধু বুদ্ধি দিয়ে ধী-শক্তি দিয়ে ষড়ঙ্গের প্রথম পাঁচটির সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করা চলতে পারে। কিন্তু বর্ণিকাতঙ্গ? সেখানে তোমাকে তুলিহাতে আসরে নামতে হবে।

শিল্পাচার্য বলছেন:

চোখের তারাটি যাহা তিলমাত্র বিচলিত হইলে, নিটোল গালেব রেখাটি যাহা একচুল এদিক ওদিক হইলে, লতাতন্তু অপেক্ষা সূক্ষ্ম হাসিবেখা যাহা একটু কাঁপিলে, সব নষ্ট হইয়া যায়—তুলিব আগায় সেগুলি আঁকিয়া দেখানো হস্তের কি কিপ্রকারিতার, স্পর্শের কত লঘুভারই অপেক্ষা রাখে।... তুলিটি ঠিক কতটুকু ভিজাইব, তাহার আগায় কতটা রঙ তুলিয়া লইব ও ঝাড়িয়া ফেলিব এবং সেই রঙ সমেত ভিজা তুলিটি ঠিক কতটুকু চাপিয়া অথবা কতখানি না-চাপিয়া কাগজের উপর বুলাইয়া দিব—ইহারই সম্বন্ধে প্রমা লাভ করা হইতেছে ষড়ঙ্গের বর্ণিকাতঙ্গ নামে শেষ শিক্ষা বা চরম শিক্ষা।

ভূমিকাটি মস্ত বড় হয়ে গেল; কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল। ষড়ঙ্গের এই মূলকথাগুলি না জানা থাকলে আমাদের পক্ষে অজ্ঞতা চিত্রাবলীর পূর্ণ রসান্বাদন সম্ভবপর হবে না। এবার আমাদের মহাজনক জাতকের সেই গুহা-চিত্রগুলির প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক।

‘সাদৃশ্য’ প্রসঙ্গের আলোচনাকালে শিল্পাচার্য বলেছেন :

চিত্রে তেমনি শতসহস্র রেখা, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণভেদাদি মানসমূর্তির সদৃশ করিয়া অঙ্কন করিতেছি তখনই যথার্থ সাদৃশ্য দিতেছি। কাজেই বলিতে হইতেছে যে ভাবের অনুরণন বাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য আর কেবলমাত্র আকৃতি বা রূপের অনুকরণ বাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য।

শিল্পাচার্যের এই সত্যনির্দেশের অপব্যাখ্যা করে একদল তথাকথিত আধুনিক শিল্পী ভাবের অনুকরণে সাদৃশ্য রচনা করার অজুহাতে এমন শিল্প-নিদর্শন তৈরি করছেন যার সঙ্গে বাস্তবজগতের কোন সম্পর্ক নেই। তাঁরা বলেন—‘রূপের যথার্থ অনুকরণ অধম সাদৃশ্য’ এ-কথার অর্থ কিন্তুতই অপকপ! এ যে কত বড় ভুল কথা এই চিত্রপট দুটি তার প্রমাণ।

প্রমোদভবনের দুটি দৃশ্যের পরিকল্পনায় সাদৃশ্য যে একটা প্রধান গুণ, এ-কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু শিল্পী দুটি দৃশ্যপটকে ছবছ এক করে আকেন নি। বস্তুনিচয় ও পশ্চাদৃশ্যে সাদৃশ্য নেই—কিন্তু পাত্রপাত্রীদের ভাবের অনুরণনে অপকপ সাদৃশ্য। শিল্পী

মহাজনক জাতক
চিত্র আলোচনা

যেন পোট্রেট ঐকেছেন কতকগুলি। যেন এ নাটকের বিভিন্ন চরিত্রগুলিকে প্রত্যক্ষ করে ঐকেছেন। মহাজনক ও সীবলীর

আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অনস্বীকার্য, কিন্তু আগেই বলেছি ভাবের ব্যঞ্জনায তাদের আলেখ্য দুটির বৈপরীত্যই প্রকট। অগ্ণাত চরিত্রগুলি লক্ষ্য ও তুলনা করে দেখুন। প্রথম চিত্রে সীবলীর মাথার ঠিক উপরেই যে চামরধারিণী মেয়েটি আছে, তাকে দেখলেই মনে হয় সে যেন উদাসী, আনমনা, সে যেন প্রমোদকক্ষে থেকেও অন্তমনে কি ভাবছে। এবার দ্বিতীয় চিত্রটিতে সর্বদক্ষিণের মেয়েটিকে দেখুন—ঐ একই চরিত্র নয় কি? একটি চম্পক-অঙ্গুলি গালে দিয়ে সে যেন আনমনে কি ভাবছে। ভাবুকপ্রকৃতির এ মেয়েটির ডানহাতে ছিল এক গোছা ফুল—পরমুহূর্তেই যেন তা হস্তচ্যুত হবে। দ্বিতীয় একটি মেয়ে আছে এ নাটকে, যে চায় মহাজনক যেন সীবলীর আকর্ষণে স্বধর্মচ্যুত না হন। প্রথম চিত্রে দুটি স্তম্ভের মাঝখানে দেখছি, সে যেন হাত তুলে মহাজনককে নিবারণ করতে চাইছে, দ্বিতীয় চিত্রে চামরহস্তা এ মেয়েটিকে দেখছি সীবলীর ঠিক উপরেই। সে যেন আনন্দিতা, সে যেন উপভোগ করছে মহাজনকের এ সিদ্ধান্ত, একমাত্র তার মুখেই ফুটে উঠছে তৃপ্তির আভাস।

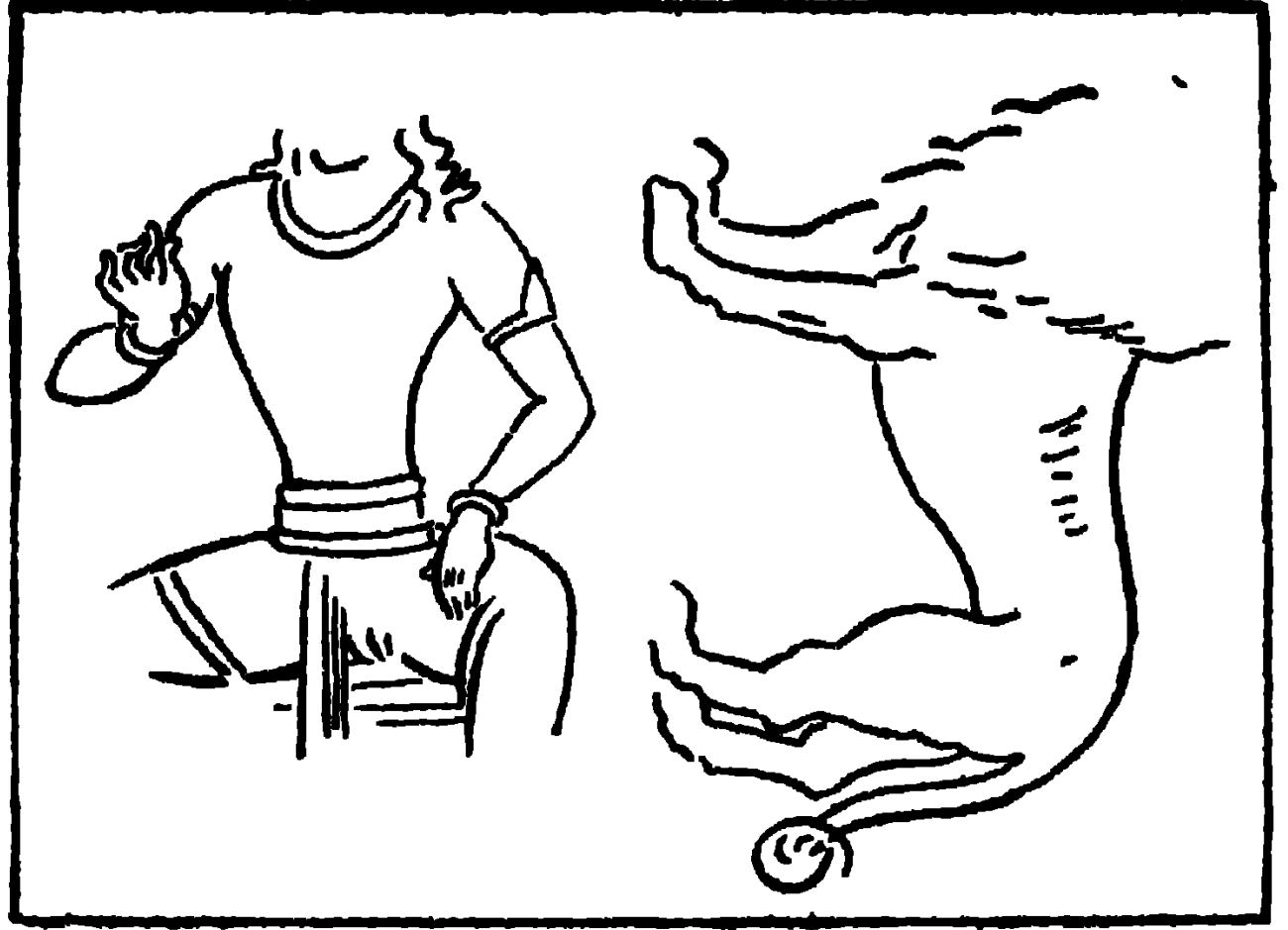
আরও একটা কথা। দ্বিতীয় চিত্রে (চিত্র—৮) সীবলীকে দু'বার আকা হয়েছে। রাজার সম্মুখে সীবলী, রাজার বামেও সীবলী। এ পাশের চরিত্রটা কিন্তু প্রমোদকক্ষে নয়, সে তার স্বশ্রমাতার কাছে অন্ত্র যুক্তকরে উপদেশ নিচ্ছে। চলচ্চিত্রের ভাষায় যাকে আমরা ‘সুপারইম্পোস’ বলি এই খণ্ড দৃশ্যটি যেন তেমনি মূল চিত্রে আরোপিত। সাঁচিতে ও অজ্ঞতায় এ জাতীয় শিল্পচাতুর্যের বহু নিদর্শন আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই দুটি নারীমূর্তির পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কার একই রকমের—কিন্তু সেটি সাদৃশ্যের মর্মকথা নয়; —এই দুটি নারীমূর্তি যে একই ব্যক্তির তা বোঝা যায় তাদের মুখভঙ্গির, তাদের চাহনির, তাদের অসহায়ত্বের জাবব্যঞ্জনার সৌসাদৃশ্যে। যেন ভাবের অনুরণনে চরিত্রগুলি একই

হল্লে ছলছে, একই সমের মাথায় ধামছে! আধুনিক চলচ্চিত্র নির্মাণের সময় একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে বিশেষভাবে নিয়োগ করা হয় পূর্বাপর দৃশ্যে পারস্পর্যের সমতা বিধানের কাজে (Continuity)। অজ্ঞতার শিল্পীর তুলিতে কোন্ মস্ত্রে সে সামঞ্জস্য বিধানের এ অদ্ভুত ব্যবস্থা করা হত? পারস্পর্য শুধুমাত্র বসনভূষণ-নির্ভর নয়, তা ভাবব্যঞ্জনায় পূর্বাপর ঘনিবদ্ধ। এ যে কতবড় কৃতিত্ব তা লিখে বোঝানো যায় না। বোধ করি, এ কোন কৃতিত্বই নয়, এ কোন শিল্পচাতুর্ষ্যই নয়—এ হল ঔদের ধ্যানের ধন। রূপভেদ পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পাচার্য বলেছিলেন :

রূপের বহিরঙ্গণে ভিন্নতা ধরিতে বা ধরিয়া দিতে পারিলেও চক্ষু বিভিন্ন রূপের সত্তাকে অর্থাৎ রূপের আসল ভেদাভেদটা ধরিতে পাবে না, রূপের এই আসল ভেদ বা রূপের মর্ম কেবল জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই ধরিতে পারি।

তাই বলছিলেন, এ অজ্ঞতা-শিল্পীর কোন প্রয়োগ-কৌশলের কৃতিত্ব নয়—এ ঔদের ধ্যানের ধন, সহজাত জ্ঞানচক্ষুর দৃষ্টি!

মহাজনক জাতকের পরবর্তী চিত্রটির আলোচনা করার আগে আর একটি কথা বলতে ইচ্ছা করছে। সেটি এই সাদৃশ্য-প্রসঙ্গে। সপ্তদশশতাব্দীর আকা একটি অনবদ্য চিত্রের সমালোচনাকালে শিল্পরসিক ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী বলেছেন, এই অনবদ্য চিত্রটির একটিমাত্র খুঁত হচ্ছে রাজকুমারীর ডানপায়ের পাতা। এ চিত্রটিকে বলা হয় ‘প্রসাধনরতা রাজকন্যা’ (চিত্র—৬৩)। বস্তুতঃ, পাশ্চাত্য কলারসিকের শিল্পবিচারে এ-কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অথচ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঐ চরণযুগলের চিত্রই এঁকেছেন তাঁর ‘ভারতশিল্পে



চিত্র :—৯ সাদৃশ্য—সিংহ-কটি



চিত্র :—১০ সাদৃশ্য—গোমুখ-কাণ্ড

উদাহরণ সন্নিবেশিত করলুম। সিংহ-কটি, গোমুখ-কাণ্ড, চরণকমল ও পদপল্লব। শেষ উদাহরণ দুটি দিয়ে শিল্পাচার্য বলেছেন :

মূর্তি’ পুস্তিকায় সাদৃশ্যপর্যায়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাতে। কাব্যে আমরা মীননয়না, কনুগ্রীব, গোমুখ-কাণ্ড ইত্যাদি শব্দের ব্যবহারে যে ভাব ব্যক্ত করি ভারতীয় শিল্পী তাঁদের তুলির টানে কিরূপে সেই ভাব ব্যক্ত করেন তা বুঝিয়ে দিতে শিল্পাচার্য অনেকগুলি চিত্র এঁকে দেখিয়েছেন।

শিল্পাচার্যের অনুকরণে আমি এখানে চারটি মাত্র

কমলের সহিত ও পল্লবের সহিত কর ও পদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌন্দর্য অজ্ঞতা চিত্রাবলীতে ও ভারতীয় মূর্তিগুলিতে যেমন স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাই এমন আর কোনো দেশে কোনো মূর্তিতে নয়।

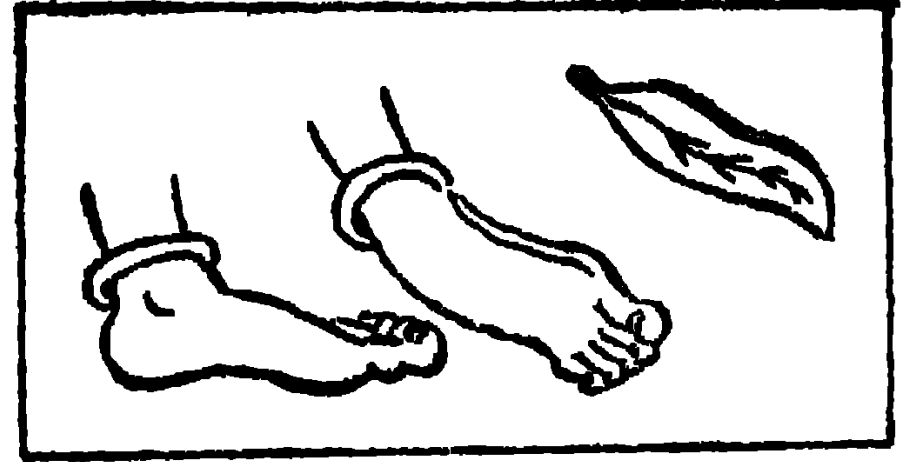


চিত্র :—১১ সাদৃশ্য—চরণকমল

অথচ মজা হচ্ছে এই যে, শিল্পাচার্য যেটিকে পদপল্লবের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে সঙ্কলন করেছেন, ডাঃ ইয়াজদানী সেইখানেই লক্ষ্য করেছেন আজিক

বিকৃতি বা 'এ্যানাটমিকাল ডিফেক্ট'।

প্রসঙ্গতঃ কিশোর বয়সের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কোন একটি সে-কালীন আধুনিক কবিতা আমার বাবাকে পড়ে শোনাচ্ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কবি সুধীন দত্তের কবিতা। কথা-প্রসঙ্গে আধুনিক কাব্যে অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য শব্দ প্রয়োগের বিষয় উঠল। আমি বলেছিলুম, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অনেক ক্ষেত্রে অহেতুক দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আমি সেই কিশোর বয়সের ঔদ্ধত্য দাখিল করেছিলুম এই পংক্তিটি, 'হে পুষ্প, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল'; বলেছিলুম এখানে 'পুষ্প' শব্দের প্রয়োগ শুধু পাঠকের কাছে পাণ্ডিত্য জাহির করা—যাতে তাকে বিশ্বকোষ খুলে বুঝে নিতে হয় পুষ্প শব্দের অর্থ সূর্য। মনে আছে, বাবা তখনই তাঁর বইয়ের আলমারি থেকে ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থটি বার করে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমার ধারণা ভ্রান্ত। বলেছিলেন, কবিতাটি রচনা করার সময় কবির মনে ঐ 'তৎ হ, পুষ্পপার্বণ সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে' মন্ত্রটি অনুরণিত হচ্ছিল এবং সেইজন্মই ঐ পুষ্প শব্দের প্রয়োগ।



চিত্র :—১২ সাদৃশ্য—পদপল্লব

এই আপাত-অপ্রাসঙ্গিক ঘটনাটি উল্লেখ করলুম এ-কথা বোঝাতে যে, আমাদের স্বল্পজ্ঞানের পুঁজি নিয়ে আমরা যখন কোন বহু শিল্পকর্মের বিচার করতে বসি, তখন প্রায়ই ভুল করি, আর ভুল যে করি তা বুঝি না যতক্ষণ না সে ভুলটা কেউ বুঝিয়ে দেয়। কিশোর বয়সে আমি যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলুম প্রায় সেই জাতীয় ভ্রমাত্মক উক্তিই কি করেন নি পণ্ডিতপ্রবর ডাঃ ইয়াজদানী, যখন বলেছেন ঐ পদযুগলে 'এ্যানাটমিকাল' ভুল রয়ে গেছে?

বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য দেখছি (চিত্র—১, দক্ষিণপার্শ্ব) মহাজনক গেত অশ্বপুষ্ঠে চলেছেন তাঁর একলা চলার পথে; সেই তোরণ-দ্বারটি অতিক্রম করেছেন তিনি (১।২৬)। তাঁর চতুর্দিকে ভক্ত প্রজাবৃন্দ। কেউ বাজাচ্ছে বাঁশি, কেউ ফুঁ দিচ্ছে শাঁখে। শেষোক্ত ব্যক্তির গাল দুটি ফোলা। রাজার দিকে মুখ করে যে ছেলেটি বিপরীত দিকে চলেছে তার ডানহাতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গতিশীল মানুষের স্থিরচিত্র আকবার সময় গতির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে হাতের এই জাতীয় ব্যবহার গ্রিকিভের মতে পৃথিবীর চিত্র-ইতিহাসে এই ফ্রেস্কোটিতেই প্রথম করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ চিত্রনাট্যটিকে যদি এখানে ঐকে দিতে পাবতুম তাহলে হয়তো কিছুটা বোঝানো যেত, কীভাবে ওঁরা কাহিনীকে চিত্রে রূপায়িত কবতেন। জাতকের মূল কাহিনীটিকে গল্পাকারে সাজিয়ে তুলতে আমি যেমন কিছুটা সংলাপ, কিছুটা ঘটনা-সংস্থাপন কল্পনা কবে নিয়েছি, বুদ্ধ শিল্পীবাও তেমনি মূল কাহিনীর কোথাও বিস্তার করেছেন, কোথাও সংক্ষেপ কবেছেন। এটুকু বলতে পারি, আধুনিক যুগে চলচ্চিত্র-শিল্পে চিত্রনাট্যকার যতটা স্বাধীনতা ভোগ কবেন, অজস্তাব শিল্পীবাও ততটাই ভোগ কবেছেন জাতকের কাহিনী চিত্রের মাধ্যমে রূপায়ণে।

মাঝের তোবণ-দ্বাৰাটি যেন একটি পূর্ণচ্ছেদ বেখা। যেন সেটি দুটি দৃশ্যের মাঝখানের বরনিকা। বামপাশে ‘ফেড-আউট’ হয়ে যাচ্ছে বাজার প্রমোদকক্ষের দৃশ্য, আর দক্ষিণ-পাশে ‘ফেড-ইন’ হচ্ছে বাজার গৃহত্যাগের দৃশ্যটি।

এ পাশের দেওয়ালে (১৩) শিবি জাতকের একটি কাহিনী। জাতক-বর্ণিত শিবি কাহিনী কিন্তু নয়। মহাভাবতে শিবরাজ্যের যে উপাখ্যানটি আছে তাকেই রূপায়িত কবা হয়েছে। মহাবাজ শিবি বসে আছেন বক্সসিংহাসনে। তাঁর একহাতে শবণাগত কবুতর, সম্মুখে শ্যেনপক্ষী। পর্বে প্যানেলটিতে দেখছি মহাবাজ নিজ অঙ্গ থেকে মাংস কেটে নিয়ে তুলাদণ্ডে এঁজন করছেন। চিত্রটি অনেকাংশে নষ্ট হয়ে এসেছে।

১৩ ব জাতক

সম্ভবপাল ও মহাজনক জাতকের চিত্র-সংলিখিত প্রাচীরের সম্মুখে যে ছয়টি স্তম্ভ আছে, তাঁর নীৰ্ঘদেশগুলি লক্ষণীয়। কোথাও নাগবাজা গুপমূলে প্রণাম করছেন (১৪)। কোথাও দুটি যুবক যথেষ্ট যুদ্ধদৃশ্য (১৫)। বলদর্পী যুগ্মযথেষ্ট প্রতি অঙ্গে মাংসপেশী প্রকটিত। কোথাও বা ষড়ভুজ বামন মূর্তি (১৬)।

সম্মুখের প্রাচীরে দেখছি একজন বাজপুত্রকে অভিষেক স্নান কবানো হচ্ছে (১৭)। আমাদের গাইড বললেন—এটি মহাজনক জাতকেরই খণ্ড-চিত্র। একাদেমী প্রকাশিত চিত্র-সম্ভাবেও সেকথা লেখা আছে,—বাজপুত্র সিংহাসনে বসে আছেন। দুজন কিস্কর ছদিক থেকে ঘড়ায় কবে জল ঢালছে। হতে পারে এটি মিথিলায় মহাজনকের অভিষেক দৃশ্য। কারণ, তার পাশেই দেখছি একটি বিবসনা নাবীমূর্তিকেও স্নান করানো হচ্ছে। বোধ কবি সে সীবলী। এখানে স্বতঃই মনে একটি প্রশ্ন জাগে। সীবলীর বিবসনা স্নান-দৃশ্যে দেখছি জল ঢালছে দুজন কিস্কর—কিস্করী নয়। এতো ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় কোন যুগেই সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয় প্রশ্ন—এখানে এই নাবীটি যদি সীবলীই হবে, তবে তার গাত্রবর্ণ শ্বেত কেন? পূর্ব-বর্ণিত মহাজনক জাতকের প্রতিটি চিত্রে সীবলীকে গাঢ় শ্যামাঙ্গী করে আঁকা হয়েছে। আগেই বলেছি, আবার বলছি—অজস্তা-শিল্পী সাদৃশ্য-সামঞ্জস্যে কখনও ভুল করেন না। বিশ্বাস্তব জাতক, মহাজনক জাতক, বিধুর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতি বড় বড় কাহিনী-চিত্রে কোন কোন চরিত্রকে ছয়বার বা আটবারও

আঁকতে দেখেছি--কিন্তু তাদের আকৃতিগত, বর্ণগত বা ধর্মগত কোন বৈপরীত্য কখনও নজরে পড়ে নি। তাই মন মানে না যে, এটি সীবলীর আলেখ্য (চিত্র—৩২)।

প্রসঙ্গতঃ একটি কথা বলি। সীবলী ছিল অপূর্বসুন্দরী; কিন্তু তাকে গাঢ় রঙে ঐকোছেন শিল্পী। তার কারণ, অজন্তা-শিল্পীর চোখে গৌরবর্ণ সৌন্দর্যের প্রতীক নয়। শুভ্রাঙ্গীর অভাব নেই অজন্তায়, কিন্তু কৌতুককর ঘটনা হচ্ছে এই—যে কয়টি সুন্দরী নারীর চিত্র অজন্তায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, তার প্রায় সবগুলিই শ্যামাঙ্গীর। সীবলী শ্যামাঙ্গী, মবণাহতা রাজকন্যা কালো, গোপা কালো, ইবান্দাতী কালো, কুম্ভা অপ্সরা এবং কুম্ভা-রাজকুমারী তো ঘোর কুম্ভবর্ণের।

মন্দির-স্থপতির ভাষায় মূল-গর্ভমন্দিরের সম্মুখস্থ ছোট কক্ষটিকে বলা হয়—‘অন্তরাল’। এ গুহায় অন্তরালের প্রবেশপথে দুদিকে দুটি নিবাটাকার বোধিসত্ত্বের আলেখ্য। একদিকে অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির (১৮ ক) আলেখ্য, অপরদিকে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির চিত্র (১৯)। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়ালুম বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সম্মুখে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, এ পদ্মপাণিকে বর্ণনা করার মত কলম, অথবা একে দেখাবার মত তুলি আমার নেই। শুধু এটুকু বলতে পারি এ চিত্রে এমন একটা কিছু আছে যার জন্তু এর সম্মুখে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা যায়। বাবে বাবে ফিবে ফিবে ঐকে দেখলেও চোখ ক্লান্ত হয় না--সীড়িত হয় না। অজন্তায় একাধিক চিত্র আছে যা নাকি শুধু রেখা দিয়ে বা রঙ দিয়ে আঁকা নয় যেন তাব মতো হাজার বছর ধরে বন্দী হয়ে আছে শিল্পীর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা, একটি অপ্রকাশিত ধ্যানের মন্ত্র! যা খোলা নয়, ঢাকা। তবু তা যে আছে তা অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায় অদ্বৈতের ইকার্গতিকতা নিয়ে ঐ চিত্রের সামনে এসে দাঁড়ালে। এ চিত্রটি সেই জাতের। বিশাল হৃদের গভীরতা যেমন তার উপরিভাগের নিম্পন্দ রূপরেখায় ব্যক্ত হয় না, যেমন তা অনুমান-নির্ভর—এই অবলোকিতেশ্বর মূর্তির ভাবের বাজনাও তেমনি অনুভূতিসাপেক্ষ। বোধ কবি একেই আচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলতে চেয়েছেন—চিত্রের প্রাণ, তাব ব্যঙ্গ!

এ চিত্রের সেই ব্যঙ্গের মর্মকথা বলতে পারব না, তবে বহিঃরঙ্গের বা রূপরেখার একটা বর্ণনা দিতে পারি। অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির এই বিখ্যাত চিত্রটির অনুলিপি নিশ্চয়ই দেখেছেন আপনি; কিন্তু সে যে ব্যর্থ অনুকরণ তা বুঝতে পারবেন ঐ মূল চিত্রটি দেখলে।

অবলোকিতেশ্বর
পদ্মপাণি

তাজমহল যারা দেখেছেন, আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির যারা দেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, ইতিপূর্বে ফটোগ্রাফ দেখে তাঁদের যে ধারণা ছিল, তা ভ্রান্ত। কিন্তু সে ভ্রান্তি দৈর্ঘ্য-

প্রস্থ-উচ্চতার তিন মাত্রার বস্তুকে আলোকচিত্রের দুই মাত্রায় প্রকাশের প্রয়াসে নিহিত। কিন্তু অবলোকিতেশ্বর মূর্তির আলেখ্য তো দুই মাত্রার চিত্র--চিত্রে তার সার্থক অনুকৃতি অসম্ভব হবে কেন? কিন্তু তা হয়েছে। হয়তো অনুকৃতির আপেক্ষিক ক্ষুদ্র আয়তনের জন্তুই এ ব্যর্থতা, হয়তো অনুকারকের সাধনায় ধ্যানের দৃষ্টি ছিল না বলেই

এ অসাধল্য। মোট কথা, মূল চিত্ৰেৰ সঙ্গ এঘাবৎকাল যত অমুকুতি হয়েছে তাৰ প্ৰভেদ আকাশ-পাতাল।

নিঃসন্দেহে এ গুহায় এই চিত্ৰটিই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ, মহামহিমময় বিশাল। বোধিসত্ত্বৰ দক্ষিণহস্তে একটি প্ৰস্ফুটিত পদ্ম, মস্তকে মণি-মাণিক্যখচিত বাজমুকুট, কণ্ঠে মুক্তাৰ শতনরী, কৰ্ণে হীৰককুণ্ডল। কিন্তু আগেই বলেছি, এব মূল আবেদন বহিবঙ্গ নয়, ভাবেৰ বাজ্য। বাবে বাবে বোধিসত্ত্বৰ ৰূপ নিয়ে জন্ম নিচ্ছেন বুদ্ধদেব—কিন্তু তাঁৰ চরম মুক্তি, মহাপৰিনিৰ্বাণ হচ্ছে না। হবে কেমন কবে? বোধিসত্ত্ব যে বাবে বাবে নিৰ্জন সাধনক্ষেত্ৰ থেকে ফিৰে ফিৰে আসছেন অত্যাচাৰিত নিপীড়িত জগৎবাসীৰ কল্যাণকামনায়। জবা-ব্যাধি-মৃত্যু-অধ্যাষিত এ মৰজগতে একক-সাধনায় সে কিছুতেই তিনি আত্মনিয়োগ কৰতে পাবছেন না। অবলোকিতেশ্বৰ পদ্মপাণিৰ মূৰ্তিতে তাই ফুটে উঠেছে কাকণ্যেৰ অপৰূপ বাঞ্ছনা, যেন তিনি বলছেন—জগৎকে ছেড়ে একক-মুক্তিৰ কামনা আমাৰ নয়। বোধিসত্ত্ব ত্ৰিভঙ্গমূৰ্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন ভাবাবেশে লীন হয়ে।

পদ্মপাণিৰ পাশেই একটি কৃষ্ণ নাবীমূৰ্তি নিঃসন্দেহে ইনি অবলোকিতেশ্বৰেৰ শক্তিমূৰ্তি। এ মূৰ্তিটিও অপূৰ্ব। প্ৰায় নিৰাবৰণা, কিন্তু মাত্ৰ-ভাব ছাড়া অন্য কোন লাস্ত্ৰময়ী ভাবেৰ চিহ্নমাত্ৰ নেই এ আলোচ্যটিতে (১৮ খ)।

পদ্মপাণিৰ উদ্দেশ্যে সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জানিয়ে সবে আসি অস্তবালেৰ ক্ষুদ্ৰতৰ কক্ষে। এই অস্তবালে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকেৰ প্ৰাচীৰে দেখছি একটি বৃহদায়তন প্যানেল (১১০)। রূপস্মারত সিদ্ধার্থকে সসৈন্য 'মাব' আক্ৰমণ করেছে। মাৰেৰ তিন লাস্ত্ৰময়ী কন্যা—তম্বু, বতী ও বঙ্গ বিচিত্ৰ ভঙ্গিমায গৌতমেৰ চিত্তহরণ কৰতে উদ্যোগী। তাৰেৰ মধ্যে একজন আসন্ন-প্ৰসবা। ধ্যান-স্তিমিত গৌতমেৰ চতুৰ্দিকে বীভৎস বসেৰ সঞ্চাৰ। নানাভাবে মাৰেৰ সৈন্যদল ভীতি প্ৰদৰ্শন কৰছে তাঁকে। কাম, লোভ আৰু ভয়—কিন্তু মাৰ পৰাজিত। জ্ঞাননিৰ্ধতকল্মষ জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসী নিৰ্বিকার। এই একই বিষয়বস্তু অবলম্বন কৰে সাবনাথেৰ মূল গন্ধেশ্বৰকৃটি মন্দিৰে একজন জাপানী চিত্ৰকাৰেৰ একটি অনবদ্য প্ৰাচীৰ-চিত্ৰ দেখেছি মনে আছে।

গৰ্ভমন্দিৰেৰ দুই প্ৰান্তে দুটি প্ৰস্তৰ-নিৰ্মিত নাবীমূৰ্তি। একজন - গঙ্গা (১১১), অপৰ জন যমুনা (১১২)

মূল-গৰ্ভমন্দিৰেৰ বিৰাট বুদ্ধমূৰ্তি (১১৩)। সাবনাথ মৃগদাবে বুদ্ধদেব বসে আছেন পদ্মাসনে- ধৰ্মচক্ৰ মূৰ্চায়। গাইড এই মূৰ্তিটিৰ তিন দিকে আলো ফেলে বুদ্ধদেবেৰ তিন বৰম ভাব-ব্যাঞ্জনা আপনাকে দেখিয়ে দেবে। একপাশে আলো ধৰলে মনে হবে তিনি আসছেন—অপৰপাশে আলোকপাত কৰলে মনে হবে তিনি বিষাদখিন্ন। আলো সামনে ধৰলে মনে হবে তিনি ধ্যানমগ্ন। তা সত্যিই মনে হয়, কিন্তু আমাৰ ব্যক্তিগত ধাৰণা এ শুধু এ্যাকসিডেণ্টাল আৰ্ট। অনেকে এ চাতুৰ্যে মুগ্ধ হচ্ছেন দেখলাম।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিল্পীর মনে একথা ছিল না। আলোকসম্পাতের চাতুর্য নিয়ে মাথা ঘামাতেন না অজন্তার জাত-শিল্পীর দল।

অন্তরালের পূর্বদিকের প্রাচীরে দেখি সারি সারি বুদ্ধমূর্তি (১১৪)। অসংখ্য! না, সংখ্যাতীত নয়, এক হাজারটি। শ্রাবস্তী নগরীতে একবার অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য বুদ্ধদেব সহস্র মূর্তিতে প্রকটিত হয়েছিলেন। এই প্রাচীর-চিত্রে সেই অলৌকিক ঘটনাটি নিধিত।

এর পরে বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণির মূর্তিটি। তাঁর পায়ের কাছে যে প্রতিহাবীটি আছে, তাকে পারশ্বদেশীয় বলে মনে হয়। তার কোমরবন্ধে চামড়ার বকলেশটি দ্রষ্টব্য। বোধিসত্ত্বের বামে দুটি নাবীমূর্তি। তার ভিতর একটি নিকষ কালো। ইনিই কৃষ্ণ-রাজকুমারী (১১৫)।

অপূর্ব রূপবতী এই কৃষ্ণ-রাজকুমারী (চিত্র—১৩)। বোধ করি, অজন্তার ত্রিশটি গুহার যাবতীয় নারীমূর্তিকে সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় এ পিছনে ফেলে আসতে পারে। অথচ এর গাত্রবর্ণ কষ্টিপাথরের মত কালো। উন্নত-নাসা পদ্মকোরকতুলা দুটি ভাববিহ্বল নয়নে মেদিনীনিবদ্ধ দৃষ্টি। ললিত কপোলে কুঞ্চিত কেশদাম কোতুহলী

হয়ে বুঁকে পড়ে দেখছে তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি। ললাটে

কৃষ্ণ-রাজকুমারী

মণি-মাণিকাখচিত টায়রা, পুষ্পমাল্যে ঘননিবদ্ধ কবরীপাশ। নিরা-

বরণ উরসে যৌবনের যুগ্ম-জয়স্তম্ভ। কিন্তু হায়! ইনি চিরবিরহিণী! এই অন্ধ গুহার বন্ধ কক্ষে হাজার বছর ধরে গবরীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছেন কৃষ্ণ-রাজকুমারী। ঐব নায়ক আজও এসে পৌঁছায় নি! শিয়রের কাছে এক বুদ্ধের মূর্তি। বোধ কবি, ইনি বুদ্ধ রাজা—অর্থাৎ রাজকুমারীর পিতা। তুষ্টিচ্যুত, তৃর্ভাবনায় জরাগ্রস্ত! পাশেই রাজকুমারীর একজন সখী। হাতে তার অর্ধা-থালিকা। তার একটিমাত্র চোখ অন্ধত আছে—কিন্তু ঐ একটিমাত্র নয়নের দৃষ্টিতেই ঝবে পড়ছে তার প্রাণের আকুলতা, তার উৎকর্ষ। কান পাতলে শুনতে পাবেন ঐ একটিমাত্র নয়নের দৃষ্টিতেই ফুটে উঠেছে তার ঐকান্তিক আবেদন—‘এমন করলে যে তুমি মাঝে যাবে সখি,—এ থালা থেকে যা হোক কিছু তুলে মুখে দাও!’

বিশ্বাস করুন, এই একটিমাত্র খণ্ড-চিত্রই আপনাকে পাগল করে দেবে!

স্তম্ভশীর্ষে কোথাও দেখছি যুগ্মহস্তী (১১৬). কোথাও বা হরিণশিশু (১১৭)। হরিণগুলির লক্ষণীয় শিল্পচাতুর্য এই যে, চারটি হরিণ খোদাই করা হয়েছে যাদের একটি-মাত্র সাধারণ মাথা।

এখানে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করি। গাইড বারে বারে আপনার দৃষ্টি এই সব লঘু শিল্পচাতুর্যের দিকে আকৃষ্ট করবে। এই দেখুন—চার হরিণের এক মাথা, এই দেখুন—ছয় নর্তকীর ছয় হাত, ঐ দেখুন দুই ঘোড়ার এক মাথা। আলো! ডাইনে-বাঁয়ে সরিয়ে দেখাবে বুদ্ধদেব হাসছেন, কাঁদছেন; কিন্তু বিশ্বাস করুন, এ দেখতে আপনি

অজস্তায় যান নি। এ নিয়ে মুগ্ধ হবেন না আপনি। এ নিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করবেন না। অজস্তার মহত্ব এই সব সস্তা শিল্পচাতুর্যে নেই--তা আছে ঐ অবলোকিতেশ্বরে, ঐ মরণাহতা রাজকন্যার চিত্রে, ঐ সারিপুত্রের পরীক্ষায়, আর গোপা ও বাহুল আলোকে। প্রদীপ ধরে যেমন সূর্যকে দেখানো যায় না--যতই বাকবিস্তার করি, ভাষায় তেমন সে চিত্রগুলির মর্মকথা বোঝাতে পারব না। ওখানে গিয়ে দাঁড়ান, মনকে সংযত করুন, অন্ধানন্দ করুন, মনে মনে বলুন : নমো তমস ভগবতো অবহতো সন্মাসম্বন্ধসু। পেসাদ-কণা



চিত্র - ১৩

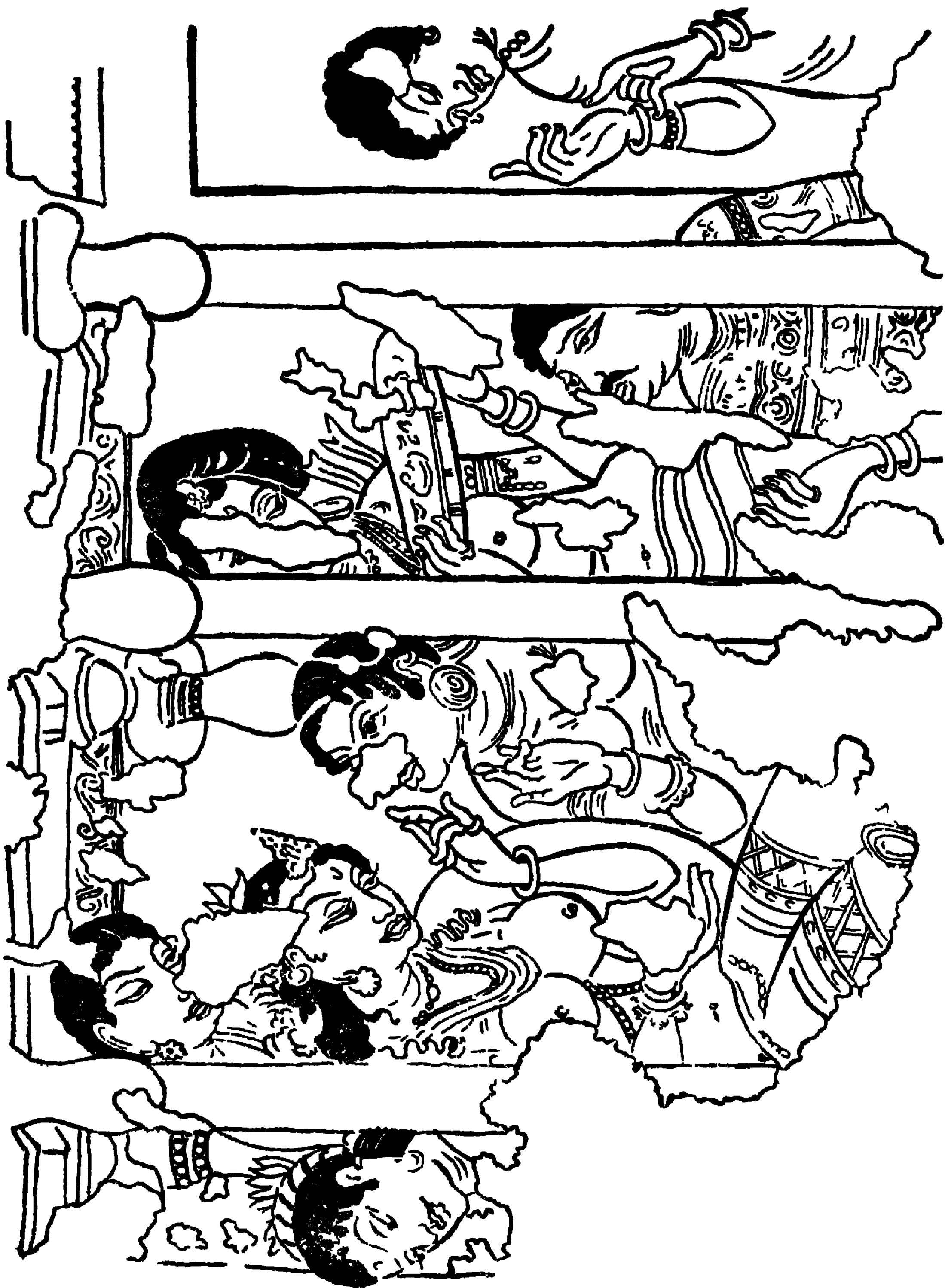
রূপা-রাজকুমারী ও সখী

অবস্থান—'১১৫

কিছুটা নিশ্চয়ই পাবেন। আর শিল্পচাতুর্যের এই সব লঘু নিদর্শন দেখেই যদি তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসেন, তবে আপনার অবস্থা হবে সেই তান্ত্রিক সাধকের মতো--যে কিছুমাত্র বিভূতি লাভ করে ত্যাগ করে তার পবনপ্রাপ্তির সাধনা, মগ্ন হয়ে থাকে অলৌকিক কিছু ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে !

অস্তুরালের সিলিঙে গোলাকৃতি পদোব নকশা। মাঝের বড় হল-কামরার উপরে যে সিলিঙ, তাতেও নানা জাতের অসংখ্য চৌখুপি ও নকশা। ছাদের একটি বিশেষ স্থানে (১১৮) দাড়িওয়ালা এক বিদেশী বাজার মূর্তি। পাশে রানী। কেউ কেউ বলেন, ইনি পারস্যদেশীয় সম্রাট খুসরো ও তাঁর রানী সুন্দরী শীরীন।' এদিকের

(১) এই নিয়ে গত শতাব্দীর শেষপাশে ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং মিঃ জেমস্ ফার্ডিন্যান্ডের মধ্যে মত-বিরোধজনিত বাদ-প্রতিবাদ হয়। শেষ পর্যন্ত সুধীজন ফার্ডিন্যান্ড-সাহেবের মতই মেনে নেন--অর্থাৎ, ওটি পারস্য দরবারের দৃশ্য ['On the Age of Ajanta'—by Babu Rajendralal Mitra, India Society, Jan. 1880 প্রবন্ধ]।



ସ୍ୱାମୀନାଥ ମହାପାତ୍ର

୪୯—୫୯

প্ৰাচীৰে দেখি আৰ একটা বাজসভাৰ দৃশ্য। এটি সম্ভবতঃ চালুক্যবাজ দ্বিতীয় পুলকেশীৰ
 স্বৰ্গো, নীৰীন বাজসভা (১১১৯)। চিত্ৰে দেখিছ, চালুক্যবাজ দ্বিতীয় পুলকেশী
 ও পুলকেশী সিংহাসনে আসীন। পিছনে ছত্ৰধাৰী। সম্মুখে তাঁৰ পদতলে পুষ্প-
 আস্তবৰ্ণে একটা ব্যজনিকা। 'ব্যেকজন পাবস্ৰাদেশীয় বাজদূত উপটোকনেৰ অৰ্ঘ্য-থালিকা
 হাতে একে একে প্ৰবেশ কৰছে বাজসভায়। একজনেৰ হাতে একছড়া মুক্তামালা।

পূৰ্বদিক্ৰেৰ দেওয়ালে চিত্ৰগুলিকে সনাক্ত কৰতে পাৰি নি। সেগুলি অধিকাংশই নষ্ট
 হৈছে এসেছে (১১১০)। শিবি জাতকেৰ পাশেৰ প্যানেলে (১১২১) দেখিছ, একটা
 বাজপ্ৰাসাদে জনৈক বানীক কিধবা এসে সবাদ দিছে দ্বাবে একজন মহাভিক্ষু
 সমুপস্থিত (চিত্ৰ ১৪)। পাশে দাব এব দ্বাবেৰ ওপাশে মহাভিক্ষুকেও দেখা যায়।
 তাকে দেখে মনে হয় স্বয়ং বুদ্ধদেব। কাহিনীটি বিশেষজ্ঞৰা সনাক্ত কৰতে পাবেন নি।
 কিন্তু আমি তে। বিশেষজ্ঞেৰ দৃষ্টি নিয়ে অজস্ৰ দেখাত যায় নি, তাই অনায়াসে মনে কৰে
 নিলুম এ ঘটনা কপিলাবস্তুৰ। বৌদ্ধ শাস্ত্ৰমতে বুদ্ধজলাভ এবাৰ পৰ বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে
 এসেছিলেন নগৰ সন্নিকটে শ্ৰাণ্ণোবাবাম বিহাৰে কবেকদিন বাস কৰেন। ভিক্ষাৰে তিনি
 কপিলাবস্তু নগৰে প্ৰবেশ কৰেন। তখন নাকি বশোববা শুদ্ধোবনেৰ কাছে আপতি
 জানিয়েছিলেন বাজপুত্ৰ ভিক্ষা চাইছেন, এ অনাটাব সহ হয় নি তাৰ। কিন্তু বুদ্ধদেব তা
 শোনে ন। তিনি নগৰ-ভ্ৰমণেৰ পথে সাৰিপুত্ৰ এ মহামৌদগল্ল্যায়নেৰ সঙ্গে শেষ পৰ্যন্ত
 বাজবধূৰ কঙ্গেৰ সামনে এসে দাডিয়েছিলেন। এ ছবিটি যে সেই দৃশ্য নহ, তা-ই বা জানব
 কেমন কৰে ?

স্নানদণ্ডেৰ পাশেৰ প্যানেলে (১১২১) বোধিসত্ত্বকে ব্যেকটি নাৰী অৰ্ঘ্যদান কৰছে।
 বোধিসত্ত্ব বসে আছেন একটা প্ৰস্তবাসনে। তাঁৰ পাশ থেকে আকা প্ৰাফাইল দেখা
 যাচ্ছে (চিত্ৰ ৩১)।

চম্পায় জাতকেৰ কাহিনীটি (১১২৩) বৰ্ণনা কৰে এবাৰ অমবা প্ৰথম গুহা-মন্দিৰ
 থেকে বিদায় নেব।

অজ্ঞ আৰ মগধ বাজোৰ সৌমানায বয়ে বায় চম্পানদী। অজ্ঞ আৰ মগধে বিবাদ-
 বস বাদ লেগেই আছে অথচ চম্পানদীৰ অতল জলেৰ গভীৰ নাগবাজোৰ কথা কেউই জানে
 না। সেখানে বিবাদ নেই, বিবোধ নেই, শুধু আমোদ আৰ প্ৰমোদ বিলাস আৰ বাসন।
 পূবজন্মে এই নাগলোকেৰ কথা শুনে বোধিসত্ত্বেৰ মনে বাসনা হৈছিল ঐ নাগবাজোৰ
 অধীশ্বৰ হওয়াৰ। পৰজন্মে সত্যই তিনি জন্মেছিলেন চম্পানদীৰ অতল জলেৰ গভীৰে,
 ঐ নাগবাজোৰ প্ৰাসাদে রাজপুত্ৰ হৈছে। কালে তিনি হলেন নাগবাজোৰ অধীশ্বৰ।
 নাগকণ্ঠা শুমনাকে বিবাহ কৰলেন তিনি।

কিন্তু প্ৰতি জন্মে যা হৈছে এবাৰও তাই ঘটল। বোধিসত্ত্বেৰ মনে শাস্তি নেই।
 তাঁৰ অন্তবেৰ নিভূতে অনন্ত জিজ্ঞাসা, তিনি ভূমাৰ পৰণপ্ৰার্থী। মণি-মুক্তাখচিত প্ৰাসাদে
 বিলাস-বাসনেৰ চুড়ান্ত আয়োজনেৰ মধ্যও নাগবাজ কেমন যেন উদাসী-অশ্রমণ।

নাগরানী সূমনা লক্ষ্য করেন স্বামীর ভাবান্তর। তিনি গোপনে পরামর্শ করেন মন্ত্রী
সঙ্গে। নিত্যানুতন আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়। কিন্তু তাতে

চম্পেয়া জাতক

শান্ত হয় না বোধিসত্ত্বের বিস্ময়কর হৃদয়। মর্ত্যলোকের দুঃখ-দুর্দশা
দেখে নাগরাজ স্থির করলেন, রাজবৈভব ত্যাগ করে তিনি গোপনে সন্ন্যাস নেবেন।
সদগুরুর সঙ্কানে বেরিয়ে পড়বেন একাই। পাছে মহারানী বাধা দেন, পাছে নাগকন্যা
সূমনা পথরোধ করে দাঁড়ায়, তাই কাউকে কিছু জানালেন না। একদিন গভীর রাত্রে
গোপনে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন পথে—জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার মূল অন্বেষণ
করে দেখবেন তিনি। দেখবেন, কেমন করে এই জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-অধ্যুষিত মরজগৎকে
আনন্দ-নিকেতনে রূপান্তরিত করা যায়। ক্রমে বাহ্যি প্রভাত হল। হৃৎ পথ চলেছেন
নাগরাজ চম্পেয়া। কে তাকে দেবে সত্য পথের নির্দেশ? কে শোনাবে তাঁকে সৃষ্টির
মন্ত? অস্মাত অভুক্ত পথশ্রমে অনভ্যস্ত নাগরাজ অবশেষে দিনান্তে এসে আশ্রয় নেন
পথের পাশে! ক্লান্তদেহে বিশ্রাম নিতে থাকেন তিনি।

ঠিক সেই সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক সাপুড়িয়া। হঠাৎ তার নজবে পড়ে,
পথপ্রান্তে ক্লান্তদেহে পড়ে আছে এক মহানাগ। চমকে উঠে সাপুড়িয়া! এ যে
নাগরাজ! এ-কে কি ধরা যাবে! যদি দেশ বিদেশে এই নাগবাজের নাচ সে দেখাতে
পাবে, তাহলে তার ভাগ্যই ফিরে যাবে যে! কিন্তু এ কি ধরা দেবে? সতয়ে এগিয়ে
আসে সাপুড়িয়া সেই মহানাগের দিকে। আশ্চর্য, নাগরাজ কোন বাধা দেন না—বিনা
প্রতিবাদে তিনি প্রবেশ করেন তার বাঁপিতে। অহিংসার অবতার বোধিসত্ত্ব কোন
প্রতিবাদ করেন না। ভাগ্যের নির্দেশ তিনি মেনে নেন বিনা প্রতিবাদে। ভাগ্যের কী
বিড়ম্বনা! যখন মস্তকে একদিন শোভা পেত হাবা-মুক্তাখিচি চম্পেয়ারাজ্যের রাজহত,
তিনি আজ পথে পথে নাচ দেখিয়ে বেড়ান সামান্ত এক সাপুড়িয়ার নির্দেশে।

এদিকে নাগরাজ গৃহত্যাগ করার পর্বদিন প্রভাতে জেগে উঠে চম্পেয়া মহাবানী
মাথায় হাত দিয়ে বসেন। যা ভয় করেছিলেন, তাই হয়েছে। সবনাশ হয়ে গেছে।
বাজপুত্রী শূন্য হয়ে গেছে। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন মহামন্ত্রী, সেনাপতি আর নগর-
কোটাল। দেশে দেশে চব পাঠানো হল—খুঁজে বার করবেই হবে নিরুদ্দিষ্ট রাজাকে।
কিন্তু কেউ কোন সন্ধান পায় না। একে একে ফিরে আসে হতাশ চবের দল। মহারাজের
কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন। দুঃখে অনুশোচনায়
মহারানী শয্যা নিলেন। এলেন রাজবৈষ্ণব। বানী বলেন : তোমরা পাব নি, আমি
নিজে একবার চেষ্টা করে দেখব আমি তাঁকে খুঁজে বার করবই।

রাজবৈষ্ণব মাথা নেড়ে বলেন : তা তো হবে না মা। তুমি আজ আর এ ছুনিয়ায়
একা নও। তোমার দেহের মাঝে নূতন জীবনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি যে। মহারাজকে
আমরা হারিয়েছি, কিন্তু নাগবাজের ভবিষ্যৎ রাজাকে আমরা হারাতে রাজী নই।

বানী সূমনার দু-চোখে ভরে আসে অশ্রুজল। সে জল আনন্দের, সে জল বেদনার।

এদিকে সাপুড়িয়ার সঙ্গে পথে পথে ঘুরে বেড়ান নাগরাজ চম্পয়া। অবস্খী, আবস্খী, বিদিশা প্রভৃতি নিত্য নূতন দেশ; কিন্তু তাঁর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। কদম্বের আহাৰ্য, সেই বন্ধ ঝাঁপির ঝঙ্ক কারা, সেই বাঁশিব সুরে ছলে ছলে নাচা, সেই কোতুহলী বালকদলের লোষ্ট্রাঘাত! অহিংসাব অবতার দিন গুণছেন শুধু—কে জানে কবে হবে মুক্তি। ক্রমে ভুলে গেলেন তিনি তাঁর আত্ম-পরিচয়। ভুলে গেলেন—কোথা থেকে তিনি এসেছেন। তবু এতদিন মাঝে মাঝে মনে পড়ত নাগকন্যা স্মৃতির কথা—ক্রমে সে-কথাও আর মনে রইল না তাঁর! শুধু মহানিৰ্বাণের, মহামুক্তির স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইলেন তিনি।

এদিকে চম্পানদীর অতল জলের গভীরে চম্পয়া বাজপুবীতে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। বাজপ্রাসাদে বন্ধ হয়েছে নহবতের গৃহনা। স্তব্ধ হয়েছে বৈতানিকের ঘোষণা। প্রতি সন্ধ্যায় মহাবাজের প্রমোদকক্ষে আর জ্বলে না বহুদীপাবলী, রাজনতর্কী বাত-ব্যাক্তিগ্রন্থ। আনন্দ-নিকেতন পরিণত হয়েছে নিবানন্দ লোকে। দিন আসে, দিন যায়, কিন্তু যাব প্রতীক্ষায় বাজপুবীর প্রতিটি প্রস্তুতখণ্ড স্তব্ধ হয়ে প্রহর গণে, সে ফিরে আসে না। এ দৃশ্য আর সহ্য হল না নাগরানী স্মৃতি। তিনিও একদিন গভীর বাত্রে গৃহত্যাগ কবলেন গোপনে। খুঁজে তিনি বাব করবেনই নিকৃদ্দিষ্ট মহাবাজকে।

পথে পথে ঘুরছে এক উন্মাদিনী নারী। সাপুড়িয়া পাড়ায় যেখানে শোনে সাপ খেলানো হচ্ছে, সেখানেই ছুটে যায়। দেখে আর হতাশ হয়ে ফিরে আসে। যাকে খুঁজছে এ তো সে নয়! দিন যায়, মাস যায়, ক্রমে দেহ অশক্ত হয়ে পড়ে। পা আর চলে না, মনের ভাবের চেয়ে দেহের ভার বেশী বলে মনে হয়। পথপ্রান্তে বসে পড়েন মহাবানী। এতক্ষণে মনে পড়ে যায় বাজবৈষ্ণব সাবধান-বাণী। ঐন দেহেব অভ্যন্তরে চম্পয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ রূপতির উদ্দেশ্যে বৈতানিকের দল মাজলিক তান শুক কবেছে, কিন্তু নির্বিঘ্নে কি তিনি তাকে আনতে পাবেন এ ধবাধামে? হু-চোখে জলেব ধাবা নেমে আসে বানীব। পথপ্রান্তে বুলিণয়ায় শায়িতা নারী অস্তিম যন্ত্রণায় চোখ বন্ধ করেন অবশেষে!

কাহিনীর এ পর্যন্ত যেটুকু বলেছি তার কাহিনী-চিত্রগুলি কালের কবলে অধিকাংশই ধ্বংস হয়ে গেছে। যেটুকু দেখতে পাচ্ছি তা এর পরের অংশ (চিত্র—১৫):

দেখছি এক রাজদরবার। মহামহিম বারাগসীর স্বনামধন্য অধিপতি উগ্গসেন (উগ্র-সেন) বসে আছেন রত্ন-সিংহাসনে। তাঁর চারপাশে মন্ত্রী, অমাত্য, সেনাপতির দল। দেখছি এক কানীর পণ্ডিতকেও। মাথায় মস্ত অর্কফলা, হাতে লাঠি, গায়ে চাদর। সকলেই কোতুহলী হয়ে বুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। কী দেখছে ওবা? দেখছে সাপের খেলা। সাপুড়িয়া তার ঝাঁপি খুলেছে। তাঁর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছেন ভীমকাস্তি এক মহানাগ! অথচ কী শান্ত, সমাহিত আত্মমগ্ন ভাব তাঁর। সাপুড়িয়ার বাঁশির তালে তালে ছলছেন তিনি।

কিন্তু দ্বারের বাইরে ও কার মূর্তি? ছিন্নবসনা শীর্ণদেহা ধূলিমলিনা এক অনাথিনী



ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ

୨୧—୮୧

নারীমূৰ্তি। কোন ভিখাবিণী হবে বোধ হয়। কিন্তু ওব মুখে তো ভিখারীমূলও কাঙালপনা দেখছি না। জীৰ্ণমলিন বহিৰঙ্গ ভেদ করে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন আভিজাত্যের জ্যোতি। তার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক শিশু--তার অবোধ দৃষ্টি মেলে। আহা কী সুন্দর! ভিখারিণীও এমন সন্তান হয়? মনে হয় যেন কোন বাজকুমার! মায়ের চোখে নেমেছে ছুটি জলের ধারা। যেন দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে অবশেষে এসে দাঁড়িয়েছে তীর্থপথের শেষ প্রান্তে, দেবমন্দিরের দ্বারে। তার একটি হাত ঐ পুত্রের কাঁধে--যেন ঠেলে দিয়ে বলছে: ছাখবে পাগলা--ঐ তোর বাপ।

মুগ্ধ হয়ে দেখছি নাগরানী স্মৃতির এই তীর্থযাত্রার ফলশ্রুতির দৃশ্যটি। কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সংবিৎ ফিরে পেলাম বঙ্গভাষায় একটি বামাকণ্ঠের প্রশ্নে: এ-গুলো কিসের ছবি?

সঙ্গে সঙ্গে শুনি উত্তর--দেখেও বুঝলে না? সাপ খেলানো হচ্ছে। স্নেক-চার্মার ও-সব দেখবে ফবেন টুবিষ্ট, যাবা আমাদের মতো পথে-ঘাটে সাপ-খেলানো দেখে না। চল চল, অনেক বাকি আছে এখনও।

সদলবলে ওঁবা চলে গেলেন সাপ-খেলানোর এ-চিত্রটি এক নজর দেখে কি না দেখে!

সাপুড়িয়ার বাঁশির তালে তালে ছুলাছেন নাগবাজ--আত্মনিমগ্ন তিনি--হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল দ্বাবপথে। বিছ্যৎপৃষ্ঠের মত চমকে উঠলেন একবার। তারপর স্থির হয়ে গেলেন। নাগবাজের পূবস্মৃতি ফিরে এসেছে। ঐ দ্বাব-প্রান্তের ভিখাবিণীকে দেখে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির হয়ে গেছেন তিনি। তালভঙ্গ হল নৃত্যছন্দে। বিবক্ক হলেন কাশীবাজ। বিস্মিত হল সাপুড়িয়া। কিন্তু নাগবাজের অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে ততক্ষণে। ঐ অনাথিনী ভিখাবিণীকে উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। সব ভুল হয়ে গেল তার--নবদেহ ধারণ করে এগিয়ে গেলেন দ্বাবের দিকে। ভিখাবিণীর ভীক ববাপুলি তুলে নিলেন নিজ হাতে, বললেন--অপবাধ করেছি, তুমি ক্ষমা কর আমাকে।

নিকলিষ্ট নাগবাজ চম্পেয়া-র কথা কে না জানে জন্মদ্বীপে? পবিচয় পেয়ে কাশীশ্বর উগ্গসেন সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাডালেন। সমস্মানে বাজর্ষি চম্পেয়াবাজকে এনে বসালেন আর একটি সিংহাসনে। বাজাস্ত্রপুত্র থেকে নাগরানী স্মৃতির উপযুক্ত বসন-ভূষণ নিয়ে এল পবিচারিকার দল।

পরের প্যানেলটিতে দেখছি কাশীবাজ উগ্গসেন আর নাগবাজ চম্পেয়া বসেছেন মুখোমুখি। বোধিসত্ত্ব চম্পেয়া শোনাচ্ছেন ধর্মের অন্তশাসন (চিত্র- ১৬)।

এই দববাব-দৃশ্যের এক প্রান্তে শিল্পী একটি কৌতুককর খণ্ড-চিত্র ঝেকেছেন। নাটকের মাঝে মাঝে যেমন খণ্ড-দৃশ্য বিদ্রব্যক এসে দর্শকদের মনটা হাল্কা করে দিয়ে যায়, অজস্র শিল্পী যেন চম্পেয়া বাজাবানীর মিলন-দৃশ্যের পরে তেমনি এক খণ্ড-চিত্রে কিছু কৌতুক পরিবেশন করতে চেয়েছেন।

নাগবাজ ধর্মের কথা শোনাচ্ছেন। এ-পাশে কয়েকটি লোকের জটলা। মুখেব ভাবব্যঞ্জনা দেখে বেশ বোঝা যায়, তাদের মধ্যে কেউ বিশ্বাসী, কেউ অবিশ্বাসী। কেউ ধর্মকথায় আত্মমগ্ন, কেউ পাবলৌকিক তত্ত্বের চেয়ে লৌকিক লাভের আশায় সক্রিয়। একটি লোককে দেখছি, যেন স্পেন বা ফরাসী দেশীয় পোশাক-পরা। একজন সূতনুকা পরিচারিকা তন্ময় হয়ে নাগবাজের মুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা শ্রবণ করছে। তার দক্ষিণহস্ত ফল ও মিষ্টান্নপূর্ণ একটি অর্ঘ্য-থালিকা। পিছন থেকে একটি নীচ জাতীয় হস্তলাঘব স্ক্রুশোলে ঐ থালিকা থেকে ফল চুবি করছে। তার দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে লোভ ও ভয়ের সংমিশ্রণ। ঠিক পাশের বাজনিকাটি এ চৌর্যবৃত্তিটি দেখতে পেয়েছে। সে পার্শ্ববর্তী তন্ময় পরিচারিকাকে যেন সাবধান করে দিচ্ছে। বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী এমনই



চিত্র ১৬০

চম্পিয়া ভাণ্ড - কাশীনাথ উগগসেন ও নাগবাজ চম্পিয়া

একটি ঘটনাস্রোতে যেন গা ভাসিয়েছিল, আর শিল্পী যেন এক স্নাপশটে এই খণ্ড-মুহূর্তটিকে শাস্বত করে ধরে ফেলেছেন হঠাৎ।

ঐ যুরোপীয় পোশাক-পরা মানুষটিকে দেখে মনে পড়ছে অজস্তাব বিভিন্ন চিত্রে অসংখ্য বিদেশীকে বাবে বাবে দেখেছি। মঙ্গোলীয়, পাবসীক, গ্রীক, শক, পহলুবদের দেখেছি বহু চিত্রে। তাদের মুখাকৃতি, তাদের পোশাক দেখে বোঝা যায়, বৌদ্ধ শিল্পীবা একান্তবাসী হলেও, তদানীন্তন ভারতবর্ষের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগসূত্রটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। হয়তো এই শিল্পীর দলে অনেকেই ছিলেন—যাঁরা বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার আগে, পূর্বাশ্রমে, রাজদরবারের দৃশ্যগুলি অতি নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। অজস্তাব একান্ত গুহায় এই সব বিদেশীর যাতায়াত ছিল না নিশ্চয় - কিন্তু কী নিখুঁতভাবে এদের পোশাক, শিরজ্ঞান,

মুখাবয়ব এঁকেছেন এই নির্জনবাসী শিল্পীরা শুধুমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে! বিভিন্ন গৃহ-চিত্র থেকে সংগৃহীত সামান্য কয়েকটি নমুনা—চিত্র—১৭তে সন্নিবেশিত করলাম এই প্রসঙ্গে।

তা যেন হল—কিন্তু, আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। প্রাচ্য শিল্প-বিশারদ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন :

অজস্তার শিল্পী যা-কিছু এঁকেছেন তার প্রত্যেকটির পিছনে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত' ছিল। চীন, জাপান বা দূর প্রাচ্যের বৌদ্ধ শিল্পীরা বুদ্ধের জীবনের বা জাতকের যে সব চিত্র এঁকেছেন, তার পশুপাখী গাছপালা ঘরবাড়ী সব-কিছুকেই তাঁদের কল্পনায় দেখতে হয়েছে! কিন্তু অজস্তার বৌদ্ধ শিল্পী যে-সব রাজারানী দাসদাসী সাধু ভিখারীর চিত্র এঁকেছেন, তাদের যে-সব আনন্দ-বেদনার অভিব্যক্তিকে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন সেগুলি তাঁরা অতি নিকট থেকে দেখেছেন। আর তাই সেগুলি এত বাস্তবানুগ, এত জীবন্ত হয়েছে।



চিত্র—১৭

তাই ভাবছিলাম—এ-কথা যদি সত্য হয়, তাহলে কোন্ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে অজস্তার বৌদ্ধ শিল্পী কাশীরাজের দরবারের বাহির-দ্বারে ঐ অনাথিনীর ভাববাজ্ঞনাকে রূপ দিয়েছিলেন?

এ দৃশ্যে ঐ বিদেশীটির চিত্র দেখে মনে হয়েছিল, শিল্পী বিদেশীদের খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজসভার নিখুঁত আলেক্ষ্য দেখে মনে হয়, যেন কোন এক বাস্তব রাজদরবারের সঙ্গে শিল্পীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

কল্পনার রাশ আলগা করে দিলাম। কে জানে, এই অনবদ্য দরবার-দৃশ্যটি এঁকেছেন যে বৌদ্ধ শ্রমণ, তিনি হয়তো সত্যিই ছিলেন এক রাজপুত্র। সেই অপ্রত্যাশিত ভিক্ষু কি আজ থেকে হাজার বছর আগে একদিন গোপনে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন তাঁর

রাজপ্রাসাদ, শবণ নিয়েছিলেন তথাগত বুদ্ধের, ধর্মের আব সজ্জের? কে জানে, হয়তো তিনি নিজেই ত্যাগ কবে এসেছিলেন আসন্ন-প্রসবা এক হতভাগিনী সীমন্তিনীকে কোন অবস্খী-বিদিশা-আবস্খী কিংবা উজ্জয়িনীর এক নির্জন কক্ষে। পীতবসনে আচ্ছাদিত কবেছিলেন অন্তবেব বক্তরাগকে। হয়তো দীর্ঘদিন নিযুক্ত ছিলেন এই গুহা-মন্দিবে আলেক্সা কপায়ণের কাজে। আব তাবপব কি কোন এক অন্তসূর্য-উদ্ভাসিত গোধূলি লগ্নে আলেক্সা-নিবন্ধ-দৃষ্টি আশ্রমণ হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেয়েছিলেন এই গুহা-মন্দিবেব সম্মুখে, ঐ স্তম্ভটিব পাদমূলে দাঁড়িয়ে আছে একটি অনাথিনী নাবীমূর্তি—অনিদ্যকাস্তি এক দেবশিশুব হাত ধবে? হঠাৎ কি সেই ভিক্ষু ফিরে পেয়েছিলেন পূব অভিজ্ঞান, চিনতে পেয়েছিলেন ঐ ভিখারিণী, আব তাব দেবতুল্লভকাস্তি শিশুপুত্রকে?

হ অপবিচিত মহান শিল্পী, আজ হাজার বছবেব এপাব থেকে তোমাকে প্রশ্ন কবতে চাই—তুমিও কি শিউবে উঠে স্থির হয়ে গিয়েছিলে নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখাব মত? নাগবাজ চম্পেয়া-র মত তুমিও কি হঠাৎ দাবদেশে এগিয়ে এসে বলেছিলে—অপবাধ কবেছি, আমাকে ক্ষমা কব?

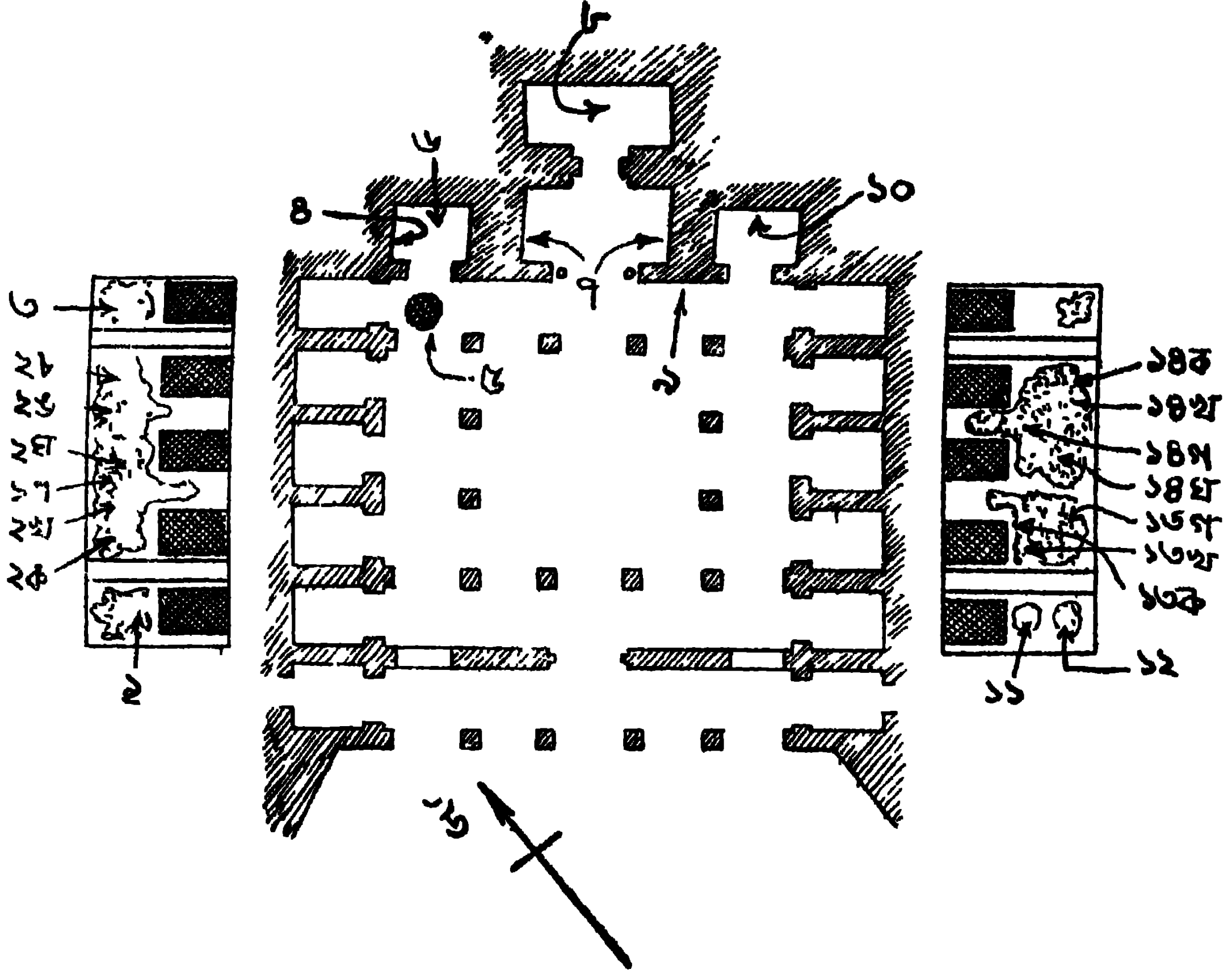
জানি, আমাব এ প্রশ্নেব জবাব বুখাই মাথা খুঁড়ে মববে এ গুহা-প্রাচীবে। তবু বিশ্বাস কবতে মন চায়—এ সত্য। না হলে কোন্ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে সম্বল কবে সেই বৌদ্ধ শ্রমণ আঁকতে পেয়েছিলেন এই মহান দৃশ্যপট।

আগেই বলেছি, অজন্তাব ত্রিশটি গুহা-মন্দিবকে অবস্থান অনুযায়ী এক-দুই-তিন ইত্যাদি নম্বর দেওয়া হয়েছে। এব ফলে, দ্বিতীয় গুহা-মন্দিব মানে এ নয় যে, প্রাচীনতাব দিক থেকে এটি দ্বিতীয়। বস্তুতঃ, এটি প্রথম গুহা-মন্দিবেব সমসাময়িক। অর্থাৎ, মহাযান বৌদ্ধ যুগেব। আকাবে প্রথমটিব অপেক্ষা কিছু ছোট। মাঝেব হল-কামবাটি ৪৮ ফুট X ৪৭ ফুট। এটিও বৌদ্ধ শ্রমণদেব আবাসস্থল, অর্থাৎ বিহার। মূল মণ্ডপেব দুদিকে পাঁচটি কবে এবং সামনে আবও দুটি কবে ছোট কক্ষ এব সঙ্গে

যুক্ত। এগুলি গবাক্ষহীন অন্ধকাব কুটুবি। প্রথমেব মত দ্বিতীয় দ্বিতীয় গুহা মন্দিব মন্দিবেও কৃত্রিম বৈদ্যাতিক আলোয় ভাল কবে দেখাবাব ব্যবস্থা

আছে। এটিও প্রাচীর-চিত্রেব সম্ভাবে অজন্তাব অগতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এখানে প্রাচীর-চিত্রে নীল বড়োব প্রাবলা লক্ষ্য কবলাম। সম্মুখদিকে চাবটি স্তম্ভ এব দুটি অধ-স্তম্ভ (পিলাস্টার)। প্রবেশ-দ্রাব দিবে সভামণ্ডপে প্রবেশ কবি। দেখি, পলেক্তাবা অনেক জায়গায় খসে খসে পড়েছে। গুহা-মন্দিবগুলি খনন কবা হয়ে গেলে, বৌদ্ধ শিল্পীব দল তাব উপব যুক্তিকাব একটি আস্তবণ দিতেন। মাটিব সঙ্গে গোময় এবা আশযুক্ত আবও কিছু মেশানো হত। এই পলেক্তাবা বা আস্তবেব বেব আনুমানিক এক ইঞ্চি থেকে দেড় ইঞ্চি। এটি শুকিয়ে গেলে তাব উপব ডিমের উপবকাব খোলার মত পাতলা ও মসৃণ একটি চূনেব আস্তব দেওয়া হত যেন পঙ্খের কাজ! তার উপব গিরিমাটি-বড়োব বঙিন পেন্সিলে চিত্রকেব দল আলেক্সোর বহিরঙ্গটি

আকতেন। সবশেষে পাথরগুঁড়া গুলে অথবা ভেজ কিছু বেটে তার উপর জল-রঙের কাজ করতেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, 'টেম্পরা' ও 'ওয়াশ' দুই পদ্ধতিতেই তারা এঁকেছেন।



চিত্র—১৮

দ্বিতীয় 'উহা-মন্দির' প্ল্যান

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ১। হংস জাতক | ১১। ভগ্নদূত (চিত্র ২১) |
| ২। বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনা | ১২। ক্ষান্তিবাদী জাতক (চিত্র-২২) |
| ক ত্রিভুজ স্বর্ণে বুদ্ধদেব | ১৩। পূর্ণ অবদান জাতক (চিত্র—২৩) |
| খ মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন | ক পূর্ণ বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে |
| গ শুক্লোদ-নর বাজসভা (চিত্র—১৯) | খ ভাবিলাব বাণিজ্যতরী |
| ৩। স্তম্ভের পাশে মাথা (চিত্র—২০) | গ প্রাবস্তীতে পূর্ণ ও ভাবিলা |
| ৪। বুদ্ধের জন্ম | ১৪। বিধুব পণ্ডিত জাতক |
| ৫। শিশুর সপ্তপদ পরিভ্রম | ক ইন্দ্রপ্রস্থ বাজসভায় পূর্ণ ক |
| ৬। একসারি বুদ্ধমূর্তি | খ অক্ষত্রীড়ার দৃশ্য |
| ৭। অর্ঘ্যদানেচ্ছু রমণীগুণ্ড | গ বিধর পণ্ডিতের বিদায় যাত্রা |
| ৮। তেইশটি হাঁসের খালা | ঘ নাগবাজে বিবব (চিত্র—২৭) |
| ৯। শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির মর্মর-মূর্তি | |
| ১০। প্রাবস্তীর সহস্র বুদ্ধ | |
| ১১। ধর্মচক্রমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি | |

অর্থাৎ, চূনের সূক্ষ্ম আস্তবটি ভিজে থাকা অবস্থায় এবং তা শুকিয়ে যাবার পব ছভাবেই আঁকা হয়েছে। অধিকাংশ চিত্রই অবশ্য দেওয়াল-গাত্র ভালভাবে শুকিয়ে যাবার পব

আঁকা। ক্ষেত্রবিশেষে রঙ বেশ মোটা করে দিয়েছেন - তেল-রঙের ছবিতে অনেক সময় যেমন বড় উঁচু হয়ে লেগে থাকে--চোখ বুজে হাত দিলেও যেমন বোঝা যায়, তেমনি আর কি। সবশেষে জলবায়ুর আক্রমণে যাতে ছবিব বড় জলে না যায়, তাই কিছু একটা আশ্বচ্ছ আস্তর দিতেন তাঁরা। সেটি যে কি, তা আজও জানা যায় নি।

বামদিকের প্রাচীরে প্রথমেই নজরে পড়ল হংস জাতকের একটি কাহিনী (২।১)।

কাশীব মহাবানী ক্ষেমাদেবী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, এক স্বর্ণ-বাজহংস তাঁকে ধর্মের বাণী শোনাচ্ছেন। স্বপ্নভঞ্জে বানী কাশীবাজকে তাঁর সেই অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বললেন, মিনতি জানালেন- মহাবাজ যেন ব্যবস্থা করে দেন, তিনি স্বর্ণ-হংসের কাছে ধর্মকথা শুনতে

চান। শুনে বাজা অবাক হন। এ আবার কি অদ্ভুত প্রস্তাব।

মহাবাজের বাস্তবিক্রমে মহাবানী মমাহতা তিনি অল্পজল তাগ করলেন। কাশীবাজ বিবক্ত হলেন, শেষ পর্যন্ত কথা প্রসঙ্গে সভাপণ্ডিতকে সে-কথা বলতেই তিনি সবিনয়ে বললেন, মহাবাজ, মহাবানী যে স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর পিছনে কিছু সত্যের ইঙ্গিত আছে। আপনি অবগত নন, কিন্তু পবনবদ্ধ বর্তমানে এক স্বর্ণ-বাজহংসের মূর্তিতে বোধিসত্ত্বরূপে ধ্বাধামে সতাই অবতীর্ণ হয়েছেন ক্ষেমাদেবী সম্ভবতঃ তাঁকেই দেখেছেন স্বপ্নে। এ স্বপ্ন কল্যাণকর, আপনি বোধিসত্ত্বকে কাশীতে আনয়নের আয়োজন করুন।

তখন সভাপণ্ডিতের পরামর্শমত কাশীবাজ একটি পবিত্র স্থানে এক মনোবম সর্বোব খনন করালেন। সে বাতা দেশ-বিদেশে প্রচারিত হল। দূর দেশের যাত্রীরা দলে দলে আসতে থাকে এই অপকর্ণ সর্বোবটি দেখতে। শেষে হ সর্বাজ বোধিসত্ত্ব সপার্বদ একদিন সে সর্বোব দেখতে এলেন। মহাবাজের নির্দেশ দেওয়াই ছিল। কাশীবাজ-নিযুক্ত শিকারী বন্দী করে ফেলে স্বর্ণ-হংসকে। নিয়ে আসে তাঁকে বাজদরবাবে। মহাবানী ক্ষেমা সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন। পবন যত্নে তিনি স্বর্ণ-হংসকে সেবা-যত্ন করতে থাকেন। স্বর্ণ-হংস প্রীত হয়ে বলেন তুমি কি চাও মা?

ক্ষেমা বলেন : আপনাব কাছে ধর্মের মূল কথা শুনতে চাই প্রভু।

বোধিসত্ত্ব বলেন : বেশ। শোনাও তোমাকে।

বাজাদেশে দরবাবের এক প্রান্তে আয়োজন করা হল এক ধর্মসভা। স্বর্ণ-হংস বোধিসত্ত্ব কাশীবাজ ও মহাবানীকে সৎ ধর্মের মূল কথাগুলি একে একে বলতে থাকেন।

এই ফ্রেস্কাটির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। যেটুকু দেখা যায়, তাতে দেখতে পাচ্ছি একটি পদ্মবন-শোভিত সর্বোব তাতে বাজহংস - তীব্র উত্তম ধনুকহাতে শিকারী...। আর দেখছি, কাশীবাজের আয়োজিত ধর্মসভা কাশীবাজের মুকুট-শোভিত মাথাটি শুধু দেখা যায় বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে অক্ষত আছে তাঁর করাজুলির ধর্মচক্রমুদ্রাটি। বোধিসত্ত্বের বামদিকে বাজমহিষী ক্ষেমাদেবীকে^১ সনাক্ত করা

(১) পরে ক্ষেমাদেবী অগ্রণাবিকা হন, অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মমুসাবে সারিপুত্র, মহামেদগল্লাংঘন, উৎপলপর্ণা ও সেনা সমজ্ঞেয়। বুদ্ধের অন্ত্যস্ত শিষ্ঠ-শিষ্ঠা ৭ মর্দা পান নি।

যায় ভক্তিবসে তাঁর মুখাবয়ব আশ্রুত রানীর পদপ্রান্তে একটি নীলকমল বাজসভাব বাহিবে একটি অস্ত্রদণ্ড লক্ষণীয় দণ্ডে নানান জাতের আয়ুধ ঢাল, ভল্লা, খড্গ, চামড়ার কোমববন্ধ।



চিত্র—১৯

মভাপণ্ডিত মহাবাজ শুদ্ধোদন ০ মায়াদেবীকে স্বপ্নের অর্থ বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

অবস্থান—২।২গ

এব পরেই একটি বিস্তৃত প্যানেলে গৌতম বুদ্ধের জীবনের আদিপর্বের কয়েকটি অপকৃপ চিত্র-সম্ভাব (২।২)। এগুলি অধিকাংশই অক্ষত। উপরে প্রথম দেখছি, তুষিত স্বর্গে বোধিসত্ত্ব শেষবার জন্মগ্রহণের পূর্বমুহুর্তে চিন্তামগ্ন (২।২ক)। তিনি ভাবছেন, কোন্ ভূ-ভাগে, কোন্ পরিবারে তিনি শেষবারের মত জন্মগ্রহণ করবেন। অবশেষে মনস্ত্বির করেন তিনি—ভূমিষ্ঠ হবেন পুণ্যভূমি ভাবতবর্ষে। কপিলাবস্তুর মহাবাজ শুদ্ধোদনের বংশকে ধন্য করবেন তিনি। কৃতার্থ করবেন কপিলাবস্তুর রাজমহিষী মায়াদেবীকে।

পরের চিত্রে দেখছি, মায়াদেবী স্বপ্ন দেখছেন শূন্যপথে এগিয়ে আসছে এক শ্বেতহস্তী, অমিতবিক্রম সে। এক দেবতুল্য স্বর্গীয় জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই শ্বেতহস্তীর অঙ্গ

থেকে। ক্রমে সেই হস্তী তাঁর দক্ষিণ অঙ্গে প্রবেশ করল। স্বপ্নভঙ্গের পরে মায়াদেবী
 রাজা শুদ্ধোদনকে এই অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের কথা শোনালেন (২।২খ)
 গৌতমের জন্মকাহিনী

—কী অর্থ এ বিচিত্র স্বপ্নের? মহারাজ সভাপণ্ডিতদের ডেকে প্রশ্ন
 করেন, মহারানীর এ অদ্ভুত স্বপ্ন-দর্শনের তাৎপর্য কি?

পরের প্যানেলটিতে দেখছি, মহারাজ শুদ্ধোদন এবং মহারানী মায়াদেবী বসে আছেন
 একটি রত্নসিংহাসনে (চিত্র—১৯)। ব্যাজনিকা, ছত্রধারিণী, চামরধারিণীর দল ঘিরে আছে
 তাঁদের তুজনকে। সম্মুখে একটু নিম্নাসনে একজন পণ্ডিত স্বপ্নমঙ্গলের কথা শোনাচ্ছেন।
 পণ্ডিতের মস্তকে ইন্দ্রলুপ্ত, তাঁর সমস্তবিশিষ্ট গুণ্ডরাজি লক্ষণীয়। এখানে লক্ষ্য করে
 দেখুন, মহারানীর দক্ষিণহস্তের বেড় দেহের তুলনায় ছোট। কোনও পাশ্চাত্য চিত্র-রসিকের
 মতে, এটি চিত্রাঙ্গনের ক্রটি বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমরা জানি ভারতীয় চিত্রকর
 বহিরঙ্গের দিকে অতটা সূক্ষ্ম নজর দিতে নারাজ। স্বপ্নমঙ্গলের বৃত্তান্ত শুনে বসে রানীর
 মুখে কী অপূর্ব ভাবব্যাঞ্জনা ফুটে উঠেছে—এইটি আঁকতেই শিল্পী তাঁর সমস্ত প্রতিভা
 নিয়োজিত করেছেন। এখানেই রাফায়েল, মাইকেল এঞ্জেলোব সঙ্গে অজন্তা শিল্পীর
 প্রভেদ, এখানেই গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের তফাত। জ্যোতিষী বলেছেন—
 এ স্বপ্ন-দর্শনের অর্থ হল মহাবাহুব গর্ভে জন্ম নেবেন এক মহাপুরুষ। তিনি যদি
 সংসারে থাকেন, তবে হবেন ত্রিভুবনবিজয়ী রাজচক্রবর্তী, আর যদি সংসারে বীতরাগ
 হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে তিনি হবেন জগদগুরু, বিশ্বত্রাতা মহা-অবতার! কোন
 একটি বিবাহিতা অপুত্রক নারী যদি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের সম্বন্ধে এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী
 শোনেন, তবে তাঁর কী জাতীয় ভাবাবেশ হয় তাই ফুটিয়ে তুলতেই অজন্তা শিল্পী তাঁর
 সমস্ত প্রতিভা ব্যয়িত করেছেন। নিরলস সাধনায় মায়াদেবীর মুখে তিনি সেই ভাব-
 ব্যাঞ্জনাটি মূর্ত করতে চেয়েছেন তাঁর কাছে তখন হাতের বেড়ের মাপ ছিল তুচ্ছ, নগণ্য,
 এহ বাহ!

শিল্পী যেন মায়াদেবীর অপূর্ব চিত্রটি একে তৃপ্ত হন নি। তাঁর মনে হল, রাজসভায়
 সর্বসমক্ষে মায়াদেবীর মুখে সেই ভাবাবেশটি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি তিনি। মায়াদেবী
 যেন এ-কথা শুনে ছুটে চলে যেতে চেয়েছিলেন তাঁর নির্জন নিভৃত কক্ষে। যেন আনন্দের
 অশ্রুপ্লাবনে ভেসে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর। শিল্পী তাই ঠিক পরের প্যানেলেই
 এঁকেছেন একটি অপূর্ব চিত্র। রাজসভা থেকে বেরিয়ে এসে মায়াদেবী একাকী দাঁড়িয়ে
 আছেন একটি স্তম্ভের সম্মুখে। তাঁর বামচরণ স্তম্ভ স্পর্শ করে আছে। সচোচ্চত স্বপ্ন-
 মঙ্গলের কথাই ভাবছেন তিনি, তাঁর প্রতি রোমকুপে রোমাঙ্কের শিহরণ, তাঁর হৃদয়ে
 আনন্দের জোয়ার (চিত্র—২০)।

পরের প্যানেলে দেখছি, শিবিকারোহণে মায়াদেবী চলেছেন পিত্রালয়ে...যাচ্ছেন
 লুণ্ঠনিকাননের মাঝখান দিয়ে...সঙ্গে চলেছেন মহারানীর শত সখী। কিন্তু পিত্রালয়ের
 নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছানো সম্ভবপর হল না। পরের চিত্রে দেখছি, একটি শালবৃক্ষের

কাণ্ডে দেহভার স্তম্ভ করে মায়াদেবী দণ্ডায়মানা... তাঁর একটি বাহু উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত—যেন শালভঞ্জিকামূর্তি। তাঁর রোমাঙ্কিত তনুদেহটি ধরে সাস্ত্রনা দিচ্ছেন তাঁর ভগ্নী, শুদ্ধোদনের অপরা মহিষী মহাপ্রজাপতি বা মহাগৌতমী; আব মায়াদেবীর দক্ষিণ উদর থেকে নির্গত হচ্ছেন মহাজাতক, জগৎ-ত্রাতা ভবিষ্য বুদ্ধ (২।২৬)।

চলেছে চিত্রের মিছিল—যেন চলচ্চিত্রের সিকোয়েন্সের পর সিকোয়েন্স। পরের প্যানেলে দেখছি, স্বর্গ থেকে দেবগণ মর্ত্যে নেমে এসেছেন, ঋষিলোক থেকে সিদ্ধাচার্যের দল এসেছেন মহাজাতককে সম্মান দেখাতে। এসেছেন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অসিত, দেবল। দেবরাজ ইন্দ্রের ক্রোড়ে দেখাচ্ছিলেন মহাজাতককে। ত্রিনয়ন ইন্দ্রকে সনাক্ত করা কঠিন নয়। তাঁর পাশেই দেখছি, প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজছত্র ধরে আতপতাগ থেকে শিশুকে রক্ষা করছেন। পাশে চামরধারী। চিত্রে দেখছি জন্মলাভমাত্র শিশু বলছেন : অগ্গোহম্ অস্মি লোকস্ম; বলছেন—আমিই এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ! এ-কথা বলেই শিশু সপ্তপদ অগ্রসব হয়ে যান অনায়াসে। তাঁর প্রতি চরণপাতে ফুটে উঠল এক-একটি স্থলপদ্ম (২।২৮)। চিত্রে সেই সপ্তপদ্মকে দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। দেখাচ্ছি ত্রিনয়ন ইন্দ্র রাজছত্র ধারণ করে শিশুর পিছন পিছন অনুগমন করছেন সপ্তপদ! সম্পূর্ণ দেওয়াল জুড়ে এইভাবে তথাগত বুদ্ধের জীবনের আদিপর্ব এখানে বিধৃত। এই প্রাচীরের উপর দিকে কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত (২।৩)।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসি অন্তবালের বাম-পার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্রায়তন কক্ষটিতে। বামদিকের প্রাচীর-গাত্রে (২।৪) কয়েকটি বমণীর দণ্ডায়মান মূর্তি। তাঁরা সাবি বোধে বুদ্ধদেবকে অর্পণ দান করতে চলেছেন। এ মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ পববর্তী যুগের, তখন শিল্পের সৌকর্য নিম্নাভিমুখী। চিত্রের মূর্তিগুলি হারিয়েছে অজ্ঞতা-চিত্রের স্বাভাবিক পেলবতা, চিত্রের হর্যামালায় স্তম্ভগুলি অস্বাভাবিকভাবে সরু। মোটকথা, এ চিত্রটি মনে হল পববর্তী যুগের সংযোজন। বঙ্কিমী ভাষায় ‘প্রক্ষিপ্ত’।



চিত্র—১০

গর্ভস্থ সন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে
ভানাবিষ্টা মায়াদেবী
অবস্থান—২।২৬

এই ক্ষুদ্রায়তন কক্ষটির সামনে সিলিঙে (২১৫) তেইশটি হংসের একটি বিচিত্র গোলাকৃতি আলিম্পন-রেখা। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই তেইশটি হংসের একটিও অপর কোন একটির নিছক অনুকরণ নয়। আলপনার নকশায় এটি অস্বাভাবিক নয় কি? আলপনার ধর্মই হচ্ছে একই চিত্রের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে নকশার কারুকার্য গঠন করা। অথচ, এখানে প্রত্যেকটি হংসের চিত্রই মৌলিক চিত্র—কেউ কারও অনুকৃতি নয়। প্রত্যেকটি হংসের ভঙ্গি বিচিত্র, বিশিষ্ট এবং মৌলিক।

এই কক্ষটিতে আছে শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধির দুই মর্মর-মূর্তি (২১৬)। ঐরা দুজন জন্তুল বা কুবেরের দুই অনুচর। অন্তরালের বাম ও দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে (২১৭) শ্রাবস্তীর সহস্র বুদ্ধের অনুকৃতি—এক-একদিকে পাঁচশতটি। মূল গর্ভগৃহে মর্মর-মূর্তিটি (২১৮) যুগদাবে পদ্মাসনে বসে বুদ্ধদেবের। তাঁর করাঙ্গুলি এখানেও সেই ধর্মচক্রমুদ্রা রচনা করেছে।

ওপাশে একটি দীর্ঘকায় বুদ্ধমূর্তি অঙ্কিত ছিল (২১৯)। এখন শুধু মস্তক ও পদদ্বয় দেখা যায় মাত্র। তার ওপাশে গর্ভকক্ষে জন্তুল ও হাবিতীর প্রস্তব-মূর্তি (২১১০)। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে ঐরা যেন কুবের ও তাঁব স্বীর পরিপূরক। কিছুটা প্রভেদ আছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রানুসারে হারিতী ছিল রাক্ষসী। কিন্তু সে শিশুদের ভালবাসে; অনেকটা আমাদের বঠীমায়ের মত। বুদ্ধদেবকে একবার আক্রমণ করেছিল হারিতী; কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে শেষ পর্যন্ত সে নতিস্বীকার করে। তাঁর আশীর্বাদ পায়। ফলে, তার রাক্ষসী-প্রবৃত্তি ত্যাগ করে শিশুদের নিয়েই মায়ের ভূমিকায় জীবনযাপন কবে। রাক্ষসীকে মাতৃ-মূর্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন বুদ্ধদেব। এখানে মর্মর-মূর্তিতে সেই কাহিনীটি বিধৃত।

দেখছি, স্বীতোদর জন্তুল ও হাবিতী বসে আছে যুগ্মাসনে। হারিতীর এক হাতে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ মঞ্জুষা, অপর হাতে একটি শিশু। জন্তুলের হাতটি ভাঙা। সে হাতে কি ছিল জানা যায় না। জন্তুলের উপরে দেখছি চতুর্ভুজা রাক্ষসীর বেশে হারিতী আক্রমণ করছে বুদ্ধদেবকে। বুদ্ধদেব শান্ত, অবিচলিত। পরের দৃশ্যটি হারিতীর মূর্তির উপরে খোদাই-করা। সেখানে দেখছি, হারিতী তথাগতকে প্রণাম করছে। হারিতীর ক্রোড়ে এবার দেখছি একটি শিশু। আক্রমণের সময় সে ছিল চতুর্ভুজা আয়ুধধারিণী রাক্ষসী।

প্রণামের সময় সে শিশুক্রোড়ে মাতৃ-মূর্তি। সিংহাসনের নীচে

জন্তুল ও হারিতী

দশটি শিশুর মূর্তি। কোতুকপ্রদ এ শিল্প-নিদর্শনটি। দশটি শিশুমূর্তি দুই ভাগে বিভক্ত। জন্তুলের পদতলে সর্বদক্ষিণে (দর্শকেব দক্ষিণ) দেখছি পাঠশালার গুরুমশাই, তাঁর হাতে বেত্রদণ্ড। তাঁর সম্মুখস্থ প্রথম তিনটি শিশু পড়াশুনা করছে। তাদের পিছনে দুটি শিশু মল্লযুদ্ধ করছে। হারিতীর পদতলে পাঁচটি শিশুই ভেড়ার লড়াই নিয়ে মেতে আছে। অভিকর্ষের সূত্রের অনুকরণে আমরা বলতে পারি, শিশুদের বিজ্ঞার প্রতি মনোযোগ শিক্ষকের দূরত্বের ব্যস্তানুপাতে নির্ভরশীল। যে যত কাছে সে তত মনোযোগী। যে যত দূরে সে ততই দূরে সরে গেছে বিজ্ঞা থেকে।

দক্ষিণেব দেওয়ালে একটি বুদ্ধ কঙ্কুরী চিত্র দেখতে পেলুম, ভাবব্যঞ্জনায় সেটি অপূর্ব। হতভাগা ভগ্নদূত কোন ছঃসংবাদ বহন করে এসে দাঁড়িয়েছে রাজার সম্মুখে।



চিত্র—২১

জৈনক ভগ্নদূত বা বুদ্ধ কঙ্কুরী

অবস্থান—২।১১

গাইডকে প্রশ্ন করে, বই ঘেঁটে উদ্ধার করতে পারলুম না—কে সেই রাজা, কিসের এই ছঃসংবাদ। মহাকালের অঙ্গুলিহেলনে সে রাজাও নেই, সেই ছঃসংবাদও আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া—এমনকি ইতিহাসও ভুলে গেছে সে ঘটনা। শুধু ক্ষতচিহ্ন-লাঙ্ঘিত প্রাচীর-গাত্রের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে অক্ষয় হয়ে আছে ভগ্নদূতের সেই অপূর্ব অভিব্যক্তিটি (চিত্র—২১)। তাব দক্ষিণহস্তের মুদ্রা, বিষাদখিন্ন দৃষ্টি দেখে অনুমান করা শক্ত হয় না কি জাতীয় সংবাদ বহন করে এনেছে হতভাগ্য ভগ্নদূত (২।১১)।

এই গুহা-মন্দিবেই রুকজাতক ও ক্ষান্তিবাদী জাতকের দুটি অনবদ্য চিত্র-কাহিনী ছিল বলে পড়েছি প্রামাণিক গ্রন্থে। অনেক চেষ্টা করেও তাদের সনাক্ত করতে পাবলুম না। বোধ করি; কালের কবলে সেগুলি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু ক্ষান্তিবাদী জাতকের একটি অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ টিকে আছে। সেটির কথা বলি :

সৎ ধর্মের প্রতি বিরূপ এক ব্রাহ্মণ নরপতি একবার তাঁর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নর্তকীদের নিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন। উৎসব ও আমোদে ক্লান্ততম মহারাজ প্রমোদ-কাননের একান্তে নিদ্রাভিভূত হওয়ায়, নর্তকীর দল ইচ্ছামত কাননে পরিভ্রমণ

করতে থাকে। সহসা তাবা বনের একান্তে এক পীতবসনাবী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পায় সন্ন্যাসী ওদের দেখতে পেয়ে কাছে ডাকেন, সম্মুখে নানা কথা আলোচনা করতে থাকেন

এই সন্ন্যাসী বস্তুতঃ বোধিসত্ত্ব। তাঁর মুখ-নিঃসৃত ধর্মকথায় নর্তকীর দল ক্রমশঃ বিভোর হয়ে যায়। ওদের প্রধান রাজনর্তকী ভাবাবেশে

একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। নিদ্রান্তে মহারাজ উঠে নর্তকীদের দেখতে না পেয়ে ক্রোধাক্ত হয়ে পড়েন। সন্দান করতে করতে তিনি আসেন সন্ন্যাসীর নিকটে। মহারাজ বোধিসত্ত্বকে তরবারি দ্বারা ক্রমাগত আঘাত করতে থাকেন। ক্ষান্তিবাদী বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ করেন না। সমস্ত আঘাত অবিচলভাবে গ্রহণ করেন। এতে রাজনর্তকী আবেগে অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই দেখে মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে বধ করতে যান নটীকে। রাজনটী তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে।

কাহিনীর সমস্তটাই অবলুপ্ত, শুধু টিকে আছে একটি খণ্ডচিত্র (২।১২)। দেখছি একটি রাজদববাব। সিংহাসনে বসে আছেন একজন বাজা, তাঁর দক্ষিণহস্তে কোষমুক্ত তববাবি। বিহ্বলা বাজনর্তকী লুটিয়ে পড়েছে তাঁর চরণমূলে। পার্শ্ববর্তী নর্তকী দুহাতে নিজের মুখ ঢেকেছে। অপর একজন পলায়নে উদ্যত। ক্রোধোন্মত্ত বলদর্পী মহাবাজের ভঙ্গিটিও লক্ষণীয় (চিত্র—২২)।



চিত্র - ২২

শাস্তিবাদী জাতক- অপরাধিনী বাজনর্তকীকে শাস্তিদানে উদ্যত রাজা

অবস্থান ২।১০

বাজাব চরণপ্রান্তে প্রণতা বাজনর্তকীর এ প্রণামের ভঙ্গিটি আমাদের কাছে সুপরিচিত, কিন্তু এই বহুল-ব্যবহৃত নকশা-চিত্রটির মূল উৎস কী তা তথ্যভেদে জানতুম না আমিবা।

ছবিটি দেখে মনে মনে হাসি চিত্রটির কিছুটা অশ আছে, কিছুটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে মহাকালের নির্দেশে। মনে মনে বলি, হে মহান শিল্পী, তুমি এমন একটি খণ্ডমূর্ত্তের পরিকল্পনা করছিলেন, যার পরমুহর্ত্তেই ঐ হতভাগিনী বাজনর্তীর শিরশ্ছেদ হওয়ার কথা। অন্ততঃ হাজার বছর পূর্বে তাই তুমি ভেবেছিলেন। দানি না আজ অমর্ত্যালোকের কোন অন্তরাল থেকে তুমি তোমার এই অনবদ্য চিত্রপটটি দেখতে পাচ্ছ কি না। পেন্সে তুমি নিশ্চয় আমাবই মত হাসছ তোমার প্রিয় বাজনর্তকীর মস্তক আজ হাজার বছরেও দেহচ্যুত হয় নি। অস্পষ্ট হয়ে এলেও তার ঘন-নিবদ্ধ পুষ্পস্তবক-লাঞ্ছিত কববীর আভাস আজও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। অথচ যে উদ্যত নৃপতি ওর শিরশ্ছেদ করবার জন্য

তরবারি উত্তোলন করেছিলেন তিনি নিজেই আজ ছিন্নশিব ! খসে পড়েছে পলেন্তাবার ঐটুকু অংশ !

মহাকাল তোমাকে প্রণাম । ধন্য তোমাব সৃষ্টি রসবোধ ! মহারাজেব মুণ্ডপাত কবাব পবেও কৌতুক কবে জিইয়ে বেখেছ তাব কোষমুক্ত নিষ্ফলা তববারিটিকে ।

কিন্তু তাই তো দেখতে পাই ছুনিয়ায় ! গবাক্ষ পন্ডিটস্ পিলাত-এর বিচাবসভাব ধূলিকণাও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না, অথচ টিকে থাকে ঐশ্বৰ্য্য নগ্নকায় মানুষটির বাণী ! হিটলাবেব বিপুল পান্ৎসাব বাহিনী ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়, অথচ ঝড়বজায় হারিয়ে যায় না অ্যানি ফ্রাঙ্কেব দিনলিপিৰ একটি পাতাও !

দ্বিতীয় গুহা-মন্দিবে উত্তর দিকেব প্রাচীবে দুটি বৃহদায়তন পানেনে দুটি জাতক-কাহিনী বিচিত্রিত । সে দুটি হচ্ছে পূর্ণ-অবদান জাতক (২।১৩) এবং বিধুব পণ্ডিতের কাহিনী (২।১৪) ।

পূর্ণ-অবদানের জাতক-বর্ণিত কাহিনীটি আগে বাল :

সূর্য্যাবক জনপদে একজন বণিকের পুত্র ছিলেন পূর্ণ . কিন্তু তিনি ছিলেন দাসীপুত্র । পিতাব দেহাবসানের পৰ পূর্ণ জানতে পাবলেন পিতা তাকে এব তাব জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভাবিলকে পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে গেছেন । এজন্য মহার্মা পূর্ণেব মনে

কোন ক্ষোভ নেই । অত্যাচারী ঠাকুরদেব প্রতি কোন ঈর্ষা বা বিদ্বেষ পূর্ণ অবদান জাতক ছিল না তার । তিনি নিজ চেষ্টায় বাণিজ্যে মনোনিবেশ কবলেন ।

পৰ পৰ ছয়বার তিনি সমুদ্রযাত্রা কবেন এব দেশ-বিদেশ থেকে বহু সম্পদ আহবণ কবে আনেন । ক্রমে পূর্ণ হয়ে পড়েন একজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ বণিক । ভগবাব বাণিজ্যে সফলকাম হওয়ায় পূর্ণ অবসর নিতে চাইলেন , কিন্তু ঠাকুরদেব একান্ত অন্তবোধে শেষ পর্যন্ত সপ্তমবার তিনি বাণিজ্যযাত্রা কবলেন ।

সেবার সমুদ্রযাত্রায় শ্রাবস্তীৰ বয়েকজন নাবিককে তিনি নিজ নৌকায় নিয়েছিলেন । পূর্ণ লক্ষ্য কবেন, প্রতিদিন এই নাবিকের দল একত্র হয়ে একটি অপূৰ্ব সঙ্গীত গায় । সে সঙ্গীতের প্রভাব সুদূৰপ্রসারী পূর্ণেব হৃদয়ে তা অননুভূত ভাবেব সঞ্চাব কবে—তাঁব মন-প্রাণ যেন ভবে যায় । শেষে একদিন তিনি নাবিকদের ডেকে জানতে চাইলেন—এই স্বর্গীয় সঙ্গীতটি তাবা কোথায় শিখেছে ।

উত্তবে বিনয়াবনত নাবিকবা বলে : প্রভু, এ কোন সঙ্গীত নয়—এ প্রার্থনা-গাথা । এ মন্ত্রধ্বনি । এ মন্ত্র আমবা শিখেছি এক মহাপুরুষেব কাছে ।

পূর্ণ প্রশ্ন কবেন : কে সেই মহাপুরুষ ?

—কে তা জানি না । শুনেছি তিনি ছিলেন রাজপুত্র । এখন সন্ন্যাসী ।

—কোথায় গেলে তাঁব দেখা পাওয়া যায় ?

—এখনও তিনি শ্রাবস্তীতেই আছেন ।

পূর্ণ মনে মনে ভাবে ইতিপূর্বে ছয়বার বাণিজ্যযাত্রায় সে প্রভূত ধনসম্পদ আহবণ

করে এনেছে; কিন্তু কই তাতে তো তার মনের তন্ত্রীতে এ ধরনের অমুরণন হয় নি। সে ভাবে এই অপূর্ব সঙ্গীত-গাথার যে মূল উৎস তার সঙ্গেই প্রথমে এক হাত বাণিজ্যের লেন-দেন করে নিলে কেমন হয়?

শ্রাবস্তীতে এসে পূর্ণ এক নূতন আলোকের সন্ধান পেল। পীতবসনধারী দেব-চূর্ণভকাস্তি দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসীকে ভিক্ষাপাত্র হাতে শ্রাবস্তীর রাজপথে ভিক্ষা করতে দেখে লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে। মহাভিক্ষু আশীর্বাদ করলেন ঐকে।

পূর্ণ শুনল, ইনি যুগাবতার --নাম গৌতম বুদ্ধ।

সংসারে আর মন নেই পূর্ণের। পার্থিব ধনসম্পদ সব তুচ্ছ হয়ে গেছে তার কাছে। সে য পরশমণির সন্ধান পেয়েছে -মণিকে শ্রাব মণি-জ্ঞান করে না। ওর দাদা ভাবিল এসে বলে—তোর কি হয়েছে বল তো?

পূর্ণ হেসে বলে -সে তুমি বুঝবে না দাদা। তবে আমার যা-কিছু বিষয়-সম্পদ আছে, তা দান করে আমি সজ্জ যোগদান করতে চাই।

: তোর এত এত বিষয়-সম্পত্তি সব দান করে যাবি?

: না ঠিক দান নয়, ভাবছি এ-সবের বিনিময়ে একটি চন্দনকাঠের চৈত্য-বিহার নির্মাণ করাব। তারপর তাঁকে নিয়ে আসব সেখানে।

ভাবিল ছোট ভাইয়ের হাত দুটি ধরে বলে--সন্ন্যাসীর চন্দনকাঠে কী প্রয়োজন ভাই? আমার দিকে চেয়ে দেখ বরং। পিতৃধনে বঞ্চিত হয়েছি—তুইও তাগ করে যাচ্ছিস্—

বাধা দিয়ে পূর্ণ বলে নাও দাদা, তুমিই নাও এ-সব। আমি বরং ভিক্ষা করেই আমার শেষ মনোবাসনা পূরণ করব -

ভাবিল মনে মনে হাসে। ভাবে, তাব ভাই পূর্ণের একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। জম্বুদ্বীপে তখন চন্দনকাঠের প্রচণ্ড অভাব, তাব বিক্রয়-মূল্য বর্ধিত হয়ে গেছে শতগুণ! ভিক্ষালব্ধ ধনে পূর্ণ সেই চন্দনকাঠের সজ্জারাম নির্মাণ করতে চায়! পাগল আর কাকে বলে!

পূর্ণের যা-কিছু সম্পদ তা গ্রহণ করে ভাবিল। বাণিজ্য-সস্তারে সপ্ত-মধুকর-ডিঙা সাজিয়ে প্রস্তুত হয় সমুদ্রযাত্রায়। মুণ্ডিতশীর্ষ পীতবসনধারী পূর্ণ অগ্রজকে প্রণাম করে বিদায় নেয়—সে যেতে চায় এক নির্জন দ্বীপে। সেখানে শ্রোণপরন্তক নামে নরমাংসভুক্ এক হিংস্র জাতির বাস। পূর্ণের অভিলাষ, সে ঐ হিংস্র জাতির মধ্যে প্রচার করবে অহিংসার বাণী, সৎ ধর্মের অনুশাসন!

ভাবিল বলে : ভাই, আর কি কোনদিন আমাদের দেখা হবে না?

পূর্ণ বলে : হবে না কেন? যেদিন প্রয়োজন বুঝবে আমাকে স্মরণ করবে! আমি আহ্বানমাত্র উপস্থিত হব তোমার কাছে।

ভাবিল আবার মনে মনে বলে : একেবারে বন্ধ উদ্ভাদ!

দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে থাকে ভাবিল। ক্রমশঃ তার সপ্তডিঙা পরিপূর্ণ হয়ে যায় মণি-মুক্তা, লাক্ষা ও গন্ধ দ্রব্যে। সমস্ত বাণিজ্য-সম্পদ নিয়ে সে অবশেষে আসে চন্দনদ্বীপে। ভাবিল জানে, এই চন্দনদ্বীপে বাস করে দুর্দান্ত যক্ষ মহেশ্বর—একখণ্ড চন্দনকাঠও সে দ্বীপের বাইরে যেতে দেয় না। তাই আজ জম্বুদ্বীপে চন্দনকাঠের এই কৃত্রিম অভাব। ভাবিল সংবাদ পেয়েছে, যক্ষ মহেশ্বর চন্দনদ্বীপে অনুপস্থিত। সেই সুযোগে সে সমস্ত বাণিজ্য-সম্ভারের বিনিময়ে তার সপ্তডিঙা পূর্ণ করে উৎকৃষ্ট চন্দনকাঠের সম্ভারে। মহেশ্বর দ্বীপে ফিরে আসার আগেই যাত্রা করে স্বদেশে।

দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রার পব নাবিকের দল খুশী হয়ে ওঠে। সপ্তডিঙার পালে যে লেগেছে ঘবে-ফেরার-হাওয়া।

বাণিজ্যতরী যখন দ্বীপ ছেড়ে মধ্যসমুদ্রে, তখন হঠাৎ ওঠে দুর্দান্ত সমুদ্র-ঝটিকা। প্রচণ্ডভাবে তুলতে থাকে সপ্তডিঙা।

প্রধান নাবিক ছুটে এসে বলে—প্রভু সর্বনাশ হয়েছে! যক্ষ মহেশ্বর সংবাদ পেয়ে গেছে! তাই আক্রোশে এ অকাল ঝটিকা।

দক্ষ নাবিকদের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও নৌকা রক্ষা করা যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঝড়ের বেগ যেন ক্রমবধমান, সমুদ্রের তলদেশ থেকে যেন কোন অদৃশ্য শক্তি বাণিজ্য তরীগুলিকে ক্রমাগত নীচের দিকে টানছে। নাবিকের দল ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ে।

নিকপায় ভাবিল তখন যুক্তকরে প্রার্থনা করতে থাকে, বলে—পূর্ণ, তুমি বলেছিলে আমার বিপদের সময় আমাকে রক্ষা করবে। আজ আমি একান্তমনে প্রার্থনা করছি। তুমি আমাকে বিপদমুক্ত কর, দুর্দান্ত যক্ষ মহেশ্বরকে বধ কবে ত্রাণ কব আমাকে!

কিন্তু সে প্রার্থনায় কোন ফল হয় না। নিমজ্জিত হতে থাকে বাণিজ্যতরী। ভাবিল পুনরায় বলে: হে পূর্ণ, আমি জানি তুমি মহাপুরুষের আশীর্বাদে অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী। তুমি এসে রক্ষা কর আমাদের। আমার সমস্ত জীবনের সঞ্চয় এভাবে ধ্বংস হতে দিও না!

কিন্তু তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না।

সহসা ভাবিলের মনে পড়ে যায় পূর্বকথা। বলে: হে পূর্ণ, তোমার অভিনাষ পরিপূরণ করব আমি। প্রতিশ্রুতি করছি, যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর, তবে এই সমুদয় চন্দনকাঠ দিয়ে আমি তথাগত বুদ্ধের জন্ম একটি অপরূপ সজ্জারাম নির্মাণ করে দেব!

আশ্চর্য! তবু কোন সাহায্য এসে পৌঁছায় না। তিল তিল করে নিমজ্জিত হতে থাকে বাণিজ্যতরী।

তখন চতুর্থবার চীৎকার করে ওঠে ভাবিল: নিষ্ঠুর! তোমার কি একটুও দয়া নেই? আমি কিছুই চাই না, শুধু আমার সহকর্মী নাবিকদের আশ্রয় করতে চাই। এতগুলি নিরপরাধ প্রাণীর কি সলিল-সমাধি হবে ভাই?

উচ্চারণমাত্র নৌকায় আবির্ভূত হন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গীতবসন, মুণ্ডিতশীর্ষ এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। ভাবিল সবিস্ময়ে দেখে, অলৌকিক ক্ষমতাবলে শূন্যপথে উড়ে



চিত্র --২৩

উপবে : (বামে ও মধ্যভাগে) পূর্ণ ও ভাবিল বুদ্ধদেবকে অর্ঘ্যদান করতে চলেছে ,

(সর্বদক্ষিণ) বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীতে ধর্মপ্রচারে বসত ।

নীচে : (সর্ববামে) পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করছে ,

(মধ্যভাগে) ভাবিলের বাণিজ্যতরী ,

(দক্ষিণে) আকাশপথে পূর্ণের আগমন ,

(সর্বনিম্নে) যক্ষ মহেশ্বরের অশুচর মৎস্যকল্যাণয় ।

অবস্থান—২।১৩

এসেছেন মহাভিক্ষু পূর্ণ। পূর্ণের আবির্ভাবমাত্র শান্ত হযে যায় সমুদ্র-ঝটিকা, পরাভূত যক্ষ সহ্য করতে পারে না সে সন্ন্যাসীর অমিত পুণ্যপ্রভাব। পলায়ন কবে সে।

আনন্দাশ্রু-বিগলিত ভাবিল আলিঙ্গন কবে পূর্ণকে। বলে : ভাই, এত বিলম্ব করলে কেন ? আমি যে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

পূর্ণ বলে : ভুল বলছ দাদা। আমি আহ্বানমাত্র এসেছি।

ভাবিল বলে : কী বলছ ভাই ! তোমাকে আমি চারবার ডেকেছি।

হেসে পূর্ণ বলে : না। একবার মাত্র! তুমি চারবার আমাকে স্মরণ করেছ বটে, কিন্তু ভেবে দেখ কেন ডেকেছিলে। প্রথমবার তুমি ডেকেছিলে যক্ষ মহেশ্বরকে বধ করবার জন্তু; কিন্তু দাদা, হননেচ্ছা তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র হতে পারে না। দ্বিতীয়বার ডেকেছিলে তোমার সমস্ত জীবনের সম্পদ রক্ষার জন্তু; কিন্তু পার্থিব ধন-সম্পত্তি রক্ষা তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র হতে পারে না। তৃতীয়বার ডেকে বলেছিলে এ উপকারের বিনিময়ে তুমি আমাকে প্রতিদান দিতে চাও; কিন্তু দান-প্রতিদানের নিরিখে তো কোন প্রার্থনা-মন্ত্র রচিত হতে পারে না। ভেবে দেখ, শেষবার তুমি আমাকে ডেকেছিলে জীব দয়া প্রদর্শনের জন্তু; অহিংসার মন্ত্রে সে প্রার্থনা-ধ্বনি অন্তর স্পর্শ করেছে আমার। আমি আহ্বানমাত্র ছুটে এসেছি তোমার পাশে।

ভাবিল ভাইকে আলিঙ্গন কবে বলে—আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি ভাই! কিন্তু আর ভুল করব না। আমিও যোগ দেব ঐ ব্রতে। শরণ নেব বুদ্ধের, ধর্মের এবং সজ্জ্বের।

পূর্ণ বলে—আর তোমার এই চন্দনকাঠের বিপুল সস্তার?

: ও দিয়ে নির্মাণ করব আমরা দুই ভাইয়ে মিলে এক অপরূপ সজ্জারাম। না না, কোন প্রতিদান চাই না আমি। আমি চাই, এই চন্দনকাঠ ধ্বংস হোক সেই তথাগত বুদ্ধের সেবায়।

দুই ভাইয়ে মিলে অবশেষে রচনা করে একটি অপূর্ব চন্দন চৈত্য-বিহার।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে তথাগত বুদ্ধ স্বয়ং এসেছিলেন সেই অপরূপ সজ্জারামে।

জাতকানুসারে মূল কাহিনী এইটুকুই। দ্বিতীয় গুহা-মন্দিরের প্রাচীরে (২।১৩) অজ্ঞতার শিল্পী এই কাহিনীটি অবলম্বন করে যে প্রাচীর-চিত্র ঝুঁকেছেন, এবার তার কথা বলি। কথা-সাহিত্যের খাতিরে মূল কাহিনীকে কিছুটা ঢেলে সাজিয়েছি আমি—ইচ্ছামত সংলাপ সংযোজন করেছি, যেমন—জাতকের মূল কাহিনীতে ভাবিল চারবার প্রার্থনা করেছিল এমন কোন উল্লেখ নেই; সেটি আমার কল্পনা। অজ্ঞতার শিল্পীও শিল্পের খাতিরে কাহিনীকে নিজ ইচ্ছানুসারে সাজিয়েছেন (চিত্র—২৩)।

প্যানেলের নীচে বামদিকে দেখছি, শ্রাবস্তীনগরে এসেছেন পূর্ণ (২।১৩ ক)। তথাগত বুদ্ধের সম্মুখে তিনি প্রণামরত! পীতবসন সন্ন্যাসী একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পূর্ণের মস্তকের উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে। ছুটি আলেখ্যেই মস্তকের অংশ নষ্ট হয়ে গেছে।

তার দক্ষিণে দেখছি, সমুদ্রের মাঝখানে ভাবিলের বাণিজ্যতরী (২।১৩ খ)। চৈনিক শিল্প-পদ্ধতি জল ঝাঁকা হয়েছে। নৌকার উপর পাল তোলা; তাতে তিনটি দাঁড়। নৌকার গলুইয়ে বারোটি জলপূর্ণ পাত্র—অর্থাৎ এ সমুদ্রযাত্রা; পানীয় জল তাই সুরক্ষিত। নৌকা চন্দনকাঠে বোঝাই। তলদেশে জলজন্তুরা আক্রমণ করেছে। ছুটি উৎকৃষ্টবাহু মৎস্যকণ্ঠা—সম্ভবত যক্ষ মহেশ্বরের অনুচর। এদের উদ্ভাসিত মনুষ্যাকৃতি,

নিয়াজ মীন। এ দুজনের উৎকৃষ্ট বাহু দুটিও ভঙ্গিমা লক্ষণীয়—সে বাহুর বেথায় সমুদ্র-তরঙ্গের লীলায়িত ছন্দ। নৌকাটি মকবমুখী মধুডিঙা। দেখতে পাচ্ছি নৌকায় উপর যুক্তকবে ভাবিল প্রার্থনা করছে। তার চোখে আর্তি। আরও দেখতে পাচ্ছি শূন্যপথে উড়ে আসছেন একজন দেবদূত—ভাবিলেব রক্ষাকর্তা। দেবদূতের উপর আকাশপথে নেমে আসছেন অলৌকিক ক্ষমতাব অধিকারী মহাভিক্ষু পূর্ণ। এই আলোখ্যাটিতেও পূর্ণের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে (২।১৩ গ)।

এই সমুদ্রযাত্রা দৃশ্যটির উপরে এক বিস্তারিত প্যানেল। সেটি পববর্তী ঘটনাব জ্যোতক উদ্ধারপ্রাপ্ত ভাবিল পূর্ণকে নিয়ে শ্রাবস্তীনগরে এসেছে তথাগত বুদ্ধকে অর্ঘ্যদান করতে। বামদিকে একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে দুটি বমণী, তৃতীয় একটি কামিনী সোপানের নিকটবর্তী। তার হাতে অর্ঘ্য-খালিকা, তার চাহনি বঙ্কিম চটুল। পাঁচটি সোপান অতিক্রম কবে আসতে হবে সভামণ্ডপে। এই সোপানের উপর আরও একটি মেঘে। পিছন ফিরে সে কিছু দেখছে। মণ্ডপের মাঝামাঝি পূর্ণ ও ভাবিল। ভাবিল তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে—এ অপরিচিত স্থানে কিভাবে সহবত বন্ধা করতে হয় তা ভাইয়ের কাছ থেকে সে জেনে নিতে চায়। পূর্ণের আকৃতি কিছু বড়। এই প্যানেলে পূর্ণের আলোখ্যাই মূল আকর্ষণ। অজন্তাব শিল্পী অনেক স্থলে প্রতিভা ও মহানুভবতা আবোপ কবতে বিশেষ কোন মূর্তিকে পার্শ্ববর্তী মূর্তিগুলির তুলনায় বড় করে ঐকেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রথম গুহায় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির মূর্তি, কিংবা সপ্তদশ মন্দিরের বিখ্যাত ‘গোপা ও রাজল’ চিত্রে বুদ্ধদেব (চিত্র—৬৭)। কিন্তু এ কোন স্বতঃসিদ্ধ ব্যবস্থা নয়। কারণ অজন্তাব শিল্পী জানেন, ত্রি-মাসিক বাস্তব দৃশ্যকে দ্বি-মাত্রিক আলোখ্যে রূপায়িত করার মূল সূত্র হচ্ছে কাছের জিনিস বড় দেখাবে, দূরের জিনিস ছোট। তাই এই চিত্রের সর্বদক্ষিণে যখন তিনি তথাগত বুদ্ধকে ঐকেছেন, তখন তাঁকে আকাংক্ষা বৃহৎ কবেন নি। প্রতিভা ও মহানুভবতায় বুদ্ধদেব পূর্ণের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু যেহেতু তিনি দূরে আছেন তাই তাঁকে বৃহদায়তন করে আঁকা সম্ভব হয় নি। বিকল্প ব্যবস্থায় শিল্পী সেখানে আলোকপাতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। বুদ্ধমূর্তিটি তাই সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। উজ্জ্বলতা যেন আয়তনের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বাস্তবে বড় চিত্রটি দেখলে, এ সত্য অনুধাবন কবতে পাববেন।

মণ্ডপের যেখানে ভাবিল ও পূর্ণকে আঁকা হয়েছে সেখানে দেখছি, ওদের দুজনকে ঘিরে চারজন দাসী চলেছে অর্ঘ্য-খালিকা বহন করে। পিছনে একটি নহবৎখানা। তাতে তিন কক্ক—তিন কক্ক তিন বমণীমূর্তি। একজন বাজাচ্ছে খঞ্জনি, একজন মাদল, তৃতীয় জন কি বাজাচ্ছে তা জানবার উপায় নেই। সে চিত্রটি অক্ষত নেই। নহবৎখানার পাশে দেখছি আর একটি প্রবেশদ্বার। সেখানে পুনরায় দুটি নাবীমূর্তি। একজন স্মৃজিতা, মনে হয় সম্ভ্রান্ত ঘবের মহিলা, সঙ্গে তাঁর সহচরী। এঁরাও পূজা নিবেদন করতে আসছেন।

সর্বদক্ষিণে একটি গর্ভগৃহে বুদ্ধদেব ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন সর্বসমেত নয়জন ভক্ত। সাতজন পুরুষ, দুটি রমণী। জ্বীলোক ছজন বসেছেন শালীনতা রক্ষা করে কিছু তফাতে।

তার পরের চিত্রে দেখছি (চিত্র—২৩-এর অন্তর্ভুক্ত নয়) চন্দন-বিহারে বুদ্ধদেব আসছেন। তিনি আসছেন শূন্যপথে দুই শিষ্যসমেত। দেখছি একটি ধাতব পাত্র নিয়ে পূর্ণ এসেছে তাঁর চরণ ধৌত করতে। পূর্ণের পশ্চাতে চারজন পুরকামিনী। পশ্চাৎপটে দেখতে পাচ্ছি চন্দন-বিহার।

অজন্মার শিল্পী চিত্র-কাহিনীর যবনিকা টেনেছেন পূর্ণের অভিলাষ পূরণে। চন্দন-বিহারে বুদ্ধদেবের আগমনে।

পূর্ণ-অবদানের উপবে আঁকা আছে এক বিস্তারিত কাহিনী-চিত্র। পুণ্যক ও ইরান্দাতীর উপাখ্যান। এটি বস্তুত বিধুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী (২।১৪)।

পাতালপুরীর অতল গভীরে বাসুকি-পরিশাসিত নাগলোকে রাজকণ্ঠা ইরান্দাতীর মনে নেমেছে শ্রাবণ রাত্রির ঘনাক্ষায়া। নাগরাজ্যে বিলাস-ব্যসন, আমোদ-প্রমোদের কোন বিরাম নেই। রাজপ্রাসাদের রত্নমণিদীপিত নৃত্যসভা, রাজোদ্যান-সংলগ্ন ফটিক-

স্বচ্ছ পদ্মশোভিত সরোবর, মুক্তাখচিত স্বর্ণখট্টোঙ্গে আল্পেষশয্যা, বিধুর পণ্ডিত জাতক রাজকুমারীর বিলাসের উপকরণের অভাব নেই কোন। তবু এ

প্রাচুর্যের মধ্যেও রাজকণ্ঠার মনে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। মর্ত্যলোকের এক নির্বাসিতা মানুষীকে পৌঁছে দিয়ে গেছে কণ্ঠকী রাজকণ্ঠার কাছে,—সে বর্তমানে তাঁর পরিচাবিকা প্রিয় সখী মাতলী। রাজনন্দিনীর চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে সে তাঁকে গুনিয়েছে পৃথিবীর কাহিনী। আর তাই গুনে মনোবিকাব হয়েছে বাসুকি-তনয়া ইরান্দাতীর।

স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ গুরু-সারীকে দেখেন আর তাঁর মনে পড়ে যায় মাতলীর বর্ণনা—মুক্ত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের সম্ভরণের কথা।

নাগকণ্ঠা প্রশ্ন করেন—মুক্ত নীলাকাশ কাকে বলে মালতী?

নির্বাসিতা মানুষী হেসে বলে—কেমন করে তোমাকে বোঝাব রাজকণ্ঠা? মনে কর, এই পাতালপুরীর সুবর্ণ-চন্দ্রাতপ নেই—সেখানে কেবল দূর—শুধুই দূর—সীমাহীন ব্যাপ্তি!

রাজকণ্ঠা অবাক হয়ে বলেন—তা কি কখনও হয়?

মাতলী বলে—হয় বইকি নাগকণ্ঠা, আর সেই নীলাকাশে অন্ধকারেব যবনিকা সরিয়ে ধরণীর বুকে যখন উঠে আসেন সূর্যদেব, তখন বালার্করক্টিমরাগে লজ্জাকরণ হয়ে ওঠে পার্থিব প্রভাত! আবার মধ্যাহ্ন-ভাস্করের উজ্জল আলোকে পৃথিবী যখন সাজে, তখন তার দিকে তাকানো যায় না। মণিদীপ্ত নাগলোকেব কৃত্রিম আলোকের সঙ্গে সে উজ্জলতার তুলনাই হয় না। আবার দিনান্তে অস্তসূর্য-উদ্ভাসিত সান্ধা মুহূর্তের যে সুষমা, তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি—না রাজকণ্ঠা, এ নাগলোকের স্বর্ণপুরীতে তেমন কিছু আজও দেখি নি।

নাগরাজ-হুহিতার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তিনি জানেন মুক্ত পৃথিবীতে কোনদিনই পদার্পণ করতে পারবেন না তিনি। নাগকণ্ঠার অধিকার নেই এই পাতালপুরীর বাহিরে যাবার। এ অভ্যস্ত নাগলোকের গভীরে জন্মলাভ করেছেন একদিন, এখানেই শেষ-নিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে আর একদিন। সে-কথা স্মরণ করে ম্লান হয়ে যান রাজকণ্ঠা।

মাতলী বলে, তুমি যে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলার মত প্রতিদিন ক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছ রাজনন্দিনী !

বিস্মিতা ইরান্দাতী বলে : কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রকলা কাকে বলে সখী ?

মাতলী হাসে, বলে, তাও জান না নাগকণ্ঠা ? উপরের পৃথিবীতে পূর্ণচন্দ্র যে প্রতিদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে, ক্ষয়িত হতে থাকে তার আকার ও জ্যোতি।

ভীতা রাজকণ্ঠা বলে, কী সর্বনাশ, এভাবে যে শেষ হয়ে যাবে সে একদিন !

—তাই তো যায়, অমাবস্তায় সম্পূর্ণ অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যায় সে।

—তারপর ?

—তারপর আবার শুক্লপক্ষে তিল তিল করে সে বাড়তে থাকে। দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে এগিয়ে যায় পূর্ণিমা রাত্রির সার্থকতার দিকে।

করতালি দিয়ে হেসে ওঠেন কিশোরী নাগকণ্ঠা, বলে—কী মজা ! ওখানকার রাত্রিগুলো তাহলে এ কৃত্রিম আলোয় উদ্ভাসিত নাগরাজ্যের রাত্রির মতো স্থির-জ্যোতি নয় ?

—মোটাই নয়। পৃথিবীতে হাসির পাশেই আছে অশ্রু, আনন্দের পাশেই বেদনা। আলো আর অন্ধকার, অমাবস্তা ও পূর্ণিমা সেখানে মিতালি পাতায়। তোমাদের এ নাগলোকের মত শুধু হাসি, শুধু আমোদ, আর শুধু আলো দিয়ে ঠাসা নয়।

ইরান্দাতী বলে, আমি চাই না এ নাগলোকেব নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ! আমিও কাঁদতে চাই।

মাতলী শিহরিত হয়, বলে—চুপ চুপ। এ-কথা মহারাজের কর্ণগোচর হলেই সর্বনাশ !

কিন্তু অশ্রুর ধর্মই হচ্ছে সে যখন আসে আষাঢ় সঘন ঈর্ষ্যরাত্রির মত সমস্ত আকাশ আবৃত করে আসে। মহারানীর মহলে ঠিক ঐ কথাই বলছিলেন বামুকি-মহিষী বিমলা তাঁর প্রিয়সখীকে। বলছিলেন,—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে, অথচ এদেশে যে কাঁদবারও আইন নেই।

প্রিয়সখী প্রত্যুত্তর করে না। সে জানে মহারানীর অপূরণীয় মনোবাসনার কথাটি। জানে, কেন অভিমান-ক্ষুধা মহারানী অন্নজল ত্যাগ করেছেন। সে আর এক কাহিনী !

নাগরাজ বামুকি গিয়েছিলেন মর্ত্যলোকে কুরুনৃপতির আমন্ত্রণে, তাঁর রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থে এক ধর্ম মহাসভায়। কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জ্ঞাননিধুতকল্য মহাপণ্ডিত বিধুর। বস্তুত তিনি ছিলেন স্বয়ং বোধিসত্ত্ব। কুরুরাজকে তিনি শুধু ঐহিক পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হতেন না—প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি মহারাজকে শোনাতেন সৎ ধর্মের

মর্মকথা। তিনি ছিলেন সমস্ত আখ্যাতের সর্বজন-নমস্কার পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ মহামতি। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপণ্ডিতের সুখ্যাতি ছিল সমস্ত জম্বুদ্বীপে সুবিদিত—ভূ-ভারতের দূরতম প্রান্ত থেকে প্রতিদিন দলে দলে মুমুক্শু যাত্রীর দল সমবেত হত ইন্দ্রপ্রস্থে—বিধুর পণ্ডিতের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ধর্মকথা শুনতে। গিয়েছিলেন নাগরাজ বাসুকিও, মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর ধর্ম-ব্যাখ্যায়। এতদূর অভিভূত হয়েছিলেন যে, নিজ কণ্ঠের ইন্দ্রনীল মণিহার খুলে জড়িয়ে দিয়েছিলেন বিধুর পণ্ডিতের উষ্ণীষে।

নাগপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করে মহারানী বিমলার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন বিধুর পণ্ডিতের কথা। ভুল করেছিলেন সেখানেই। সব কথা শুনে মহারানী আবদার করেন—তিনি স্বকর্ণে বিধুর পণ্ডিতের শ্রীমুখ-নিঃসৃত ধর্মের মর্মকথা শুনতে চান। মহারাজ কত বুঝিয়েছেন, সে অসম্ভব। নাগকন্যা হিসাবে বিমলার পক্ষে নাগলোকের বাহিরে পদার্পণ করা সম্ভবপর নয়, ওদিকে ইন্দ্রপ্রস্থরাজ নিশ্চয় সম্মত হবেন না একটি দিবসের জন্তও মহামতি বিধুর পণ্ডিতকে চক্ষুর আড়াল করতে।

শুনে প্রমোদকক্ষ ত্যাগ করে উঠে যান বানী। শয়নকক্ষের অর্গলবদ্ধ একান্তে সহচরীকে ডেকে বলেন—আজ আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

প্রাসাদ-কাননের এক নিভৃত প্রান্তে সপ্তপর্ণীর শাখায় রাজকুমারী ইবান্দাতীর একটি প্রিয় প্রেঙ্কা প্রলম্বিত ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রাজনন্দিনী এই দোলনায় এসে বসে, কাটিয়ে যায় নিঃসঙ্গ কয়েকটি সাক্ষ্য মুহূর্ত। সেদিনও গোখুলি লগ্নে যথারীতি উদ্ভানের এই নির্জন প্রান্তে এসে প্রেঙ্কার উপর বসেছে রাজপুত্রী। কর্ণে নবকর্ণিকার, নয়নে কৃষ্ণকজ্জলী, কালাগুরু-ধূপিত অলকগুচ্ছে বনকুমুমের মালিকা—প্রসাধনদক্ষা মাতলীর রূপসজ্জায় ত্রুটি নেই, রাজকন্যা ইবান্দাতী উদ্যানভূমিকে আলোকিত করে প্রেঙ্কায় দোলায়িত করছিল নিজ অনিন্দ্য কল্পতরুটি।

শুধু দেহে নয়, গুর অন্তরেও যে আজ দোলা লেগেছে। সরোবর-নীরে মৃদুস্পন্দিত যৌবনভারনম্র নিজ দেহের প্রতিবিম্বটি দেখে আজ হঠাৎ এক বেদনা অনুভব করেছে রাজকন্যা। জীবনে এই প্রথম এভাবে ভাবতে শুরু করেছে সে। মাতলী বলে—ঐ উর্ধ্বলোকের পৃথিবীতে হাসি অশ্রুর সন্ধানে ছোট্টে, আনন্দ বেদনার অন্বেষণে ফেরে, আলোক অন্ধকারের অভিসারে ধাবমান। অভাব ভিন্ন পূর্ণতার উপলব্ধি নেই! কিন্তু কেন? শুধু হাসি, শুধু আনন্দ, শুধু আলোক কেন একাই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না? দোসর ছাড়া কি ছুনিয়ায় কেউ তৃপ্ত নয়? আর সে দোসর কি হতে হবে বিপরীতধর্মী? হাসি যেমন আলোককে পেয়ে পূর্ণ হয় না, সে অশ্রুকে খোঁজে—আলোক যেমন হাসির মিতালিতে তৃপ্ত হয় না, সে অন্ধকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে মরে। আজ কি রাজকন্যা নিজেও তেমনি কোন দোসর খুঁজছেন? সরোবর-সলিলে তাঁর বিকচযৌবন প্রতিবিম্ব কি সে কথাই তাঁর কানে কানে বলে গেল? এমন একজন দোসর, যে গুরু শত সহচরীর মত সমধর্মী নয়, অন্য কিছু? বিপরীতধর্মী? কিন্তু কী তা?

বনপ্রান্তরের দিকে কজ্জললাঙ্ঘিত ছুটি নয়ন তুলে রাজনন্দিনী সহসা প্রত্যক্ষ করেন তাঁর মনোগত প্রশ্নের মূর্তিমান উত্তর। স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। নবোদিত প্রভাতসূর্যের মত দীপ্তিমান এক তরুণকান্তি প্রিয়দর্শন যুবাপুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন নিঃশব্দে। তরুণীধিকার অন্তরালে অনিমেষ লোচনে তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছেন।

ধীরপদে প্রেঙ্খা থেকে নেমে এসে দাঁড়ায় ইরান্দাতী।

মস্থর চরণে তরুণীধি থেকে এগিয়ে আসে তরুণ, বলে—আমি যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক। এ পথে আমার এই পক্ষিরাজ অশ্বের পিঠে যাচ্ছিলাম মর্ত্যলোকে, তোমাকে দোল খেতে দেখে নেমে এলাম।

রাজনন্দিনী সভয়ে ধীরে ধীরে বলে—কেন, দোল খাওয়া কি দোষের ?

অনাজ্ঞাতার এ সরল প্রশ্নে হেসে ওঠে পুণ্যক। রাজকন্যা আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

পুণ্যক বলে—নিশ্চয় দোষের। দোল খাওয়া নয়, একা একা দোল খাওয়া। দেখ না, কুমুদিনী দোলায়িত হয় যখন আকাশে ওঠে পূর্ণচন্দ্র, পঙ্কজকানন আনন্দের হিন্দোলে মাতে যখন দিনকর উদিত হন পূর্ব গগনে ?

সরলা বালিকা এর নিগূঢ় অর্থ উপলব্ধি করতে পারে না ; বলে—কেমন করে জানব ? চন্দ্র-সূর্য তো এদেশে নেই। এ যে পাতালপুরী !

পুণ্যক বলে, দেখতে চাও পৃথিবীকে, চন্দ্রসূর্য-উদ্ভাসিত দেশকে ?

সাগ্রহে ইরান্দাতী বলে—নিয়ে যাবে আমাকে তোমার পক্ষিরাজে ?

পুণ্যক বলে—যাব, কিন্তু তোমার পিতার অনুমতি ভিন্ন তুমি তো যেতে পারবে না !

ইরান্দাতী বলে—কেন ?

—তোমার গাত্র স্পর্শ করি কোন্ অধিকারে ?

—কেন স্পর্শ করলে কি হয় ?

পুণ্যক বুঝতে পারে এ সরলা বালিকা কিছুই জানে না, বলে—কিন্তু পৃথিবীকে দেখবার জন্ত এত আগ্রহ কেন তোমার ?

রাজকন্যা অবাক হয়ে বলে—আগ্রহ হবে না ? সে যে একেবারে অজানা নূতন দেশ ?

—কিন্তু আরও একটি অজানা মহাদেশ যে তোমার মধ্যেই লুকিয়ে আছে, তার সংবাদ কি তুমি পেয়েছ পাতালপুরীর নাগকন্যা ? এ নাগলোকের রাজ্যসীমা অতিক্রম করার জন্ত তুমি উদ্গ্রীব, কিন্তু সন্ধান রাখ কি কৈশোরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে যৌবরাজ্যে পদার্পণের শুভলগ্ন আজ এসেছে তোমার ?

সরলমতি অনভিজ্ঞা কুমারী কন্যা ও প্রশ্নের অর্থ গ্রহণ করতে পারে না। মৃগনয়ন ছুটি পুণ্যকের মুখে সংস্থাপিত করে অক্ষুটে বলে, তোমার এ কথার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না যক্ষ সেনাপতি।

আর আত্ম-সংবরণ করতে পারে না পুণ্যক। দুই আজানুলব্ধিত বাহুতে বন্দী করে কলে উত্তিরযৌবনা। শূতনুকা ইরান্দাতীর কল্পতরু। ওর কম্পমান বিহ্বল বিষাদে এঁকে দেয় তার একান্ত প্রণয়ের রক্তিম স্বাক্ষর।

শিহরিততনু ইরান্দাতী তার পদ্যকোরকতুল্য দুটি হাতে আবৃত করে লজ্জাকণ মুখপঙ্কজ। সে বুঝতে পেরেছে সেই উদ্ভ্রান্ত গোধূলিলয়ে কিসের তৃণায় উন্মনা হয়ে ছিল এতক্ষণ। কৈশোরের সিংহদ্বার অতিক্রম করে সে দেখতে পেয়েছে যৌবরাজ্য-সীমায় নূতন মহাদেশ। ক্রতপদে অশ্রুহিতা হয় সচকিতা রাজনন্দিনী—রাজোচ্ছানের পাষণ-বেদীতে প্রতিহত হয়ে ফেরে পলায়নপরার নূপুর নিকণ।

নাগরাজ বাসুকি বিনিদ্রনয়নে ত্রিযামা রাগি একা বসে থাকেন। অভিমান-ক্ষুদ্রা মহারানী বিমলা বাক্যলাপ বন্ধ করেছেন—অন্যদিকে আরও গুরুতর বিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে নাগরাজ্যে। অমিতবিক্রম যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক এসে নাগরাজ বাসুকির কাছে প্রস্তাব করেছে, সে রাজকন্যা ইরান্দাতীর পার্ণপ্রার্থী। নাগরাজ স্থিরনিশ্চয় জানেন, এ বিবাহ অসম্ভব। নাগকন্যার সঙ্গে নাগরাজপুত্রের বিবাহই বিধেয়। যক্ষের পক্ষে নাগ-কন্যা লাভ কিছুতেই সামাজিক অনুমোদন পাবে না। নাগপণ্ডিতরা মেনে নেবেন না এই অসবর্ণ বিবাহকে।

সমস্যা সমাধানের কোন সূত্রই যখন দেখতে পাচ্ছেন না মহারাজ, তখন তাঁর একান্ত-সচীব ওঁর কানে কানে বলে—আমার পরামর্শ শুমন মহারাজ। আমি আপনার সমস্যার সমাধান করে দেব। আপনি যক্ষ সেনাপতিকে বন—কন্যা সম্প্রদানে আপনি সম্মত, কিন্তু তাকে উপযুক্ত কন্যাপণ দিতে হবে।

—কি সে কন্যাপণ?

—ইন্দ্রপ্রস্থরাজের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে বিধির পণ্ডিতের হৃৎপিণ্ডটিকে।

—তাতে কি লাভ?

—যক্ষ সেনাপতিকে যদি আপনি প্রত্যাখ্যান করেন, তবে নাগ ও যক্ষে সংগ্রাম অনিবার্য হয়ে পড়বে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় যক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ বেধে যাবে কুরুরাজের। তৃতীয় পক্ষ নাগলোক থাকবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে।

—কিন্তু সেক্ষেত্রে জীবিত বিধুর পণ্ডিতকেই অপহরণ করে আনতে বালি না কেন? তাঁর হৃৎপিণ্ডের কথা উঠছে কি কারণে?

মন্ত্রী হেসে বলে—এ কূট রাজনীতি মহারাজ। যক্ষ সেনাপতির পক্ষে জীবিত বিধুর পণ্ডিতকে নাগলোকে আনয়ন অসম্ভব নাও হতে পারে। যক্ষ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে অনিচ্ছুক কুরুরাজ কিছুদিনের জন্য বিধুরকে এ নাগলোকে পাঠাতে সম্মত হলেও হতে পারেন। কিন্তু যক্ষ যখন বিধুরের হৃৎপিণ্ডটি প্রার্থনা করবে, তখন যুদ্ধ হয়ে পড়বে অনিবার্য।

• নাগরাজ বলেন—ধন্য তোমার কূটবুদ্ধি নাগমন্ত্রী।

মন্ত্রী হুঃখ প্রকাশ করে বলেন—তবু তো মহারানী এখনও আমাকে সেই প্রাকৃত নামেই সম্বোধন করে থাকেন।

হাস্ত সংবরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে নাগরাজের পক্ষে। তিনি জানেন, তাঁর এই কুটিল মন্ত্রীটি বিধুর পণ্ডিতকে ঈর্ষা করে, আর তাই মহারানী বিধুর পণ্ডিতের অনুকরণে এই পণ্ডিতস্বয়ং কুচক্রী নাগমন্ত্রীর নামকরণ করেছেন—বাহুড় পণ্ডিত।

যক্ষ সেনাপতি প্রতিশ্রুত হল এ কণ্ঠাপণ প্রদানে। শ্বেত পক্ষিরাজে আরোহণ করে সে খাত্তা করে ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্দেশ্যে। ঈর্ষাকাতর নাগমন্ত্রীর উল্লাস আর ধরে না। এইবার বিধুর পণ্ডিত কেমন করে আত্ম-রক্ষা করে সে দেখবে একবার।

কিন্তু বাহুড় পণ্ডিতের আশা ফলবতী হল না মোটেই। পুণ্যক জানে, কুরুরাজ অক্ষত্রীড়ায় অত্যন্ত আসক্ত। সে একটি মহামূল্য ইন্দ্রকান্তমণি সংগ্রহ করে উপস্থিত হল কুরুরাজসভায়। এই অমূল্য মণিখণ্ডটিকে পণ রেখে সে কুরুরাজকে অক্ষত্রীড়ায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। একে অক্ষত্রীড়ায় আসক্তি, তত্পরি ইন্দ্রকান্তমণির লোভ। ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি সন্মত হলেন; কিন্তু তিনি কী পণ রাখবেন? পুণ্যক বলে, এই মহামূল্যমণির একমাত্র উপমান হতে পারেন বিধুর পণ্ডিত। কুরুরাজ বলেন, তথাস্তু।

অক্ষত্রীড়ায় পরাজিত হলেন কুরুরাজ। নিকপায় হয়ে তাঁকে বিদায় দিতে হল বিধুর পণ্ডিতকে। শোভাযাত্রা করে রাজ্যসীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল গুণমুগ্ধ কুরু-দেববাসী। সেখানে পুণ্যক বিধুর পণ্ডিতকে তুলে নিল অশ্বপৃষ্ঠে। আকাশে উঠল পক্ষিরাজ, কিন্তু অনতিবিলম্বে এক নির্জন প্রান্তরে পুণ্যক অশ্বের গতিবেগ সংবরণ করে। বিধুর পণ্ডিত বলেন, আমরা কি নাগরাজের সীমানা উপনীত হয়েছি যক্ষ সেনাপতি?

পুণ্যক বলে, না, কিন্তু আপনি আপনার জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন পণ্ডিতপ্রবর। নাগরাজ বাসুকির কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আপনার হৃৎপিণ্ডটি উৎপাটিত করে নিয়ে গেলে তবে তিনি তাঁর কণ্ঠাকে সমর্পণ করবেন আমার হাতে।

তরবারি নিক্ষেপিত করে পুণ্যক বলে—মৃত্যুর জগৎ প্রস্তুত হন মহামন্ত্রী।

মহামন্ত্রী হেসে বলেন, জীবনে ঐ একটি জিনিসের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই পুণ্যক। প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত সকলের কাছে মৃত্যু একই বেশে আসে।

পুণ্যক বলে, এভাবে আপনাকে হত্যা করছি বলে আপনি কি আমাকে অভিশাপ দেবেন?

বিধুর হেসে বলেনঃ অভিশাপ কেন দেব পুণ্যক? আমার হৃৎপিণ্ডে যদি ছুটি তরুণ-তরুণীর মিলনের অন্তরায় ঘুচে যায়, তাহলে আমার প্রাণদান তো সাংখ্যক।

পুণ্যক অবাক হয়ে যায়। এ ধরনের কথা তো সে কখনও শোনে নি। তরবারি উত্তোলন করতে যায়, পারে না। মনের মধ্যে দ্বিধা এসেছে তার।

বিধুর বলেন, তরবারি আমার হস্তে অর্পণ কর যক্ষ সেনাপতি। আমি স্বহস্তে আমার হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত করে দিচ্ছি। তাহলে নরহত্যার পাপ তোমার লাগবে না।

একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে পুণ্যক। বলে—কিন্তু তার পূর্বে আমার একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন? জম্বুদ্বীপে আপনিই সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত। যত্নের পূর্বে আমার এক প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়ে যান আপনি।

—কি তোমার প্রশ্ন? বল।

—নাগকন্যা ইরান্দাতীকে আমি হৃদয় সমর্পণ করেছি, কিন্তু আমি যক্ষ—নাগ নই। এ অসবর্ণ বিবাহ কি অনুমোদনযোগ্য?

বিধুর হেসে বলেন : এ প্রশ্নের জবাব তো এককথায় হবে না। তোমার যে প্রিয়া-মিলনে বিলম্ব হয়ে যাবে যক্ষপ্রবর!

পুণ্যক বসে পড়ে ভূ-শয্যায়, বলে, হোক বিলম্ব, আপনি বলুন।

বিধুর পণ্ডিত তখন বলতে থাকেন তাঁর কথা।

অসম্ভবকেই সম্ভব করেছে যক্ষ সেনাপতি। নাগরাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছে বিশ্ব-বিশ্রুত বিধুর পণ্ডিতকে। সংবাদ পেয়ে নাগলোকের যাবতীয় নরনারী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে সমবেত।

বিধুর পণ্ডিতের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন নাগরাজ।

সহসা বাছড় পণ্ডিত বলে ওঠে, কিন্তু এমন কথা তো ছিল না যক্ষ সেনাপতি। আপনি বিধুর পণ্ডিতকে সশরীরে এখানে এনেছেন কেন? শর্ত ছিল—

কিন্তু তার বাক্য সম্পূর্ণ হয় না। ততক্ষণে রাজ্যান্তঃপুর থেকে এসে পৌঁচেছেন রাজমহিষী বিমলা, সম্মানিত মহান অতিথির জন্তু স্বহস্তে পাচ-অর্ঘ্য নিয়ে। তাঁর পশ্চাতে সলজ্জচরণে এসে দাঁড়িয়েছে চত্রাপিতবৎ রাজকন্যা ইরান্দাতী। মুগ্ধনয়নে পুণ্যক তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নাগরাজার কানে কানে মহারানী বলেন : বাছড় পণ্ডিত এখানে কেন?

সে অন্তর্য্য কণ্ঠে শ্রবণগোচর হয় লক্ষকর্ণ বাছড় পণ্ডিতের। স্থানতাগ করে সে অধোবদনে।

রাজা ও রানী মহান অতিথিকে নিয়ে বাস্তু। রাজপ্রাসাদের প্রহরীর দল ক্রমাগত ছুটাছুটি করছে। এমন সুযোগ হারাতে রাজ্ঞী নয় পুণ্যক। সে গোপনে প্রবেশ করে অন্তঃপুরে। রাজকন্যার নিভৃত শয়ন-কক্ষে এসে দাঁড়ায়।

সচকিতা রাজকন্যা শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়। পুণ্যকের সন্নিকটে এসে বলে : কেমন করে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন আপনি?

পুণ্যক বলে, প্রেমের মন্ত্রে তুমি যে আমাকে অজেয় করে দিয়েছ বাম্বুকি-তনয়া।

তবু উৎফুল্ল হতে পারে না ইরান্দাতী। আতপ-তাপিত কুমুদিনীর মত স্নানমুখী কিশোরী বলে, কিন্তু সে প্রেম যে শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হয়ে গেল যক্ষ সেনাপতি।

—নিষ্ফল! কেন?

—আপনি শোনেন নি, মহারাজের সভাপণ্ডিত কি বিধান দিয়েছেন?

পুণ্যক হেসে বলে—নাগরাজ্যের বাহুড় পণ্ডিতের বিধান নিম্প্রয়োজন ইরান্দাতী। ত্রিভুবনে আজ যিনি সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিত, তাঁর বিধান নিয়েই আমি তোমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছি বাসুকি-তনয়া।

—কে সেই পণ্ডিত ?

—এখনও বোঝ নি ? স্বয়ং বিধুর পণ্ডিত।

—কি বলেছেন তিনি ?

—তিনি বলেছেন, সামাজিক বিধান অমোঘ। কিন্তু সমাজ সৃষ্টি করেছে জীব, সেই জীবের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁর বিধান আরও অমোঘ। তিনিই সৃষ্টি করেছেন পুরুষ ও প্রকৃতি—সৃজনের মহানন্দে বিভোর তিনিই সঞ্চারিত করেছেন তাদের অন্তরে অমুরাগের অমৃত ! তাকে অমর্যাদা করাই পাপ। সামাজিক বিধানের অজুহাতে যারা সেই স্বর্গীয় প্রেমকে হত্যা করে, তারাই প্রকৃত পাপী।

আনন্দের আতিশয্যে নাগকন্যা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারে না। তাঁর ভীকু কপোতকম্পিত মুখ আশ্রয় খোঁজে যক্ষ সেনাপতির কবাটবক্ষে।

জাতক-বর্ণিত এই মূল কাহিনীটিকে অজন্তার শিল্পী কপায়িত করেছেন একটি দীর্ঘায়ত চিত্র-কাহিনীতে (২।১৭)। কাহিনী কালানুক্রমিকভাবে সাজালে যে দৃশ্যগুলি পর পর আসা উচিত, চিত্র-কাহিনী কিন্তু সেভাবে সাজানো নয়। ফলে, যে দর্শক মূল কাহিনী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, চিত্র দেখে তাঁর পক্ষে মন-গড়া একটি কাহিনী গঠন করে নেওয়া শক্ত। শিল্পী কেন এভাবে কোন কোন চিত্র-কাহিনী সাজিয়েছেন জানি না—চিত্র-নাট্যের ব্যাকরণ নিয়ে না হয় আমরা এর পর আলোচনা করব। আপাততঃ যা দেখছি তাই বলি :

বাঁদিকের উপরে দেখছি ইন্দ্রপ্রস্তরাজ ধনঞ্জয়ের সভায় এসেছে পুণ্যক (২।১৪ক)। কুকরাজ সিংহাসনে আসীন—সিংহাসনে দাগ-কাটা নকশা। বাজার দক্ষিণে দর্পণহস্তে কুমহিষী। ধর্মপ্রাণা নাগরানী বিমলার মুমুক্শু চরিত্রটি ভবিষ্যতে ফুটিয়ে তুলতে হবে মনে করেই কি শিল্পী কুমহারানীর হাতে এই প্রনাধনের প্রতীক দর্পণটি দিয়েছেন ? তাঁর কি বক্তব্য এই যে, যাঁর ঘরে বিধুর পণ্ডিত সমপস্থিত তিনি রাজসভাতেও নিয়ে আসেন প্রমোদ-কক্ষের প্রসাধন সামগ্রী,—আর যাঁর ঘরে তিনি নেই তিনি প্রমোদ-কক্ষেও নিয়ে আসেন ধর্মসভার উপকরণ, জপমালা ? রাজার সম্মুখে পুণ্যক, সে বিনয়াবনত, তার হাতে ইন্দ্রকাস্তমণি, সেটি সে সুর্যকোশলে প্রদর্শন করছে কুকরাজকে। রাজার পার্শ্বে ছজন অমাত্য। পিছনে ছজন ব্যজনিক। অমাত্যের মধ্যে একজন অন্তঃমনস্ক, অপরজন চিত্তিত। রাজা দক্ষিণকরে যে মুদ্রাটি রচনা করেছেন সেটি ‘হুই’-সংখ্যার চোতক। চিত্র যদি নির্বাক না হয়ে সবাক্ চলচ্চিত্র হত, তাহলে আমরা সলাপ গুনতে পেতাম—‘হে যক্ষ সেনাপতি, রাজহুত্র এবং ক্ষত্রিয় পৌরুষ এই দুটি ছাড়া যে-কোন পার্শ্ব-অপার্শ্ব সম্পদ আমি পণ রাখতে রাজী !’

পরের প্যানেলে দেখছি পাশা খেলা হচ্ছে (২।১৭খ)। অক্ষকীড়ার ছক্টি কিন্তু আসনের উপর শায়িত নয়, যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে—যেন উপর-থেকে-দেখা পাশার ছকের প্ল্যান আঁকা হয়েছে। এটিকে পাশ্চাত্য চিত্র-ব্যাকরণের সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রটি বলে মনে হতে পারে। বস্তুত তা নয়; কেন নয় সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এই চিত্রে দেখছি রাজা হেরে যাচ্ছেন। রানী তাকিয়ে আছেন পুণ্যকের দিকে, যেন মিনতি করে কিছু বলছেন তাকে। রাজার পাশে দুজন অমাত্য। তাদের মুখ অক্ষত নেই, তাদের ভাবব্যঞ্জনা বোঝা যায় না।

ঐ চিত্রের নিচে দেখছি কুকরানী দাসীকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছেন। তাঁর পাশে দেখছি মহারাজ ধনঞ্জয় বিধুর পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপনরত। যেন তিনি পরাজিত হবার পর বিধুর পণ্ডিতের কাছে পরামর্শ চাইছেন, এখন কি কর্তব্য, আর পণ্ডিত বলছেন, শর্ত অনুযায়ী বিধুর এখন পুণ্যকের ক্রীতদাস। তাঁকে যেতে হবে।*

পরের চিত্রটি দেখে বুঝতে পারি মহারানী দাসীকে কী নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তাকে আদেশ করেছিলেন—বিধুর পণ্ডিতকে রানীর মহলে আহ্বান জানানো। এ চিত্রে দেখছি, রানীর মহলের কেন্দ্রস্থলে সিংহাসনে বিধুর পণ্ডিত আসীন, আর পুরকামিনীর দল তাঁকে ঘিরে আছে যুক্তকরে। এই চিত্রে বিধুরের আলেখ্যটি সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ছবিটি দেখে বোঝা যায়, কীভাবে তাঁর মনুষ্যাকৃতিতে শিল্পী দেবভাব আরোপ করেছেন। প্রতিভাদীপ্ত মহামতী বিধুরের এই আলেখ্যটি সম্ভবতঃ এই সম্পূর্ণ চিত্র-কাহিনীর শ্রেষ্ঠ খণ্ডাংশ।

এই ছটি খণ্ডচিত্রের নিচে একটি বিশালায়তন প্যানেলে দেখছি (২।১৭গ), কুকরাজের ভক্ত প্রজাবৃন্দ বিধুর ও পুণ্যকে শোভাযাত্রা করে রাজ্যসীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছে। এই প্যানেলটির কম্পোজিসন লক্ষণীয়। হস্তিপৃষ্ঠে মহামতি বিধুর—দ্বিতীয় হস্তীতে পুণ্যক স্বয়ং তাঁর পাশে।

চল্লিশ বছর পূর্বে শিল্পী মুকুলদে এই প্যানেল-এর বর্ণনায় বলেছিলেন: °

ডানদিকের প্রাচীরে এ গুহাব অন্ততম কোতুহলোদ্দীপক চিত্রসম্ভার। শোভাযাত্রা করে একজন রাজা (বিধুর পণ্ডিত) চলেছেন রাজপথ দিয়ে হস্তীপৃষ্ঠে। তাঁর মস্তকে রাজচক্র (বস্তুতঃ সম্মান-ছত্র) এবং হস্তে অঙ্কুশ।...পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় হস্তিতে অপর একজন সম্মানীয় অমাত্য (বস্তুতঃ পুণ্যক)। ...সম্মুখ পাঁচটি অশ্বাবোহী, তাদের দৃষ্টি বাজার দিকে ফেবানো (বিদায়কামী বিধুরের দিকে)। ...তৎসহ চতুর্দশ সংখ্যক পদাতিক। এদের মধ্যে এগাবোজন সৈনিক বলে মনে হয়, তাদের হস্তে নগ্ন রূপাণ ও ঢালিকা।...দুজন বংশীবাদক এবং একজন ঢোলকও চলেছে শোভাযাত্রার সঙ্গে।

তখনও জাতক-কাহিনীর সঙ্গে চিত্রটির সম্পর্ক ছিল অনাবিস্কৃত।

এর পরের প্যানেলটি নাগরাজ্যে (২।১৪ঘ)। নাগরাজসভায় বিধুর পণ্ডিত নাগরাজ বাম্বুকিকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন। নাগরাজ্যের মস্তকে পঞ্চনাগের কণা, যুক্তকর মুমুকুর

অভিব্যক্তি। বিধুর বসেছেন একটি চারপায়াতে,—নাগরাজ ভূমিতলে আসনে উপবিষ্ট। অন্তরমহল থেকে অগ্রসর হয়ে আসছেন নাগরানী বিমলা ও নাগকণ্ঠা ইরান্দাতী। সকলের দৃষ্টিই বিধুর পণ্ডিতের দিকে নিবদ্ধ। একমাত্র ব্যতিক্রম চিত্রের সর্ববামে যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক—তার দৃষ্টি সর্বদক্ষিণের উদ্ভিন্নযৌবনা একটি নারীমূর্তির দিকে দৃঢ়নিবদ্ধ।

পরের চিত্রে নাগরাজ (পঞ্চনাগ কণাযুক্ত) অমাত্যদের নিয়ে জল্পনা করছেন এক ক্ষেত্রে কি করণীয়। সম্মুখে নাগ অমাত্যরা উপবিষ্ট। অমাত্যদের পদমর্যাদা তাঁদের কণার সংখ্যার উপর নির্ভরশীল। দুইকণা-বিশিষ্ট অমাত্য বসেছেন কুশাসনে, এককণা-বিশিষ্ট ভূমিতলে। রাজার দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে ইরান্দাতী ও বিমলা। সম্মুখে পুণ্যক।

পরের একটি খণ্ডচিত্রে দেখতে পাচ্ছি একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ। তাতে নিভৃত আলাপে মগ্ন একটি পুরুষ ও একজন রমণী। ইয়াজদানী বলেছেন, এঁরা দুজন বিধুর ও বিমলা। বিধুর নিভৃতে নাগরানীকে ধর্মের মূল কথা শোনাচ্ছেন; যুক্তির সপক্ষে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে পুরুষ-চিত্রটির হস্তে পদ্মফুল। এটি অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির ছোটক। পদ্ম ইঙ্গিত করছে পুরুষ-চিত্রটি বোধিসত্ত্বের।

হতে পারে। কিন্তু আমি তো বিশেষজ্ঞ নই, আমি শিল্প-রসিক—আমার মনে হল এ মিলনাস্তক নাটকের শেষ দৃশ্যে গবাক্ষপথে দেখা এই নিভৃতে আলাপনরত যুগল মূর্তিটি নায়ক ও নায়িকার। পুণ্যক ও ইরান্দাতীর। পদ্মফুল? তাতে কি শুধু বোধিসত্ত্বেরই একচেটিয়া অধিকার? অনুরাগরক্তিম পুণ্যকের পক্ষে ইরান্দাতীকে পুষ্প উপহার দেবার প্রয়াস কি এতই অসম্ভব?

সর্বশেষে দেখছি একটি দোলনা। ইরান্দাতী দোল খাচ্ছে (চিত্র—২৪)। দোলনায় আবদ্ধ বস্ত্রখণ্ড হাওয়ায় উড়ছে। তার সামনে ষ্ঠেত অশ্বের সম্মুখে যক্ষ সেনাপতি পুণ্যক এবং তার কাছে পুনরায় ইরান্দাতী। ব্রীড়াবনত। নতমুখী বালিকামূর্তি। দোলনায়-বসা নাগকণ্ঠার মস্তকে মনে হয় যেন সাপের কণা, আসলে সেটি হাওয়ায়-ওড়া বস্ত্রখণ্ড মাত্র। এ ঘটনাটি কাহিনী-চিত্রের সর্বপ্রথমে আসা উচিত ছিল। বোধ করি মিলনদৃশ্যের পরে শিল্পী পূর্বকথন ও নিয়েছেন। অর্থাৎ, আধুনিক চলচ্চিত্রের ভাষায় যেন “ফ্যাশ-ব্যাক”।

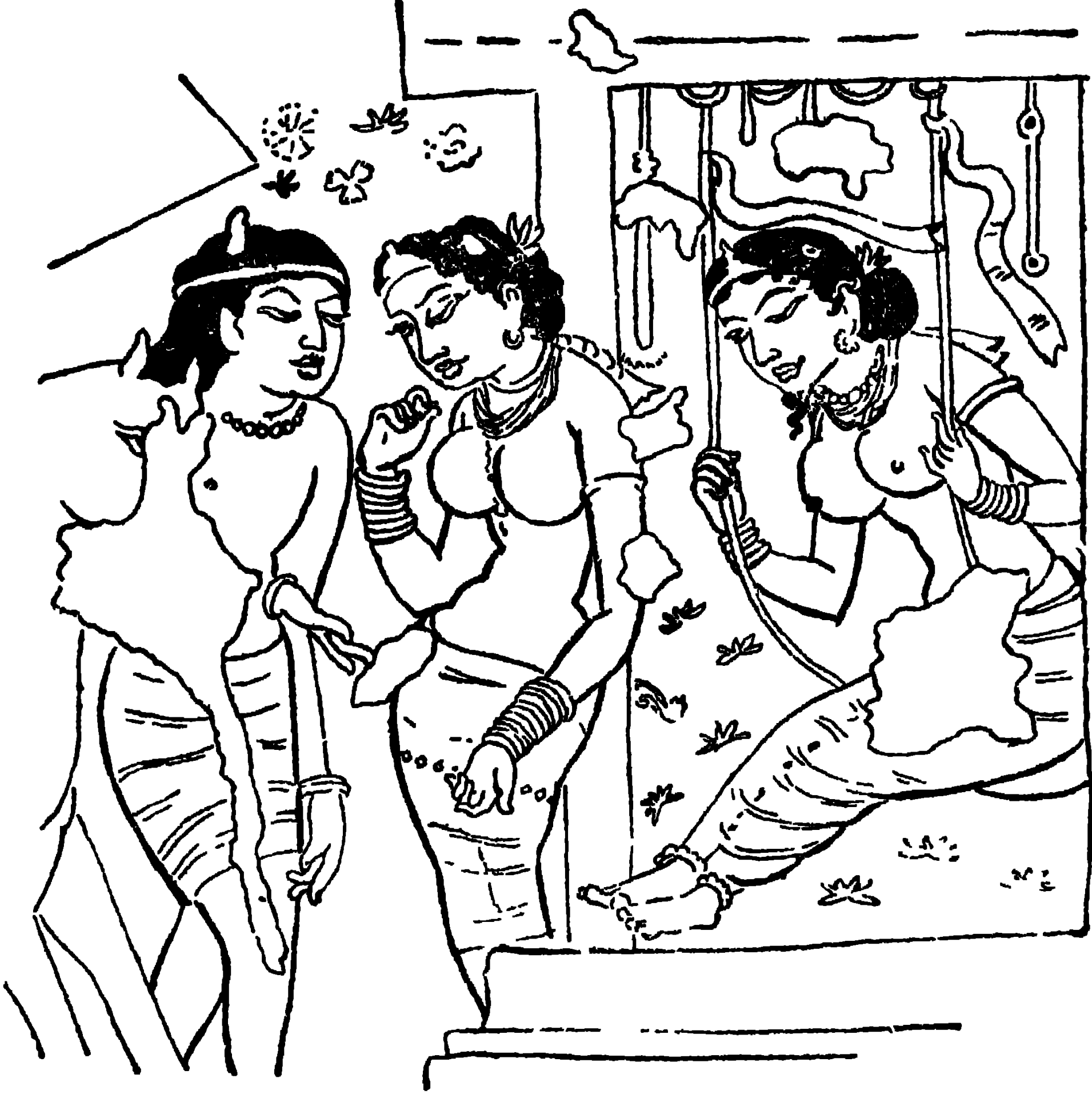
প্রথম দুটি গুহা-মন্দির দেখা শেষ করে অজ্ঞতা-গুহাচিত্র সম্বন্ধে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা করতে পেরেছি। অজ্ঞাত মন্দির দর্শনের আগে এবার অজ্ঞতা-চিত্রের জাত ও শিল্পরীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

অজ্ঞতা-চিত্রকে আমরা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমতঃ, সমাপিকা বা একক-চিত্র; দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-চিত্র এবং তৃতীয়তঃ, নকশা। সমাপিকা-

সমাপিকা-চিত্র, চিত্র আমি সেগুলিকেই বলতে চেয়েছি, যেগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ—যা
কাহিনী-চিত্র একটি বিশেষ মুহূর্তকে শাস্বত করে ধরে রেখেছে। যেমন—সপ্তদশ
ও নকশা গুহায় বুদ্ধদেব-গোপা-রাজল, অথবা প্রথম গুহায় মার ও বুদ্ধদেব,

কিংবা ষোড়শ গুহায় প্রসাধনরতা নারীত্রয়ের আলেকথ্য; এগুলির বক্তব্য একটি খণ্ড-

মুহূর্তে সীমিত। দ্বিতীয়তঃ, কাহিনী-চিত্রগুলি। সেগুলি অধিকাংশই জাতক অবলম্বনে রচিত, অথবা স্বয়ং বুদ্ধদেবের জীবনের নানান ঘটনার অনুসারী। এই চিত্রগুলি একক-চিত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তাতে সময়ের বিস্তার আছে,—পরবর্তী চিত্রে দর্শককে এগিয়ে দেওয়ার কাজে এরা যেন রীলে-রেসের, অস্থায়ী প্রতিযোগী। এই জাতের চিত্রগুলিকে বিচার করতে হলে সম্পূর্ণ কাহিনী-চিত্রটির সামগ্রিক ফলশ্রুতিকেও তৌল করতে হবে। তৃতীয়তঃ, নকশা। এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কোন আলোচনাই করি নি; কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভায় গানের যে স্থান, অজ্ঞতার মহিমায় এই নকশাগুলিরও সেই মর্যাদা।



চিত্র—২৪

ইবান্দাতী ও পুণ্যক।

অনবদ্য গীতি-কবিতা, অপূর্ব উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক অথবা অচিন্ত্যপূর্ব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ সত্ত্বেও রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন যেমন সম্পূর্ণ হয় না রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে, তেমনি অতুলনীয় একক-চিত্র, মর্মস্পর্শী কাহিনী-চিত্র ভাস্কর্য স্থাপত্য সত্ত্বেও অজ্ঞতার কথা শেষ হবে না এই অপূর্ব নকশাগুলির কথা আলোচনা না করা পর্যন্ত।

একে একে আলোচনা করা যাক।

চিত্র-সম্ভারে সমৃদ্ধ গুহা-মন্দিরগুলিতে, বিশেষতঃ প্রথম, দ্বিতীয়, ষোড়শ ও সপ্তদশ

গুহার, প্রবেশ করলে প্রথম কয়েক মিনিট দর্শক রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েন। চারিদিকের দেওয়াল যেন ছাঁবিতে মোড়া। কোথাও একটু কঁক নেই, যেন ভীড় করে আছে তারা। কোথায় কোন দর্শনীয় চিত্র আছে, কী তাদের বক্তব্য, কোথায় তার শুরু ও শেষ যেন বোঝাই যায় না। তারপর আঁধারে চোখ একটু সরে এলে, মন একটু শান্তি আশ্রয় হলে একে একে দেখা যায় যে, চিত্রগুলি মোটেই এলোমেলোভাবে সাজানো নয়—তাদের একটি ছন্দ আছে। অসংখ্য জনপদ, অট্টালিকা, শোভাযাত্রা, রাজসভা, পশু-পাখী, গাছ-পালার ভিতর থেকে এক-একটি গ্রুপ ফুটে বের হয়। বোঝা যায়, এক-একটি অংশে এক-একটি কাহিনী-চিত্র শুরু ও শেষ হয়েছে। এই কাহিনী-চিত্রগুলি দেখতে দেখতে দর্শক যাতে ক্লান্ত না হয়ে পড়েন, তাই মাঝে মাঝে একক-চিত্রে অথবা নকশা দিয়ে দুটি কাহিনীর মাঝখানে বিরাম বা ছেদ চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। যেন দুটি একাক্ষ নাটিকা অভিনয়ের বিরতিকালে কিছুটা বাণীহীন সুরের আলাপ।

সমাপিকা বা একক চিত্রের রীতি, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞাসের (কম্পোজিসন) সঙ্গে কাহিনী-চিত্রগুলির অঙ্কন-পদ্ধতির যথেষ্ট প্রভেদ আছে। একক-চিত্রগুলি অধিকাংশই প্রতिसাম্যমূলক। অর্থাৎ, কেন্দ্রস্থলের কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তিতে শিল্পী সমধিক গুরুত্ব

সমাপিকা বা
একক চিত্র

আরোপ করেন এবং তার দু-পাশে উপরে ও নিচে ফিগার বা বস্তু-নিচয় এমনভাবে সাজাতে থাকেন, যাতে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। যাতে দর্শকের দৃষ্টি কেন্দ্রাভিমুখী হয়। পুরুরের জলে ডিল

ফললে যেমন সেই কেন্দ্র-বিন্দু চতুর্দিকে সমতা রক্ষা করে তরঙ্গ-ভঙ্গিমা বড়াকারে ছড়িয়ে পড়ে, কোন কোন চিত্রে সেইভাবে ফিগার-গুলি চারপাশে সাজানো। যেমন বুদ্ধ ও মার (১৯১০) যেমন মারীপুত্রের পরীক্ষা (১৭৯২) অথবা স্বর্গে বুদ্ধদেব (১৯২০)। এ তিনটি উদাহরণেই এবং এ জাতীয় চিত্রের প্রায় সবত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্রটি সামনে-ফেরা। স্বর্গে বুদ্ধদেবের চিত্রে তো শিল্পী যামিনী বায়ের কাঠেব পুতুলের মত একেবারে সামনে-ফেরা। এতে স্বতঃই কেন্দ্র-বিন্দুটি প্রতিসাম্য রক্ষা করে। শিল্পী তখন দু-পাশে, উপরে ও নিচে, অগ্ন্যাগ্নি ফিগার-গুলি সাজাতে থাকেন। দু-পাশে যে সম-সংখ্যক ফিগার থাকবে এমন কোন বাধা আইন নেই। সংখ্যার খাটুটি রঙের গাঢ়তা দিয়ে, ঝল্জল্য দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছেন ফেনা-বিশেষে। এই নিয়মের বাতিগ্রহ করে আবার নূতন পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন কোথাও বা। যেমন ধরা থাক, বুদ্ধদেব-গোপা-রাহুল চিত্রটি (১৭৯৪)। এটিও প্রতিসাম্যমূলক চিত্র। কিন্তু কেন্দ্র-বিন্দু কি? কেন্দ্র-বিন্দু এক্ষেত্রে শূন্য। বুদ্ধদেবের বাম কনুইয়ের উপর দিয়ে টানা একটি কল্পিত ভার্টিকাল রেখার দু-পাশে চিত্রটি প্রতিসাম্য রক্ষা করেছে। বিশালায়তন বুদ্ধদেবের দেহের তুলনায় গোপা ও রাহুল অত্যন্ত নগণ্য। শিল্পী এভাবে ছোট-বড় করে আকর্ষণে বাধ্য হয়েছেন বুদ্ধদেবের চরিত্রে মহত্ত্ব ও বিরাটত্ব আরোপ করতে। তাই ভারসাম্য রক্ষা করতে শিল্পী গোপার পিছনে একটি বিশাল তোরণ-দ্বার একে ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। ঘোর রঙের

প্রলেপ দিয়েছেন গোপা ও রাহুলকে আঁকতে। ম্যাস ও রঙ নিয়ে যদি তৌল করেন, দেখবেন ঐ কল্পিত সরলরেখার ছ-দিকের পাল্লাই সমান ওজনের।

এবার কাহিনী-চিত্রগুলির বিচার বা কম্পোজিসনের প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে একটি গ্রুপ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়—তার কাজ হচ্ছে দর্শককে বিশেষ একটি ঘটনার কথা জানিয়ে

কাহিনী-চিত্রের
ব্যাকরণ দেওয়া এবং পববর্তী ঘটনার দিকে তাকে ঠিকমত চালিত করে দেওয়া। শুধু তাই নয়, কোথায় যে ঐ খণ্ডচিত্রের ঘটনাটি শেষ হল তাও দর্শককে বুঝিয়ে দেওয়া। ফলে, এখানে যতিচিহ্ন—

কমা, সেমি-কোলন, ছেদ ও অধ্যায়েব বিভাগ বা পাঞ্চুয়েসন-মার্কগুলি দর্শকের জানা থাকা চাই। কথা-সাহিত্যে আমরা পবিচ্ছেদ টেনে, অধ্যায়েব মাথায় সংখ্যা লিখে কাহিনীটিকে কালানুক্রমিকভাবে ভাগ করে থাকি। নাটকে পটক্ষেপণের ব্যবস্থা থাকে, চলচ্চিত্রে ফেড-আউট, ফেড-ইন কবে অথবা ডিসল্ভ-কার্ট-ওয়াইপের মাধ্যমে দর্শককে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে আনা হয়। অজস্তাব শিল্পীকেও তেমনি কতকগুলি যতিচিহ্নের আবিষ্কার করতে হয়েছে। চিত্র থেকে চিত্রান্তরে যাবাব মাঝখানের ফাঁকে কোথাও বসিয়েছেন তোরণ-দ্বার, কোথাও বৃক্ষ, কোথাও বা অট্টালিকার একটি অলিন্দ। বেশ অনুভব করা যায়, একটি যতিচিহ্ন পাব হয়ে এলাম। বিশ্বাস্তব জাতক-কাহিনীতে (১৭।১৬) অথবা নন্দেব ধর্মাস্তর-গ্রহণে (১৬।৩) এই যতিচিহ্নগুলি প্রায়শঃই স্তম্ভ। পূর্ণ-অবদান জাতকে (২।১৩) ভাবিলেব নৌকা বক্ষা ও দুই ভাইয়েব শ্রাবস্তী আগমনেব মাঝখানে সময়েব ব্যবধান বাঝাতে শিল্পী দুটি সমান্তরাল বেখা টানতে বাধ্য হয়েছেন (চিত্র-১৭)। এছাড়া, প্রথম যুগ থেকেই আর একটি অভিনব যতিচিহ্নের ব্যবহার কবেছেন তাঁরা। সেটি হচ্ছে বিভিন্ন ফিগরেব মুখ-ফেবানোব ভঙ্গি। শিল্পী দেখলেন, চিত্র থেকে চিত্রান্তরে সংক্রমণেব পথে কোন স্থূল বস্তু না বেখেও শুধুমাত্র ফিগবগুলিব মুখ এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে দৃশ্যান্তর বোঝানো সম্ভব হচ্ছে।

একটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা বোঝানো সহজ হবে। ধরা যাক, মহাজনক জাতকেব প্রথম অংশটি। চিত্র—৮-এ আমরা যে অংশটি দেখেছি, তার পববর্তী অংশের সঙ্গে সংযুক্তি এবাব দেখানো হল চিত্র—১৫-এ। চিত্রে দেখুন, ছটি কাল্পনিক বৃত্তের মধ্যে বিভিন্ন গ্রুপ কিভাবে সন্নিবেশিত। প্রথম দুটি বৃত্তেব পবে একটি তোরণ-দ্বার—এটি প্রথম অঙ্কের যবনিকা। প্রথম দুটি বৃত্ত একই উপবৃত্তেব যেন দুটি অংশ। এ-দুটি দৃশ্য যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ৩নং বৃত্তে মহাজনক হস্তিপৃষ্ঠে হিমাবলী পর্বতে চলেছেন। তার উপরে ৪ ও ৫-চিহ্নিত দুটি বৃত্ত আবার একটি বৃহদাকার উপবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। এ-দুটি বৃত্তে আছেন হিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী ও মহাজনক। ৬নং বৃত্তেব নিচে আরও একটি বৃত্তাকার গ্রুপ আছে, কিন্তু সেটি মূল কাহিনীেব শ্রোতের বাহিবে। ৬নং বৃত্তেব পবে আরও এগিয়ে যেতে হবে কাহিনীেব অপর অংশেব সন্ধানে।

এখন দেখুন, প্রথম দৃশ্যেব সীমান্তে, বস্তুতঃ প্রথম বৃত্তটিব প্রান্তে, দুটি নারী দ্বিতীয়

বৃত্তের দিকে তাকিয়ে আছে (বিস্তারিত চিত্র—৮)। ছুটি বৃত্তের মাঝখানে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং সীবলীর পদসেবাকারী দাসীটিকে দেখুন এবাব—তারা দুজনে দ্বিতীয় বৃত্তটির দিকে মুখ ফিবিষে দর্শকের দৃষ্টিকে কেমনভাবে পববর্তী চিত্রের দিকে চালিত কবে দিচ্ছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বৃত্ত পাশাপাশি, মণ্ডপের ভিতরে প্রমোদ-ভবনে রাজা-রানী ও বাহিরে অপেক্ষমানা নর্তকী এবা একই কালের, একই সংলগ্ন স্থানের। ফলে, এই ছুটি দৃশ্যের মধ্যে কোন পূর্ণচ্ছেদ নেই। কিন্তু দ্বিতীয় বৃত্তের পবে হয়েছে সূচিহিত পটক্ষেপ—সেটি ঐ তোবণ-দ্বার। তৃতীয় বৃত্তের পবে দর্শককে উপবদিকে যেতে হবে কাহিনীর



চিত্র ২৫

চিত্রনাট্যের বিভাগ (কম্পোজিশন) ৬ যতিচিহ্ন

প্র০	তরু	প্রথম দৃশ্য	১ন বৃত্ত— প্রমোদ ভবন (পাণ্ডুরাত্রির দৃশ্য), চিত্র—৭
		দ্বিতীয় দৃশ্য	২ন বৃত্ত— অজ্ঞে নর্তকী দল (একই স্থান বাল), চিত্র
দ্বিতীয় অঙ্ক :	প্রথম দৃশ্য	৩ন বৃত্ত— সন্ন্যাসী দর্শন যাত্রা	
		দ্বিতীয় দৃশ্য	৪ন বৃত্ত— শিমাবলী পর্বতে সন্ন্যাসী
			৫ন বৃত্ত— শিমাবলী পর্বতে মহাজনক
তৃতীয় অঙ্ক :	প্রথম দৃশ্য	(বর্তমান চিত্রের বাহিরে) প্রমোদ ভবনে রাজা বানী, চিত্র—৮	
		হত্যাদি	

সূত্র ধরে—তাই দেখুন, উদ্ধ মুখী হবিগটি কেমন সুস্পষ্টভাবে পথ নির্দেশ করছে। চতুর্থ ও পঞ্চম বৃত্ত আবার একই স্থানের, একই কালের—তাই সেখানে তাদের মাঝখানে কোন যতিচিহ্ন নেই, আর তাই তাবাও যেন একটি বড় উপবৃত্তের অংশমাত্র।

এইভাবে যদি শিল্পীর ইচ্ছিত, নির্দেশ ও যতিচিহ্নগুলি লক্ষ্য করে অগ্রসব হন, তবে পথ হারাবার ভয় নেই। চিত্রাবলীই আপনাকে হাত ধবে এগিয়ে নিয়ে যাবে কাহিনীর পরিণতির দিকে।

চিত্র—২৩-এ পূর্ণ-অবদান জাতক কাহিনীর অনেকখানি একসঙ্গে আঁকবার চেষ্টা কবেছি। সেখানে লক্ষণীয়, কাহিনী-চিত্রে দুটি সুস্পষ্ট বিভাগ আছে। উপরে আবস্তীতে পূর্ণ ও ভাবিল বুদ্ধদেবের দর্শনপ্রার্থী। উপরের সম্পূর্ণ প্যানেলটি একই স্থান-কালের অন্তর্ভুক্ত, ফলে, বিভিন্ন গ্রুপের মাঝখানে কোন সুস্পষ্ট যতিচিহ্ন নেই। বামদিকে উচ্চতর মণ্ডপে বৃত্তাকার প্রথম গ্রুপ। সোপানের উপরে ও নিচে দুটি মেয়ের মুখ-ফোনোর ভঙ্গিতে আমবা পববর্তী খণ্ডদৃশ্যে আসি। সেটি পূর্ণ ও ভাবিলের গ্রুপ। এটি ত্রিকোণাকৃতি। ইংবেজিতে এ-কে বলে পিরামিড কম্পোজিশন। পূর্ণের মস্তক এই ত্রিকোণের শীর্ষবিন্দু। বুদ্ধদেবের নিকটবর্তী গ্রুপটি একটি উপরন্তে বিধৃত। উপরের গবাক্ষবর্তিনীবা কাহিনীর গতি-নির্দেশক একটি সবলবেখায় সংস্থাপিত।

নিচের প্যানেলটির কম্পোজিশনে মৌলিকত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এটি ত্রৈলোক্যগত ছান্দসিক কম্পোজিশন। এব মূল ছন্দ হচ্ছে নৌকাটি। লক্ষ্য কবে দেখুন, বামদিক থেকে বুদ্ধদেব, পূর্ণ, নৌকার তলদেশের বক্রবেখা, দেবদত্ত ও উড্ডীয়মান পূর্ণ যেন একটি অণু-চন্দ্রাকার মালাব আকাবে সাজানো। যেন সেটিও একটি নৌকা। কিন্তু যেহেতু বামপ্রান্তের বুদ্ধদেব ও পূর্ণ ভিন্নতর স্থান-কালের অন্তর্ভুক্ত, তাই নৌকার পালের মাধ্যমে একটি যতি চিহ্নের সুস্পষ্ট ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

অজন্তার কাহিনী-চিত্রে কম্পোজিশন ও যতিচিহ্নের ব্যবহার একটি পৃথক প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু হতে পারে এবং সে আলোচনা চিত্রবহুল হওয়া চাই। বর্তমান নিবন্ধে তাব স্থানের অভাব। ফলে, এ প্রসঙ্গের এখানেই যবনিকা টানছি।

একক-চিত্র ও কাহিনী-চিত্রের অঙ্গন-বীতি ও কম্পোজিশন নিয়ে আমবা এতক্ষণ আলোচনা কবেছি, এবার তৃতীয় জাতের ছবি-নকশার প্রসঙ্গে আসতে হয়। অজন্তার এই নকশা বা অলঙ্করণ-চিত্র হচ্ছে তার প্রাণের বস্তু। এ-কথা স্বীকার কবতেই হবে যে, আখ্যান-চিত্রে কাহিনীই মৌল, চিত্র গোণ। কাহিনীর প্রয়োজনেই চিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে, .স কাহিনী শাস্ত্র-সম্মত ও পব-নিধারিত। শিল্পের প্রয়োজনে কাহিনীর সামান্য রকমফের হতে পারে, মদল-বদল হতে পারে না। ফলে, চিত্রই কাহিনীর অনুগ। তাছাড়া, শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য দর্শকের মনে ধর্মের অনুশাসন ও ভাব জাগিয়ে তোলা—তাই ‘আর্ট ফর আর্টস্ সেক’ এ বাণী সেখানে অচল। তবু দেখছি, কাহিনী কোথাও চিত্রশিল্পের ভাব হয় নি—হয়েছে বাহক, হয়েছে সাথী। শব্দ বা বাণী যেমন ববান্দ্রসঙ্গীতের সুবের ভার বা বোঝা নয়,

নকশা বা
অলঙ্করণ চিত্র

তার প্রাণ। কিন্তু এই নকশাগুলিতে কোন কাহিনী নেই, সেখানে কোন বাণী বা কথা নেই তা যেন শুধু সা-বে-গা-মা সাক্ষেতিক-ধ্বনির সাহায্যে ঋপদী-সঙ্গীতের আলাপ। সেই সা-বে-গা-মা

এখানে হচ্ছে রেখা আর রঙ। রেখার কড়ি ও কোমলে, বঙের মীড ও মূর্ছনায় শিল্পী যেন চিত্রের আসবে রাগপ্রধান সুবের আলাপ কবেছেন এই নকশাগুলিতে।

কিন্তু ঋপদী-সঙ্গীত নয়, আমবা এই নকশাগুলির সঙ্গে ইতিপূর্বেই তুলনা করেছি

স্বীকৃতসঙ্গীতের! গীতবিতানের সহস্র সঙ্গীত যেমন সহস্র ভাবের দ্রোতক, এই অলঙ্করণের নকশাগুলিও তেমনি সহস্র ভাবের ব্যঞ্জক। তাতে কখনও কদ্র রস, কখনও বীভৎস রস, আবার কখনও বা হাস্য রস, করুণ রস। এই অলঙ্করণ-নকশায় আছে আম-আতা-আঙ্গুর-আনারসের নৈবেদ্য, আছে পদ্ম-চাঁপা-চন্দ্রমুখী-চামেলীর গীতিমালা, আছে রঙ ও রেখার গীতাঞ্জলি। এত বিচিত্র ভঙ্গি, বিচিত্র ভাব, এত রেখার কারিগরি এই নকশাগুলিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, বিষয়ে স্তম্ভিত হতে হয়। বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যই কি কম? হাতী, ঘোড়া, মহিষ, ধাবমান হরিণ, হনুমান, কাকাতুয়া, রাজহাঁস, পাতিহাঁস, বানর, বাঘ, সাপ—কী নেই? আবার উদ্ভট কিন্তুত নাগ, কিষ্কর, কৃষ্ণনগরী পটুয়ার আহ্লাদী-পেহ্লাদী, আজগুবি জন্তুও আছে। বিষয়-বস্তু ছাড়াই শুধুমাত্র রঙ ও রেখার আলপনাও আছে। ফল-ফুল-লতা-পাতার বৈচিত্র্যই কী কম? পদ্মফুলই বা কত বকম। শাড়ির পাড়ের মত লম্বা নকশা আছে, লক্ষ্মীপূজার আলপনার মত গোলাকৃতি নকশা আছে, আবার ছোট ছোট চৌখুণিতে ছোট ছোট বিষয়-বস্তুও আছে।

চুটি কথা বলব। প্রথমতঃ, অলঙ্করণের মৌলিকতা। আলপনা-নকশার মর্মকথা হচ্ছে কতকগুলি রেখা ও বঙ একই ভাবে বাবে বারে ফিবে ফিবে আসবে। যাতে সবটা মিলিয়ে একটা সুসম ছন্দে নকশার রূপ নেয়। মুঘলযুগের চিত্রে বা জাফরির কাজে, রাজপুত স্থপতিতে ও চিত্রাঙ্কনে আমরা এ সত্যকে বারে বারে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু অজন্তা এ বিষয়ে এক অদ্ভুত ব্যতিক্রম। প্রত্যেকটি নকশাই নূতন ও মৌলিক। কেউ কারও নকল নয়। আগেই বলেছি, দ্বিতীয় গুহার সিলিঙে একটি গোলাকৃতি নকশায় তেইশটি হাঁসের একটি আলপনা আছে (২।৫)। সেখানে প্রত্যেকটি হাঁসের ভঙ্গি মৌলিক ও বিশিষ্ট। অলঙ্করণ-শিল্পে এটা নূতন কথা। এর কাবণ হিসাবে বলতে পারি, অজন্তাব চিত্রকব হচ্ছেন জাতশিল্পী; প্রত্যেকটি মুহূর্তেই তিনি নূতন সৃষ্টির উন্মাদনায় আত্মহারা।

দ্বিতীয় কথা, শিল্পী এই সব নকশায় যা-কিছু ঐকেছেন, তার ভিতর তাঁর শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ের পরিচয় পাই। বিশ্ব-সৃষ্টির অসীম বৈচিত্র্যকে তিনি বঙ ও রেখায় ধবতে চেয়েছেন, ছোট ছোট চৌখুণিতে; কিন্তু প্রতিটি বিষয়-বস্তুর প্রতি পবিপূর্ণ শ্রদ্ধা, দরদ আর সংবেদনা বর্তমান। ইউরোপীয় চিত্রকরের মত বাস্তবের ছব্ব নকল করার দিকে তাঁর ঝোঁক নেই—কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়-বস্তুর প্রাণসত্তাটিকে তিনি সযত্নে বিকশিত করে তুলেছেন। গাছ-ফল-পাখী-পশু বাস্তবায়ন হল কিনা এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই—কিন্তু সেগুলি যে এই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ-প্রপঞ্চে ভীষণ ও সুন্দরের বিচিত্র প্রকাশ, এ কথা শিল্পী কখনও ভোলেন নি। পদ্মফুল যখন ঐকেছেন তখন তা বলতে পেরেছে—‘এই দেখ অভিজ্ঞান, আমি সেই সুন্দরের দূত!’ ‘স্বাভাবিক পদ্যকে পৃথিবীতে যদি কেউ হার মানিয়ে থাকে, তবে তা অজন্তার ছবি। শিল্পী যেন সারা বিশ্বকে জড়িয়ে ধরতে চান, জাপটে ধরতে চান!’

অজন্তার অসংখ্য প্রাচীরে, অযুত স্তম্ভে ও সিলিঙে যে লক্ষাধিক নকশা আছে,

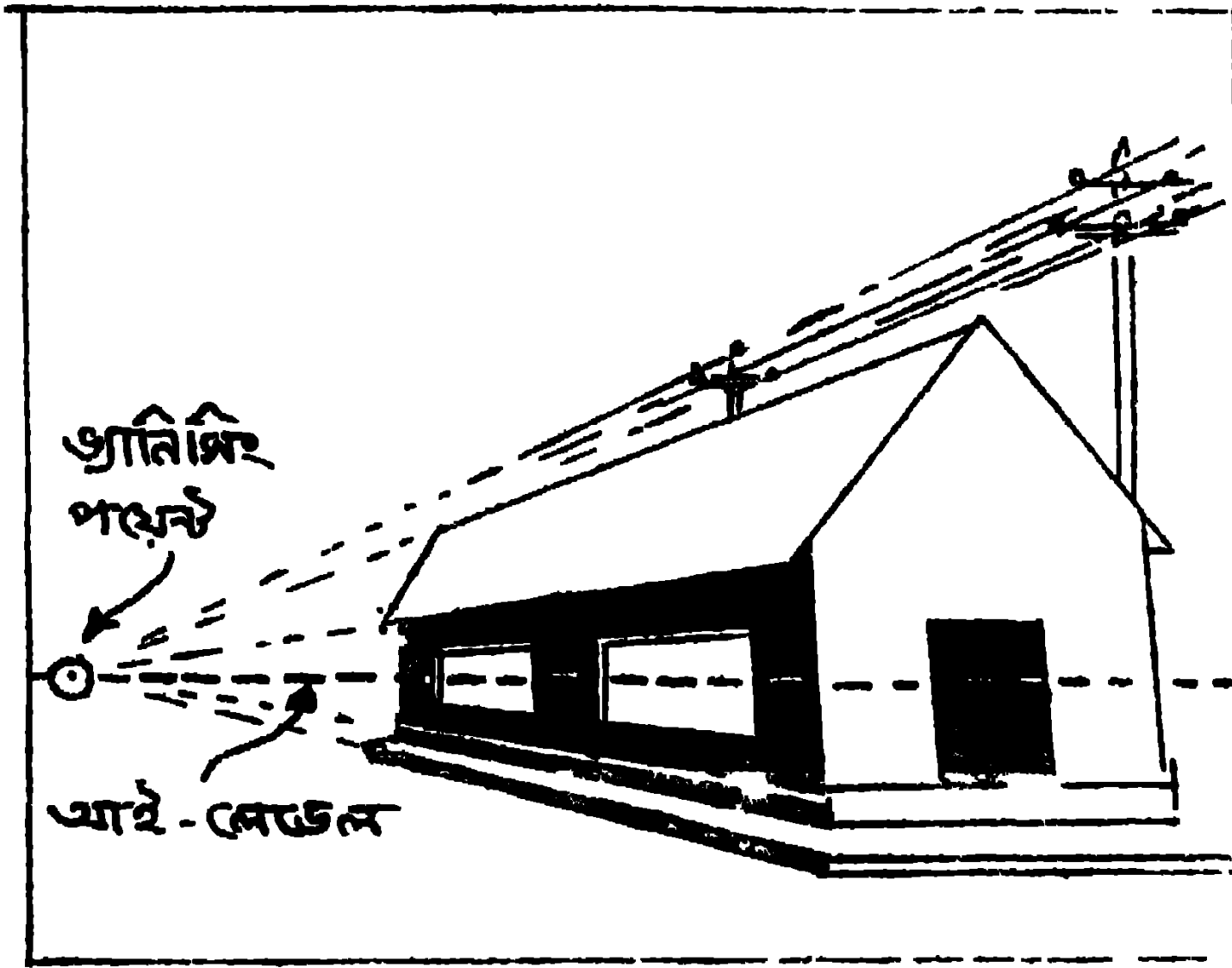
ছ-চারটি নমুনাচিত্র ঐকে তার পরিচয় দিতে যাওয়া হবে ধৃষ্টতা। এ গ্রন্থে পরিচ্ছেদের সমাপ্তিসূচক ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বাবতীয় নকশা বা আলপনা অজস্রা-গুহা থেকে অনুকৃত।

অজস্রা-চিত্রের বিচার বা কম্পোজিশন, যতিচিহ্ন বা পাঞ্চয়েসান এবং ব্যাকরণ নিয়ে আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছি। চিত্র-রীতির আর একটি বিশেষ দিকের কথা

অজস্রা-চিত্রে
পরিপ্রেক্ষিত

আলোচনা না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেটা হচ্ছে অজস্রা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের (পারস্পেক্টিভের) সংজ্ঞা এবং তার প্রচলিত ধারা। বিষয়টা বুঝতে হলে পরিপ্রেক্ষিত বা পারস্পেক্টিভ

কাকে বলে, তা আগে জেনে নিতে হবে :



চিত্র—১৬

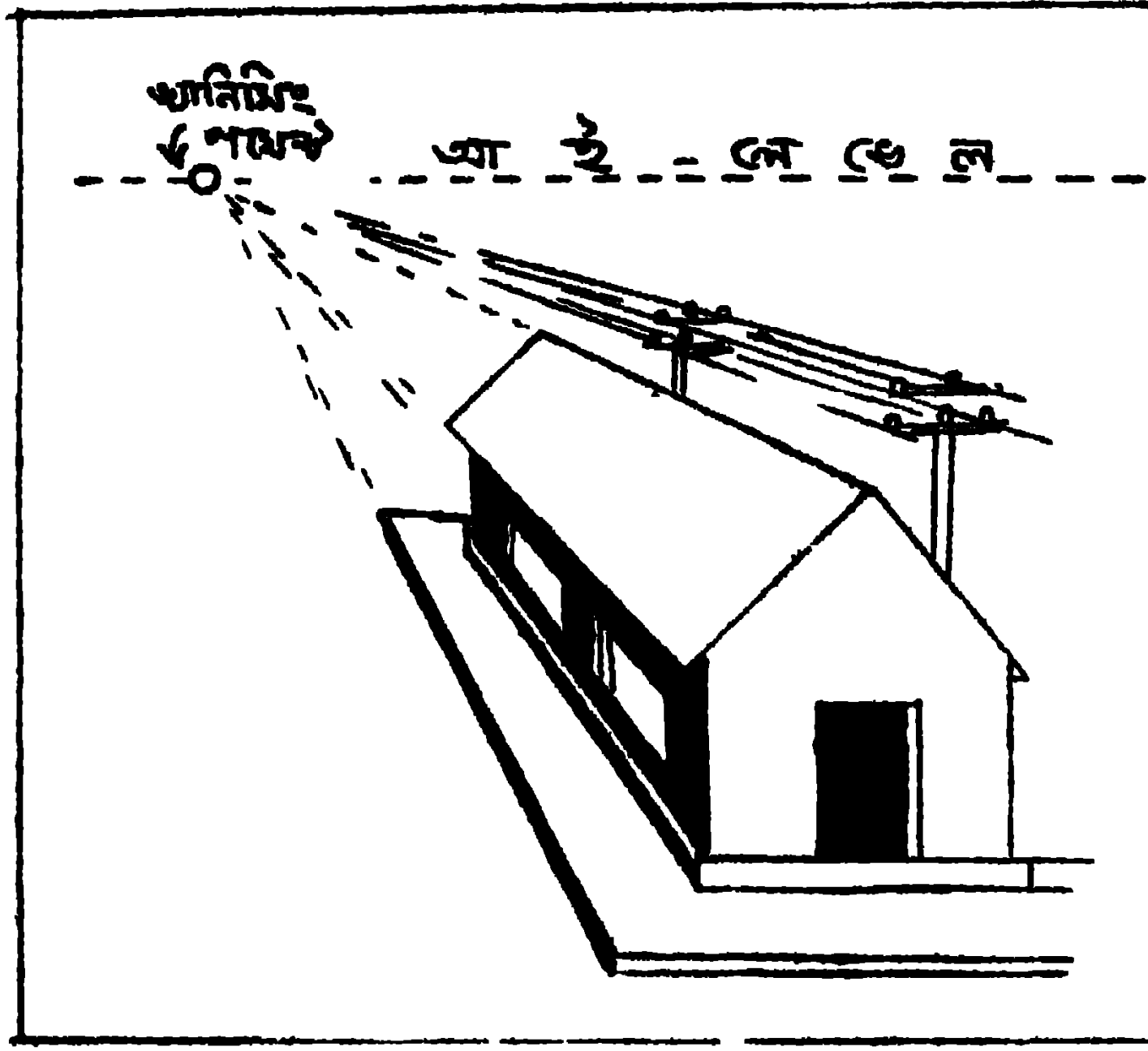
পারস্পেক্টিভ —পতঙ্গদৃষ্টিতে

জগতে আমরা যা-কিছু দেখি, তার তিনটি মাত্রা বা ডাইমেনসান,—লম্বা, চওড়া ও খাড়াই। এই ত্রিমাত্রিক বিষয়-বস্তুকে আমরা যখন দ্বিমাত্রিক কাগজে ছবি ঐকে দেখাই, তখন চিত্রকরকে একটা কৌশল করতে হয় যাতে ছবিটা অবাস্তব বলে না মনে হয়। এই কৌশলটির মূলে আছে দুটি জিনিস—‘বিলীয়মান বিন্দু’ (ভ্যানিসিং পয়েন্ট) এবং ‘দৃষ্টিতল’ (আই-লেভেল)। এবার এ-দুটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমরা যখন একটি রেললাইনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে লাইন-জোড়ার দিকে তাকাই, তখন দেখতে পাই সমান্তরাল রেলের লাইন দুটি যেন দিগন্ত রেখার দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেছে। তেমনি কোন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আমাদের মনে হয়, টেলিগ্রাফের তার, গাছ বা বাড়ীগুলি যেন ক্রমশঃ দূরে যেতে যেতে আকারে ছোট হয়ে গেছে—যেন সব সমান্তরাল রেখাই দিগন্তের একটি বিন্দুর দিকে মিলিত হতে চাইছে। এই বিন্দুকেই বলি বিলীয়মান বিন্দু। ছবি আঁকবার সময় ঐ কথাটি মনে রেখে আমরা যদি কাছের জিনিস বড় ও দূরের জিনিস ক্রমশঃ ছোট করে আঁকি, তবে সেটা বাস্তবায়ন হয়, ছবিতে

গভীরতাবোধ দেখা দেয়। এই ক্রমশঃ ছোট হয়ে যাওয়াব ব্যাপারটা একটা গাণিতিক নিয়ম মেনে চলে।

দ্বিতীয়তঃ, 'দৃষ্টিতল' বা আই-লেভেল। একটি ছবিব উপর কল্পিত একটি সরলবেখা জমির সমান্তরালভাবে টানা হয়। দু-পাশের দুটি বিলীয়মান বিন্দু এই সরলবেখায় এসে মেশে। এই কল্পিত সরলবেখাটি ছবিব নিচেকার দিক থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে তুলে



চিত্র—২৭

পারস্পেকটিভ—গরুডাবলোকনে

আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে (এ্যাঙ্গেল অব ভিসানকে) 'পতঙ্গদৃষ্টি' (ওয়ামস্ আই-ভিউ) থেকে ক্রমশঃ গরুডাবলোকনের (বার্ডস্ আই-ভিউ) দিকে নিয়ে যেতে পারি। চিত্র—২৬ এবং চিত্র—২৭-এ এটাকেই বোঝাবার চেষ্টা কবানো হয়েছে।

বিলীয়মান বিন্দুর সংস্থাপন ও দৃষ্টিতলের নির্বাচন বস্তুতঃ গাণিতিক ডকে বাঁধা। এই গণিত-সূত্রগুলি বেনেসাঁস যুগের পূর্ববর্তী ইউরোপীয় চিত্রকররা জানতেন না। এই আইনগুলি ইউরোপখণ্ডে প্রথম আবিষ্কার করেন ফিলিপ্পো ব্রানেলেশ্চি (Filippo Brunelleschi, 1377 1448 A. D.)। পরে লিওনার্দো, ডুবাব প্রভৃতি চিত্রবিশারদরা আইনগুলি ঠিকমত বিবিস্তর করেন। তার পূর্বে ইউরোপীয় চিত্রে গভীরতাবোধ ছিল না। মিশর এবং চীনের প্রাচীন চিত্রকররা এই পৰিপ্ৰেক্ষিতের কথা জানতেন না। মিশরীয় চিত্রকররা দূরের মানুষকে উপরের সাবিত্রে আঁকতেন, মাপে তাদের ছোট কবতেন না।

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকররা সম্ভবতঃ পৰিপ্ৰেক্ষিতের এই মূলসূত্রগুলি জানতেন, কিন্তু সব সময়ে মেনে চলতেন না। কোন কোন সময়ে তাঁরা উল্টো-পৰিপ্ৰেক্ষিতের আশ্রয় নিতেন। অর্থাৎ, দূরের জিনিসই বড় করে আঁকা হত, কাছেই জিনিস ছোট করে। এই প্রাচ্য পৰিপ্ৰেক্ষিত অনুসারে চৌকি বা পালঙ্কের যে ধারটি আমাদের থেকে সবচেয়ে দূরে

সেটাই ছবিতে সবচেয়ে চওড়া দেখানো হত, যে ধারটি সবচেয়ে কাছে সেটাই হবে সবচেয়ে সরু। বলা বাহুল্য, এটা বাস্তবের উল্টো। ধরা যাক, চিত্র—৮-এ নর্তকী দলের পিছনের বাড়ীটি। চোকা ছাদেব যে পাঁচিলটা আমাদের কাছে সেটাই মাপে ছোট, যে পাঁচিলটা দূরে সেটাই আকারে বড়। প্যারাপেটের সমান্তরাল রেখাগুলি বিলীয়মান বিন্দুব দিকে দূরে গিয়ে মেশে নি—দর্শকের দিকে যেন এসে মিশতে চায়। পরিপ্রেক্ষিতের সংজ্ঞা অনুযায়ী এ-কে ক্রটি ছাড়া আর কি বলা যাবে ?

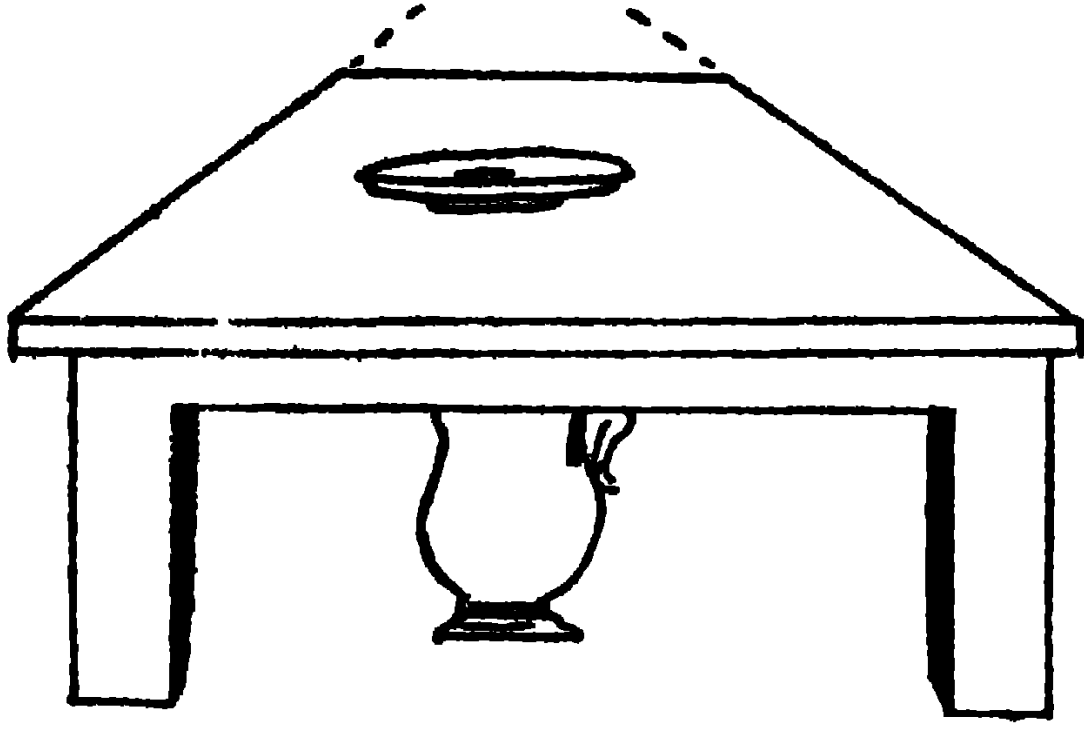
এই আপাত-অসঙ্গতির সমাধান হিসাবে আমরা তিনটি যুক্তি দাখিল করতে পারি। এক, ধরে নিতে পারি অজ্ঞতা-শিল্পী পরিপ্রেক্ষিতের আইন-কানুন জানতেন না। দুই, ধরে নেওয়া যায়, অজ্ঞতা-শিল্পী এটা জানতেন কিন্তু খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না। তিন, শিল্পী সজ্ঞানে এই আপাত-বিকৃতি ঘটিয়েছেন বিশেষ কোন কাবণে।

প্রথম প্রস্তাবটাকে আমরা সবাসবি পরিত্যাগ করতে পারি। চিত্রশিল্পেব অগ্ন্যাগ্নি বিষয়ে যাবা অদ্ভুত পবাকাস্থা দেখিয়েছেন, পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে তাঁদের এই প্রাথমিক ধারণা ছিল না—এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া, অসংখ্য ক্ষেত্রে তাঁরা পরিপ্রেক্ষিতের বিজ্ঞান-সম্মত নির্ভুল প্রয়োগ করেছেন। না জেনে তাঁরা তা কেমন করে কবাবেন ? দ্বিতীয় প্রস্তাবটাও ঐ একই কানণে বাতিল করতে হচ্ছে। চিত্রের বড়ঙ্গ-সম্বন্ধে যাবা এত বেশী যত্নশীল, যাদের হাতের কাজ একেদাবে নিখুঁত, তাঁরা পরিপ্রেক্ষিত বিষয়েই বা কেন অযথা এমন অসাবধানী হবেন ?

প্রশ্ন হতে পারে, তবে জেনেশুনেই বা তাঁরা এ ভুল কবলেন কেন ?

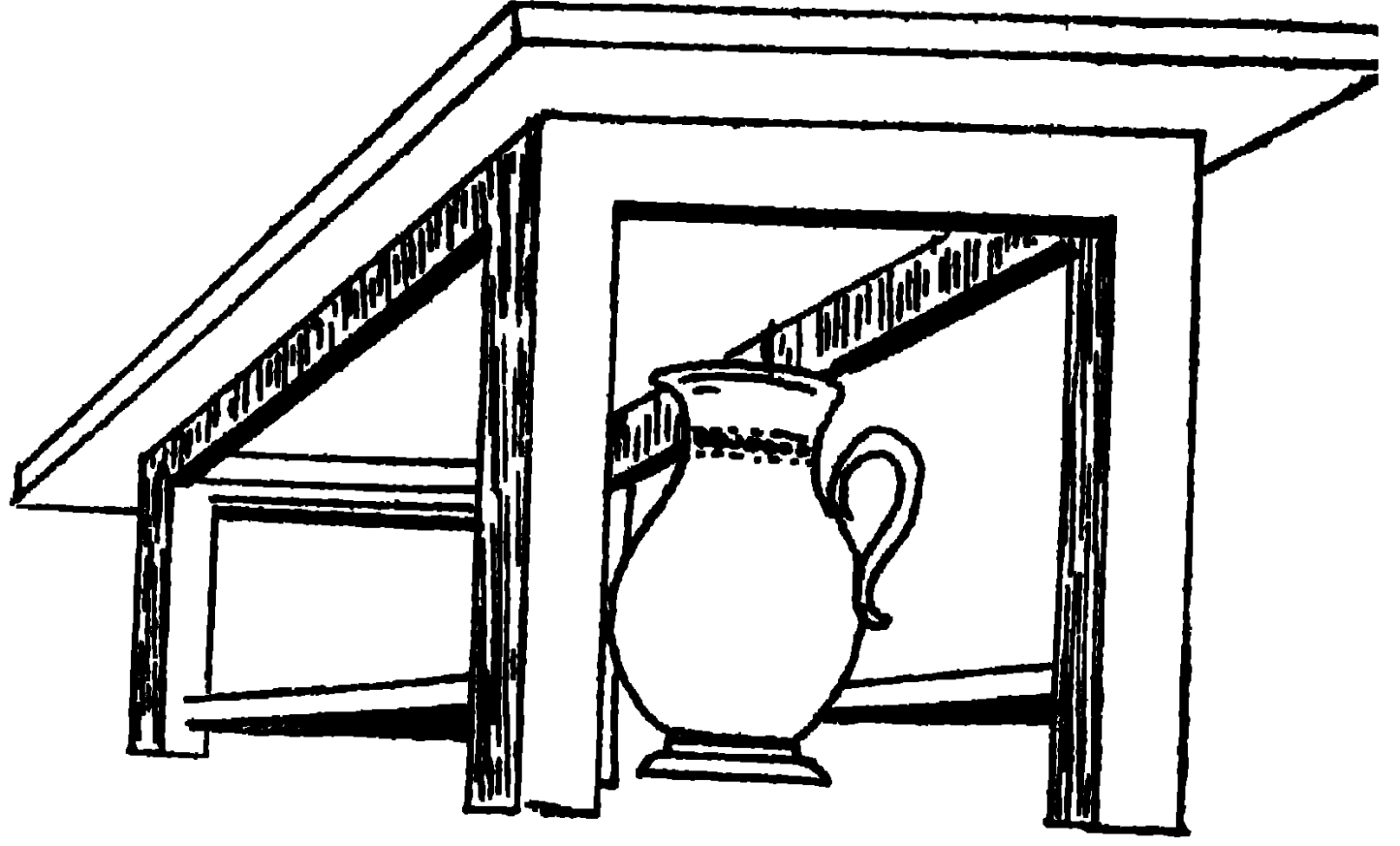
তাঁর প্রতিপ্রশ্ন হিসাবে আমি বলব, জেনেশুনে কি প্রচলিত নীতিকে যুগে যুগে শিল্পী লঙ্ঘন কবেন নি ? পোলকের 'এ্যাবস্ট্রাক্ট এক্সপ্রেসানিসম্' অথবা পল সেজানের 'পোস্ট-ইম্প্রেসানিসম্' যদি আজ থেকে হাজার বছর পবে কোন চিত্র-সমালোচকের নজরে পড়ে, তবে সে-ও তো বলবে পোলক ও সেজান পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। শিল্পী যামিনী রায়কে হাজার বছর পবে কোন চিত্র-সমালোচক তো অনায়াসে মিশরীয় চিত্রকরদের সমকালীন বলে মনে করতে পাবেন, যেহেতু যামিনী বায়েব চিত্রে সামনে-ফেরা মুখে পাশ-থেকে-দেখা চোখ ঝাঁকতে দেখা গেছে ! ষোড়শ শতাব্দীর চিত্রকর পারমিগিয়ানিনো (Francesco Parmigianino) যে দীর্ঘগ্রীবা ম্যাডোনার চিত্রটি একেছিলেন 'ম্যানারিসম্'-এর খাতিরে, সেটি দেখেও তো আমরা বলতে পারি, চিত্রকর স্ত্রীলোকের গ্রীবা কত লম্বা হয়—এ সামান্য কথাটিও জানতেন না। গত শতাব্দীর 'ইম্প্রেসানিস্ট' এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ডাডাইস্ট' ও 'সাররিয়ালিস্ট' চিত্রকররা জ্ঞাতসারে প্রচলিত চিত্র-রীতিকে যে কত ভাবে পরিবর্তিত করেছেন, তা তো আমরা চোখেব উপবেই দেখেছি। আধুনিক চিত্র-রীতিতে তো পরিপ্রেক্ষিত একেবাবেই অপাংক্তেয়। তার মানে কি এঁরা কেউ পরিপ্রেক্ষিতের প্রচলিত রীতি সম্বন্ধে অবহিত নন ? একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

মনে করা যাক, চিত্রকর দেখাতে চান একটি টেবিলের উপর একটি প্লেট রাখা আছে, যাতে সুন্দর নকশা-কাটা, আর দেখাতে চান যে, টেবিলের নিচে রাখা আছে, একটি ফুলদানি। ‘দৃষ্টিভঙ্গ’ গুরুডাবলোকনের দিকে নিয়ে গেলে (চিত্র—৩০) প্লেটের নকশাটা দেখানো যায়, কিন্তু ফুলদানিটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। অপরপক্ষে, দৃষ্টিভঙ্গ নামিয়ে এনে যদি



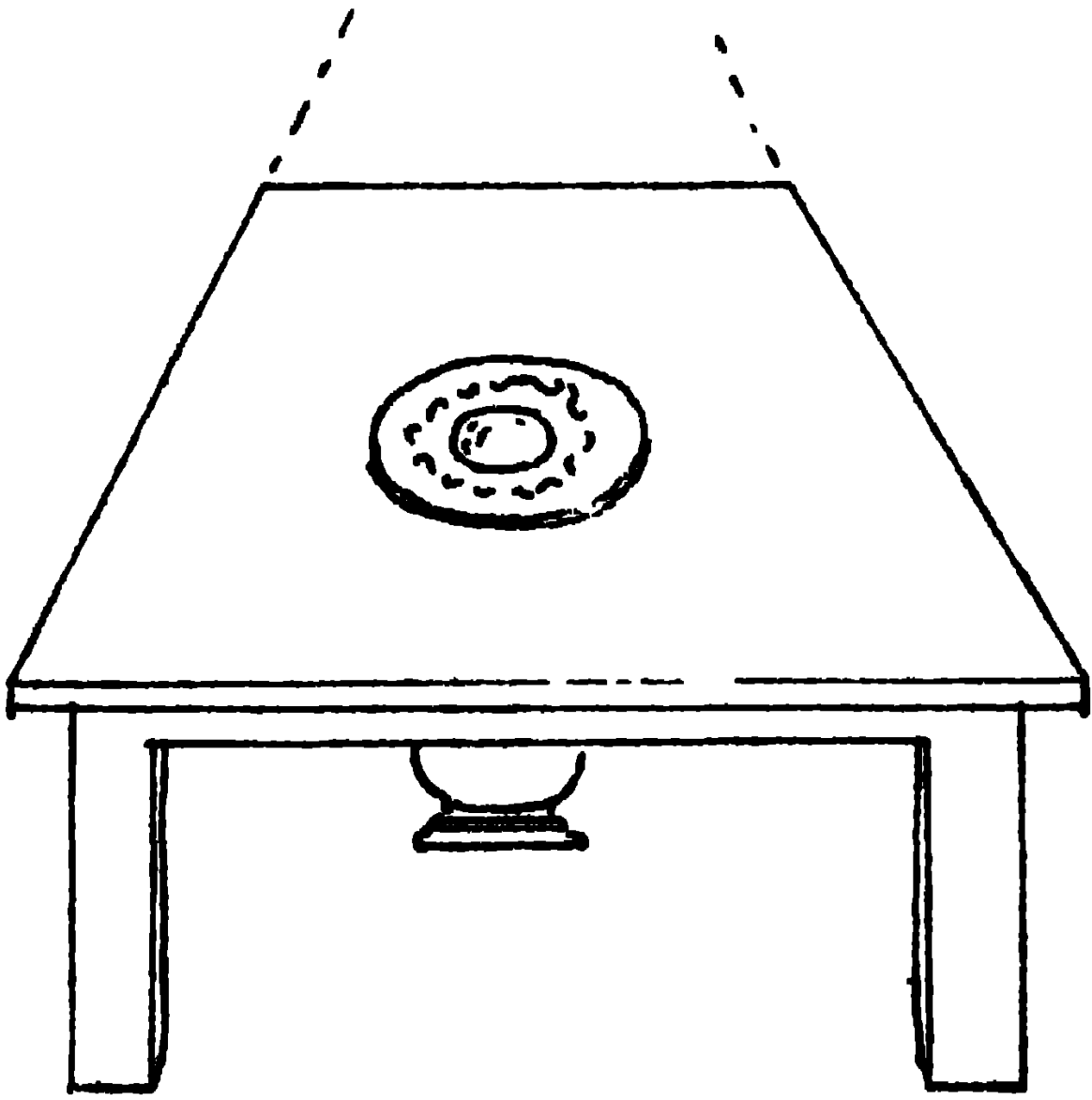
চিত্র—২৮

প্লেট ও ফুলদানি—সাধারণ দৃষ্টিতে



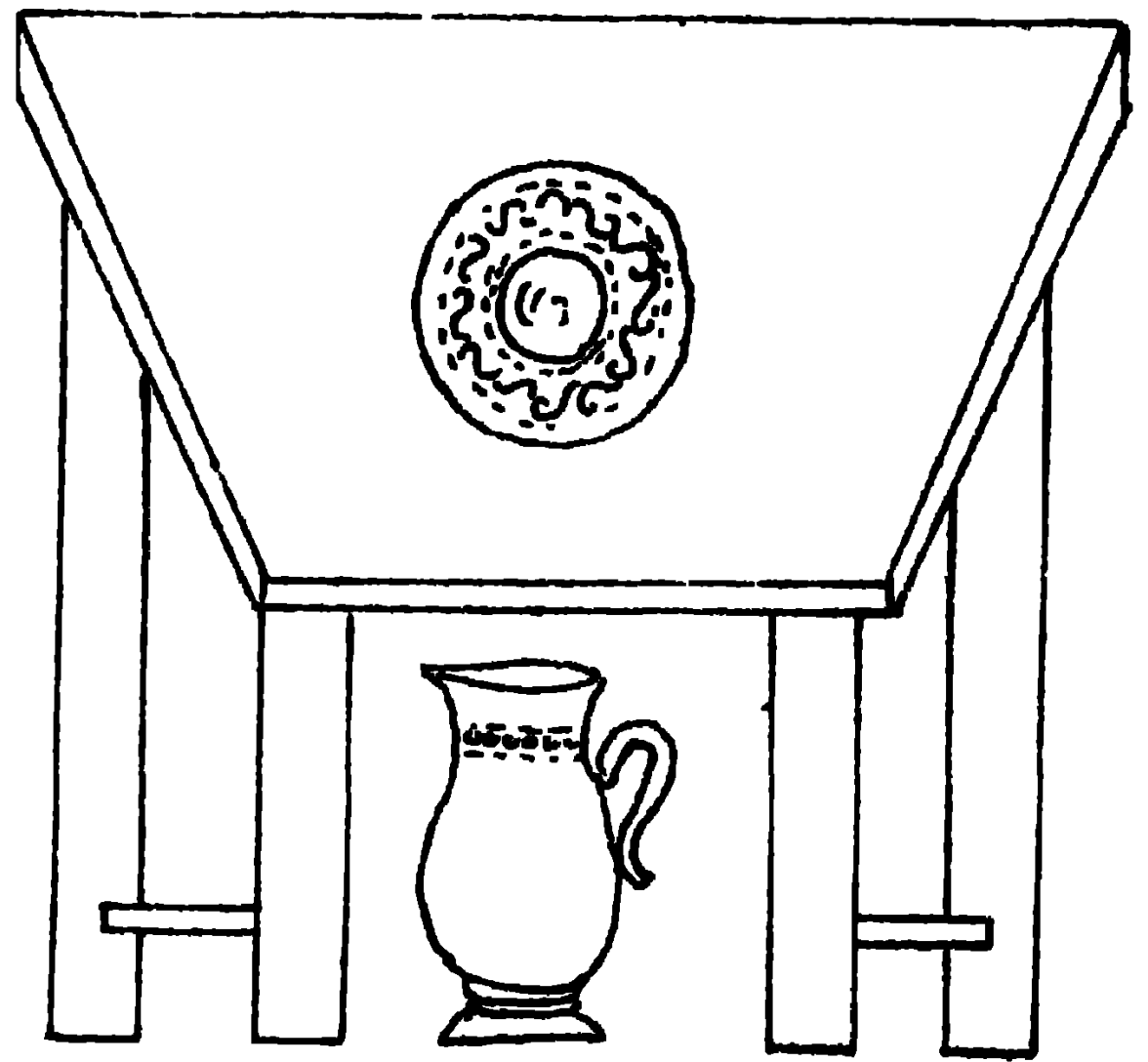
চিত্র - ২৯

প্লেট ও ফুলদানি পতঙ্গদৃষ্টিতে



চিত্র—৩০

প্লেট ও ফুলদানি—গুরুডাবলোকনে



চিত্র—৩১

প্লেট ও ফুলদানি—প্রাচ্য পরিপ্রেক্ষিতে

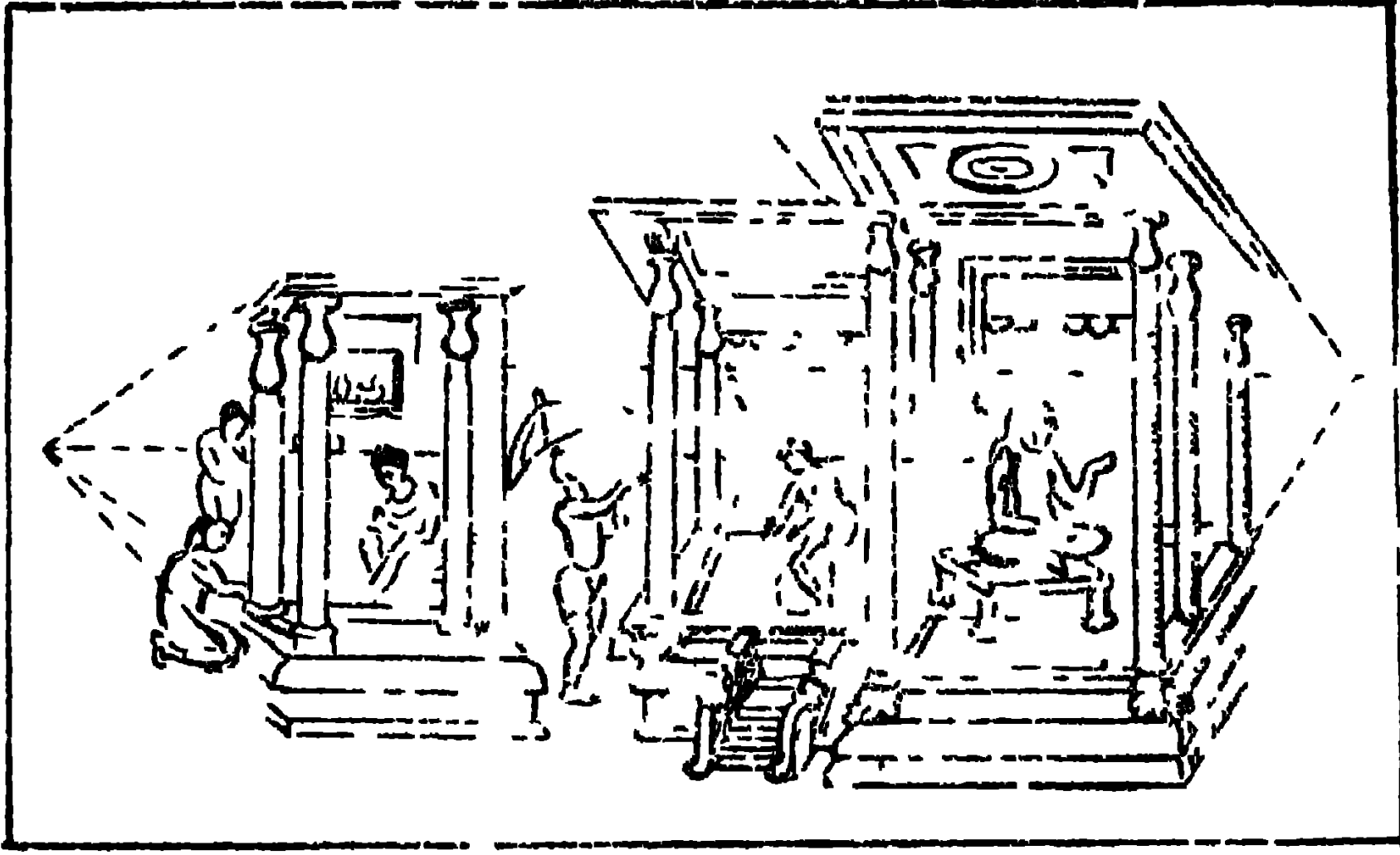
‘পতঙ্গদৃষ্টি’তে ছবিটাকে আঁকতে বসি, তখন ফুলদানিটা স্পষ্ট হয় বটে, প্লেটটা হারিয়ে যায় (চিত্র—২৯)। এবার যদি দৃষ্টিটা ছবির দৃষ্টিভঙ্গের মাঝামাঝি রাখি, তাহলে দেখছি, ফুলদানি ও প্লেট দুটোই দেখা যাচ্ছে; কিন্তু প্লেটের নকশাগুলি ভালভাবে আঁকা যাচ্ছে না (চিত্র—২৮)।

এবার যদি পরিপ্রেক্ষিতের প্রচলিত পাশ্চাত্য সংজ্ঞাকে বিসর্জন দিয়ে প্রাচ্য রীতিতে ছবিখানি আঁকতে বসি? তাহলে দেখছি (চিত্র—৩১) ফুলদানি এবং প্লেটের নকশাকে

একই চিত্রে ঐক্য সম্ভব হচ্ছে, যদিচ ছবিটা আলোকচিত্রের মত বাস্তবানুগ মনে হচ্ছে না।

প্রায় এই জাতীয় সমস্তাই সম্মুখীন হতে হয়েছিল অজন্তার চিত্রকরকে। আমার ব্যক্তিগত ধারণা, এজন্তাই তিনি এ-সব স্থলে প্রাচ্য-পরিপ্রেক্ষিতের নূতন ধারায় কোন কোন চিত্র ঐকেছেন। একটা উদাহরণ নেওয়া যাক :

অজন্তা-চিত্রে পরিপ্রেক্ষিত-সম্বন্ধে আলোচনাকালে বিখ্যাত ফরাসী চিত্র-সমালোচক শ্রীমতী জান ওবোআইয়ে^১ যে উদাহরণটি নিয়ে আলোচনা করেছেন, আমরা সেটিকেই মান হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। চিত্রটিতে পাশাপাশি তিনটি সভামণ্ডপ আছে। এটির অবস্থান ১।৭ এবং ১।২২। সর্বদক্ষিণে মহাজনকের (?) অভিষেক-স্নানের দৃশ্য; মাঝেব মণ্ডপে সীবলীকে (?) স্নান করানো হচ্ছে এবং সর্ববামেব মণ্ডপে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে কয়েকটি



চিত্র—৩১

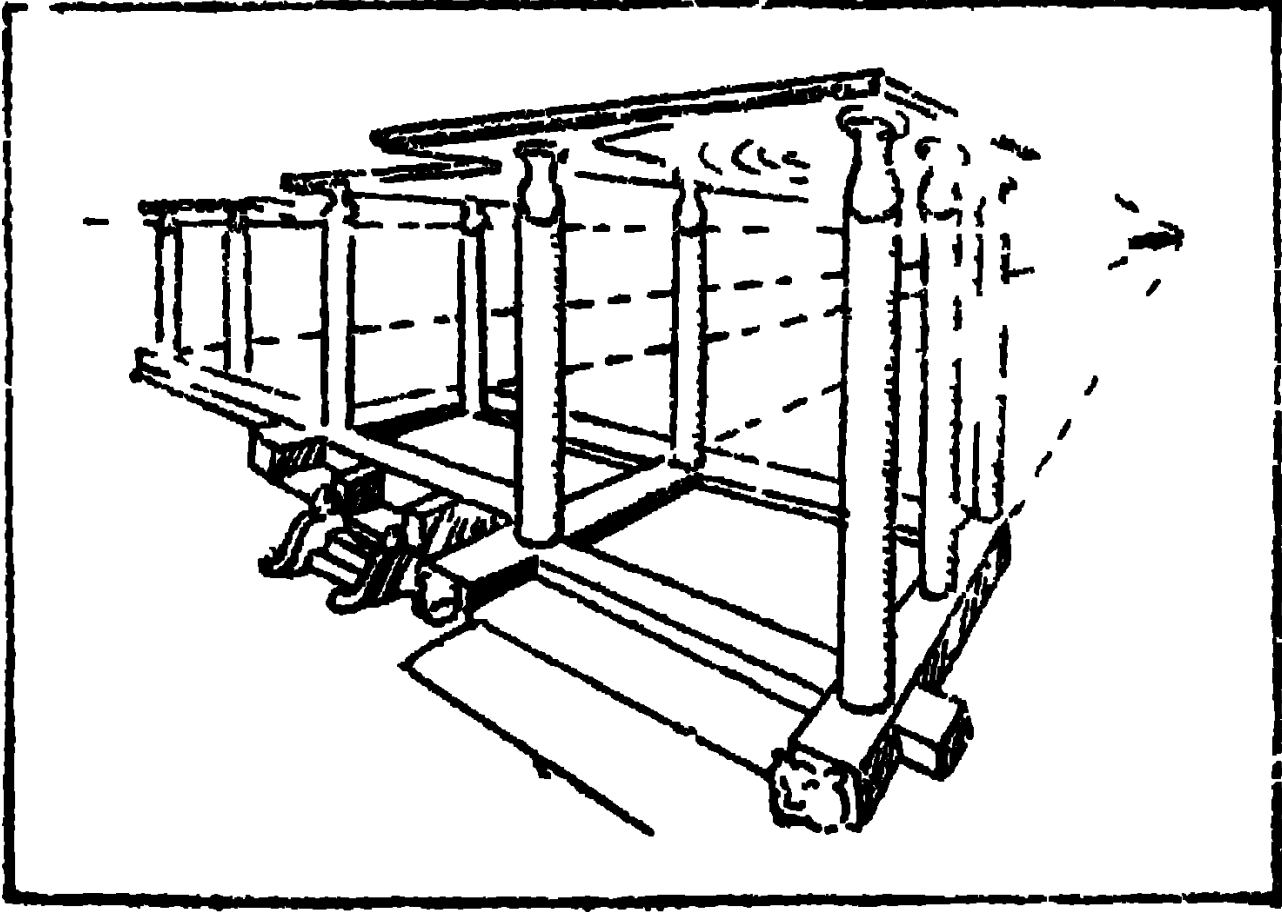
প্রাচ্য-পরিপ্রেক্ষিতের বীতি অনুসারে ঐক্য মণ্ডপত্রয়, অবস্থান — ১।২২ ও ১।৭

স্ত্রীলোক অর্ঘ্য দান করছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মণ্ডপেব মাঝখানে, পথে কয়েকজন ভিক্ষু (অভিষেক-) দান গ্রহণ করছে। অজন্তা-শিল্পী বিষয়-বস্তুটা যেভাবে ঐকেছেন, তার চুম্বক চিত্র এখানে চিত্র—৩২-এ দেওয়া গেল। লিওনার্দো-নিদেশিত পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিত মেনে ঐক্যে এবং সর্বদক্ষিণের মণ্ডপের সামনে থেকে ঐক্যে মণ্ডপ তিনটিকে চিত্র—৩৩-এর মত দেখাবে।

নিঃসন্দেহে চিত্র—৩৩ অনেক বেশী বাস্তবানুগ, - ফটোগ্রাফিক! চিত্র—৩২-এ ‘দৃষ্টিতল’ বদলে গেছে, আর বিলীয়মান বিন্দু তো বাবে বাবে স্থান বদলেছে। শ্রীমতী ওবোআইয়ে বলছেন—“এই বিভ্রমটি ঘটেছে তার কারণ শিল্পী সত্যিকারের কোন বাড়ী দেখে ঐক্যে নি বা নকল করেন নি। বাড়ীর রূপটি মানসচক্ষে দেখে তার প্রতিটি খুঁটিনাটি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।”

(১) “Composition & Perspective at Ajanta”, Art and Letters, India & Pakistan, Vol. 22, No. 1. London, 1948—by Jeanne Auboyer.

আমার মনে হয়েছে, কারণটা তা নয়। শিল্পী সজ্জানে সম্মুখ-চিত্র বা মণ্ডপত্রয়ের ফাসাদ আঁকবার সময় জমির সমান্তরাল বেখাগুলিকে বিলীয়মান বিন্দুর দিকে তেরছা কবে আঁকেন নি। কেন আঁকেন নি, তা উপলব্ধি কবা যায় চিত্রেব মূল বিষয়-বস্তুব কথা চিন্তা করলে। শিল্পী তিনটি মুখ্য ফিগব আঁকতে চেয়েছেন। ফলে, পাবম্পেকটিভেন ব্যাকরণ



চিত্র - ৩৩

পাশ্চাত্য বীতিতে ডাকা মণ্ডপত্র

মানতে গিয়ে তিনি মণ্ডপ-ফাসাদেব বিস্তার কমাতে বাজী নন। এমনকি সর্ববামেব মণ্ডপেব কাছে গিয়ে তিনি সচ্ছন্দে বিলীয়মান বিন্দুটিকে উল্টো দিকে সরিয়ে নিয়েছেন অর্থাৎ, চিত্রকব যেন স্থির নন, এক-একটি স্থান থেকে যেন এক-একটি মণ্ডপ তিনি ঠাকোড়ন, দর্শক যেন চিত্রেব বাজো প্রবেশ কবে ঘুরে ঘুরে মণ্ডপগুলিকে দেখতে পাচ্ছেন। তা হলে গলিপথে-দাঁড়ানো ভিক্ষুদেব ডাকা যাবে কেমন

কবে? বোধ ভিক্ষু চরণে অঘাটনকানী মহিলাবৃন্দেব সঙ্গেই বা দর্শকদেব বেমন কবে পরিচয় কবিয়ে দেবেন চিত্রকব। আজকেব চলচ্চিত্রেব ভাষায় বলতে পারি, ঐ মণ্ডপত্রয়েব বিভিন্ন ঘটনা একই সিনোয়েসেব অংশ হ'ল, বস্তু সেটিকে কপাখিত করতে অজ্ঞতা-শিল্পেব কামেবাম্যান তিন-তিনবার ওব স্যামেব স্থান বদলেছেন, তিনটি বিভিন্ন স্ট নিশ্চয়।

ব্যাকরণ কি? প্রচলিত সাহিত্য-বীতিব সম্বলিত মূলমন্ত্র বৈ তো নয়? কিন্তু ব্যাকরণ সাহিত্যেব অনুগ, তার পদাঙ্ক অনুসারী। দৃষ্টা যখন সৃষ্টিব তাগিদে ব্যাকরণ-বহিষ্ঠুত কোন শব্দ বা বাক্য বচনা কবেন, তখন বেব্যাকরণেব সন্ধানে ও মেনে নিয়ে বলেন—এ হল ‘আম প্রয়োগ’ অধ্বন-বীতিও প্রয়োজনেব তাগিদে বদলাতে পারে। আর্কিটেক্ট যখন বাড়ীর পরিকল্পনা আঁকেন, তখন তিনি বিলীয়মান বিন্দুব বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি সহ্য কবেন না। কিন্তু বাস্তব যখন তার বাড়ীর ‘এলিভেশান’ বা ‘সাইড-ভিউ’ আঁকেন, তখন বিলীয়মান বিন্দু বিলীন হয়ে যায়। চিত্রকব যদি তখন এসে বলেন—ওহে বাপু বাস্তব, তোমাব এ ছবি লিওনার্দো-নিদেশিত সূত্র হিসাবে আগাগোড়া ভুলে ভরা। কোথায় তোমাব আই-লেভেল? কোথায় ভ্যানিসিং পয়েন্ট? বাস্তব যখন তার জবাবে বলবেন—মশাই, এ হল সাদৃশ্যিক চিত্র, বিশেষ জগত্বেব চিত্র। বাস্তব জগতে এ-চিত্র একটি বিশেষ কাজ সম্পাদন কববার প্রয়োজনে আঁকা হয়েছে, তাই এব ব্যাকরণও পৃথক।

অজ্ঞতাব শিল্পীও ঠিক ঐ কথাই বলবেন। এখানে কোন ‘বিক্রম’ বা anomaly নেই। এ-চিত্রও একটি বিশেষ প্রয়োজনে আঁকা হয়েছে। তাঁব চিত্র এখানে তিনটি ঘটনাকে

একই চিত্রের পবিসবে দেখাতে চায়। ভক্তি ও ভাববসের আবেদনই এখানে মুখ্য, চিত্রের ব্যাকবণ-সূত্র গৌণ। শিল্পের প্রয়োজনে তাই শিল্পী নূতন ব্যাকবণ-সূত্র নির্দেশ করতে চান। সে সূত্র এইঃ মণ্ডপ তিনটির সামনের দিক বা ফাসাদ আঁকবার সময় নিছক 'এলিভেসান' আঁকা হবে, তখন বিলীযমান বিন্দু অপাংক্কেয় এবং পাশ আঁকবার সময় বিষয়-বস্তুর প্রয়োজনে বিলীযমান বিন্দু ইচ্ছানুসাবে সরানো যাবে।

এই নূতন সূত্র প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই একই চিত্র তিনটি মণ্ডপে তিনটি দৃশ্য এবং গলিপথে আরও একটি দৃশ্য আঁকা সম্ভবপর হয়েছে। লিওনার্দো-নির্দেশিত পঞ্চাশ চিত্র—৩৫-এর সঙ্কুচিত পবিসবে এই বিষয়-বস্তুগুলি একত্রে থাকা অসম্ভব।

ওবোআইয়ে অবশ্য তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে এ সত্য স্বীকার করেছেন, Here there is a certain proof that Indian artists, unlike their western counterparts, did not attempt to reproduce what they saw as they saw it, but rather as they knew it to be from a mental picture in which it appeared with its essential characteristics.

প্রাচ্য-পারস্যের কীভাবে কণ্ঠবেখা বা ডায়াগোনাল-গুলি দৃশ্যবস্তু থেকে বেবিয়ে আমাদের চোখে এসে মেশে। অর্থাৎ, চোকন যে প্রান্তটা আমাদের কাছে আছে, সেটাকেই আমরা ছোট দেখি, দূরের প্রান্তটা বড় দেখি। এ-জাতীয় পবিকল্পনা অজস্রায় অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু আমার মনে পড়ে, শিল্পী অবিকারিত ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজনেই এ নীতি অনুসরণ করেছেন—নিছক বাস্তব মনে চলাব জন্ম নয়। যেমন ধরা যাক, বিনব পাণ্ডিত্য জ্ঞানকে সেখানে গুণাবণ ইন্দ্রপদবাজ পাশা খেলতেন, সেখানে পাশার মেডটিকে প্রাচ্য বীতিতে আঁকা হয়েছে (অনুমান ১৫০০)। তাঁর জন্ম পাশার ছকটিকে গাবিকার দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, যেন শিল্পী উপর থেকে পাশার ইনবের প্ল্যান এঁকেছেন, অথবা বলা যায়, পাশার ছকটা যেন টেবিল থেকে খাড়া হয়ে দাড়িয়ে উঠেছে। এটি কেন করেছেন শিল্পী? করেছেন এজন্য যে, ঐ পাশার ছকটি এই খণ্ডদৃশ্যে সবচেয়ে জরুরী জিনিস, তাই কাহিনী-চিত্রের প্রয়োজনের দিক থেকে পাশার ছকটিকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে। এ দৃশ্যে কাহিনীটি তখন ঐ পাশার ডকেব পাবে পাবে ফিবছে। পাশ্চাত্য-পরিপ্রেক্ষিতের আইন অনুসারে আঁকতে গিয়ে ঐ অক্ষকৌড়ার ডককে শিল্পী ছোট করে দেখাতে বাজী নন। তাই এ প্রাচ্য বীতির অনুসরণ।

আরও ভাল একটি উদাহরণের উল্লেখ করা যায়। বাস্তবে চিত্রটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এ বসোপলন্ধি করতে হলে গিফিথ সাহেবের ছুপ্রাপ্য মূল গ্রন্থটি আপনাকে দেখতে হবে।

চিত্রের বিষয়-বস্তু—যশোধবা ও বাজুলকে শযায় বেখে বুদ্ধদের গৃহত্যাগ করছেন। সেখানে শিল্পী দেখাতে চান পালঙ্কের উপর যশোধবা শায়িতা এবং দেখাতে চান পালঙ্কের নিচে কিছু তৈজসপত্র। পাশ্চাত্য বীতিতে আই-লেভেল উঁচুতে ধবে, গকড়াবলোকন হবে

শিল্পী দেখেছেন নিদ্রামগ্না গোপাকে আঁকতে অশ্রুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু ঢাকা পড়ে যাচ্ছে পালঙ্কের নিচে তৈজসপত্র। কিন্তু শিল্পী তাতে রাজী নন; কারণ, ঐ তৈজসপত্রের মধ্যে ছুটি জিনিস যে তাঁকে আঁকতেই হবে। একটি ছিন্নতার বাতায়ন এবং একটি নির্বাপিত-দীপ দীপাধার! এ ছুটি তো সামান্য তৈজসপত্র নয়, এ যে তাঁর চিত্রের আবশ্যিক অঙ্গ; ঐ নির্বাপিত-শিখা দীপাধারটি যে এ চিত্রের অন্তর্গত বেদনার মূর্ত প্রতীক! ঐ ছিন্নতার বীণাটি যে সুপ্রবুদ্ধতনয়া যশোধরার ত্রয়োদশ বর্ষব্যাপী দাম্পত্য জীবনের অবসানের চোতক। ও ছুটি চাই। শিল্পী পাশ্চাত্য বীতিতে আই-লেভেল নামিয়ে এনে দেখেছেন— ও ছুটিকে আঁকা যাচ্ছে বটে, কিন্তু নিদ্রাভিভূতা মন্দভাগিনী যশোধরার দেহটি ছোট হয়ে যায়, সঙ্কুচিত হয়ে যায়। শিল্পী এ-ছুটি বিষয়-বস্তু কোনটিকেই খাটো করতে রাজী নন; ফলে, ত্যাগ করলেন ঐ নির্ভুব পশু পাশ্চাত্য-পারম্পর্যকৃষ্টিভেব ব্যাকরণ-সূত্রে। প্রাচ্য রীতিতে ছবিটি আঁকলেন তিনি। বিলীযমান বিন্দু ছুটিকে সরিয়ে আনলেন দূর দিগন্ত রেখা থেকে সম্মুখের দিকে, দর্শকের দিকে। এইভাবে পালঙ্কের উপরে নিদ্রিতা যশোধরা এবং নিচে নির্বাপিত-শিখা দীপাধার ও ছিন্নতার বীণাকে একই দৃশ্যপটে আঁকা গেল!

স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল যেন শিল্পীর এতক্ষণে!

এ পরিচ্ছেদের শেষ পর্যায়ে আর একটি কথা বলব। শিল্পীরা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ: কিন্তু মনে হয়, হিন্দু শিল্প-শাস্ত্রকারদের মূল নির্দেশ তাঁরাও মেনে চলতেন। সে শাস্ত্র বলে, ‘শিল্পানি সংসৃতি দেব-শিল্পানি।’ সমস্ত শিল্পই দেব-শিল্পের অন্তর্প্রেরণায়, সর্ব-শিল্পের মূলে দেব-শিল্প। ঐতন্যেয় ব্রাহ্মণ বলেছেন, ‘আত্মসংসৃতির্বা শিল্পানি ছন্দোময়ঃ বা ঐতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কৃতে।’ অর্থাৎ, এই দেব-শিল্পের দ্বারা যে লাভ হয় তা আত্ম-সংস্কৃতি। এই শিল্প-সাধনাই এক যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের মাধ্যমে যজ্ঞমান আপনাব আত্মাকে বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করে তোলেন।

অজস্রার শিল্পী সেই মহান শিল্পযজ্ঞের ঋত্বিক, তিনিই তাব হোতা। রঙ আর তুলি সে যজ্ঞের সমিধ্ আর তোমদণ্ড। শিল্পের পথে তিনি যুক্তির সন্ধান করেছেন—তিনি মুক্ত হয়েছেন, তাঁর পরমপ্রাপ্তি ঘটেছে।

স। মুক্তি— সাতিমুক্তিঃ।



তৃতীয় ও পঞ্চম গুহা-মন্দির দুটি অসমাপ্ত। পঞ্চম মন্দিরের প্রবেশ-পথে ছদিকে দুটি মকববাহিনী নাবীমূর্তি খোদিত। এ-দুটি বিহার সপ্তম শতাব্দীতে অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত। চতুর্থ বিহারটি আকারে বৃহত্তম। কেন্দ্রস্থলের চত্বরের মাপ ৮৭ ফুট X ৮৭ ফুট। সর্বসমেত আঠাশটি স্তম্ভ। প্রবেশ-পথে দেখছি ছোট ছোট চৌখুপিতে কয়েকটি খণ্ডদৃশ্য পাথরে খোদাই-করা—সিংহ, হস্তী, অগ্নি, সর্প ইত্যাদি আটটি আধিভৌতিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত মনুষ্যমূর্তি। শিল্পীর বক্তব্য, তথাগতের শরণ নিলে মব-মানুষ এই অষ্ট প্রকার দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। হল-কামবায় স্তম্ভগুলির পাদমূল চতুর্কোণ, মধ্যভাগ আট-কোণ। হলের সম্মুখে বারান্দার দুই প্রান্তে দুটি গর্ভমন্দির। হলের ভিতরেও দু-পাশে ছটি করে গর্ভগৃহ এবং পিছন দিকে আবও কয়েকটি গর্ভগৃহ। অন্তবালের সম্মুখবর্তী কেন্দ্রীয় স্তম্ভ দুটির অলঙ্করণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। মূল গর্ভমন্দিরে ধ্যানস্থমিত বুদ্ধমূর্তি, বসে আছেন পদ্মাসনে, ধর্মচক্রমুদ্রায়। দু-পাশে দুই বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধমূর্তির পদতলে ধর্মচক্র ও মৃগযুগল। অন্তবালের দুই প্রান্তে দুটি করে সর্বসমেত চারটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। ববদাহস্তমুদ্রা।

তৃতীয়, চতুর্থ ও
পঞ্চম বিহার

খণ্ডদৃশ্য পাথরে খোদাই-করা—সিংহ, হস্তী, অগ্নি, সর্প ইত্যাদি আটটি আধিভৌতিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত মনুষ্যমূর্তি। শিল্পীর বক্তব্য, তথাগতের শরণ নিলে মব-মানুষ এই অষ্ট প্রকার দুর্দৈবের

ষষ্ঠ গুহা-মন্দিরটি অজন্তায় একমাত্র দ্বিতল বিহার। এটি পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, একতলায় যোলটি এবং দ্বিতলে বারোটি স্তম্ভ আছে, এবং সেগুলি একটির মাথার উপর একটি নয়। তাব কাবণ, অজন্তায় ছাদের ভাব গ্রহণ করবার জন্য স্তম্ভগুলি নির্মিত হয় নি—পাথর কেটে এগুলিকে কপাষিত করা হয়েছে শুধু অলঙ্করণের

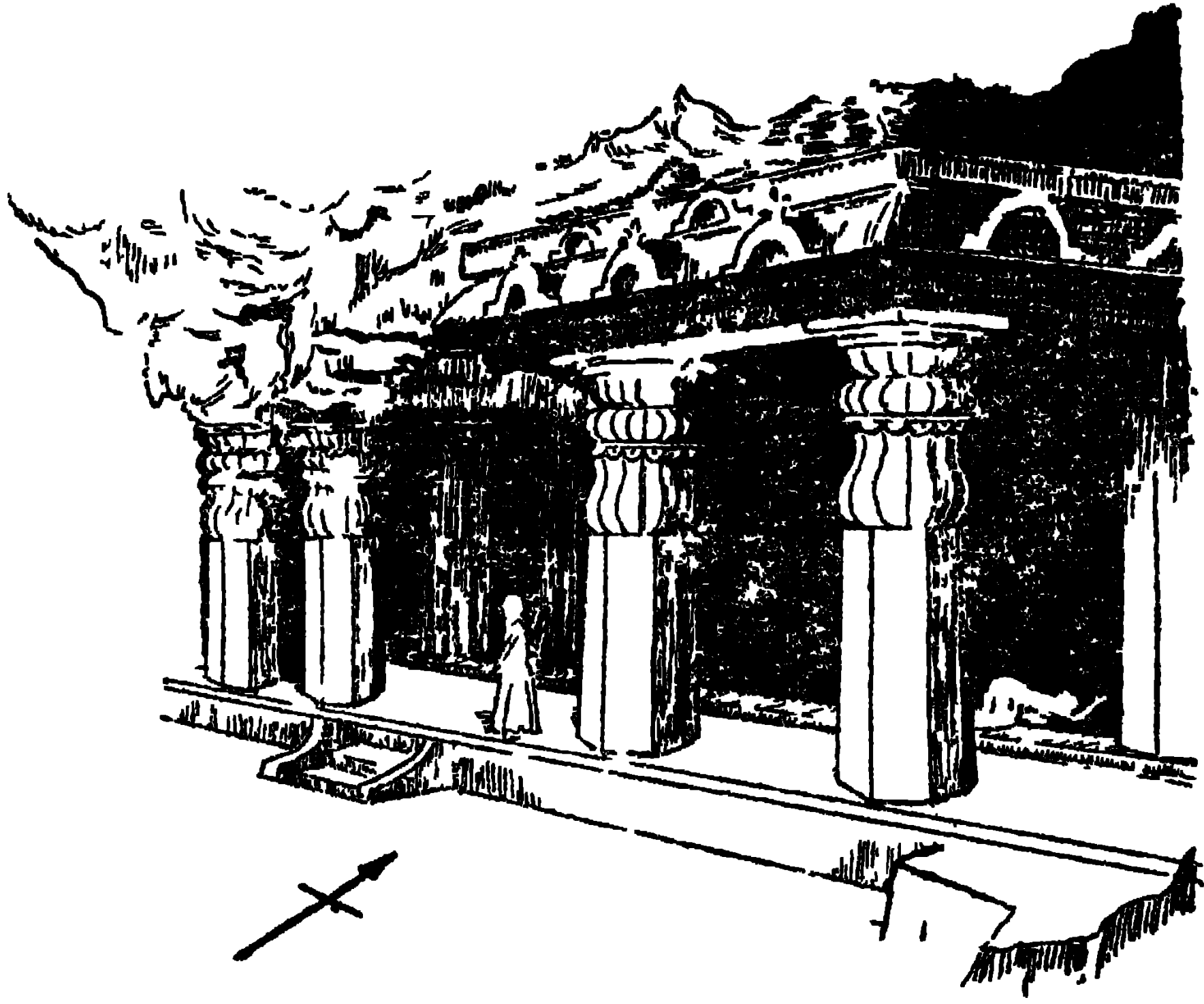
ষষ্ঠ বিহার

উদ্দেশ্যে। ফলে, স্তম্ভগুলি ভেঙে পড়লেও ছাদ ভেঙে পড়বে না।

বস্তুতঃ, অনেক গুহাতেই প্রথম আবিস্কারের সময় গত শতাব্দীতে দেখা গিয়েছিল অনেক স্তম্ভ ভেঙে গেছে ছাদ আছে অক্ষত। সপ্তম গুহার যে ছবিটি চিত্র—৩৫-এ দেওয়া হয়েছে, সেটি দেখলে ব্যাপারটা বঝতে পারবেন। ষষ্ঠ বিহারের প্রবেশ-পথের দুদিকে দুটি ছোট গর্ভগৃহ। একতলায় স্তম্ভগুলিতে কোন পাদপীঠ বা শীষপীঠ নেই। আট-কোণা স্তম্ভগুলি উপরদিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে উঠেছে। একতলায় অনেকগুলি ছোট ছোট গর্ভগৃহ আছে। এখানে এখনও কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্র নজরে পড়ে। অধিকাংশই নকশা—কিছু দ্বাবপাল, দু-একটি বুদ্ধমূর্তি বা বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও মারের সংগ্রামের একটি চিত্রও অল্প অল্প দেখতে পাওয়া যায়। একতলায় মূল গর্ভমন্দিরে সিংহাসনে উপবিষ্ট জাম্বব-মুদ্রায় বুদ্ধদেবকে এবং দ্বিতলের মূল গর্ভগৃহে ধর্মচক্রমুদ্রায় মৃগদাবের বুদ্ধদেবকে দেখতে পারেন। এছাড়া, অনেকগুলি প্রস্তর-মূর্তিও আছে এখানে।

সপ্তম বিহারটির পরিকল্পনায় মৌলিকতা আছে। এর সম্মুখ-ভাগে দুটি পোর্টিকো বা প্রবেশ-মণ্ডপ। এ-বকম জোড়া-পোর্টিকো অজন্তার অন্য কোনও গুহায় নেই। এলিফান্টা গুহার সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য মনে হল যেন। ভিতরে অন্তবালে শ্রাবস্তীর অলৌকিক

ঘটনাটি পাথরে খোদাই করা আছে। মূল গর্ভমন্দিরের প্রবেশ-পথে যে দ্বার, তার দু-পাশে দুটি মকব্বাহিনী নারীমূর্তি। মূল মূর্তিটি বুদ্ধদেবের। দু-পাশে চামবাহী দুই বোধিসত্ত্ব এবং উদ্ভীয়মান গম্বৰ্বমূর্তি। চিত্র—৩৪-এ সপ্তম বিহারের প্রবেশ-পথের একটি চিত্র দেওয়া গেল। এটি দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে আঁকা। এতে জোড়া-পোর্টিকোকে বেশ খাবিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। পূর্বাঙ্গের জোড়া-স্তম্ভের উপরে ছাদটিকে দেখা যাচ্ছে অক্ষত অবস্থায়, অথচ পশ্চিম দিকের ছাদ অনেক অংশ ভেঙে পড়েছে। এই প্রসঙ্গে বলি, অজন্মায় আমবা আজ গিয়ে যা দেখি, তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে মেবামতিব কাজ। আমার মনে হয়েছে, এভাবে মেবামত কবানো উচিত

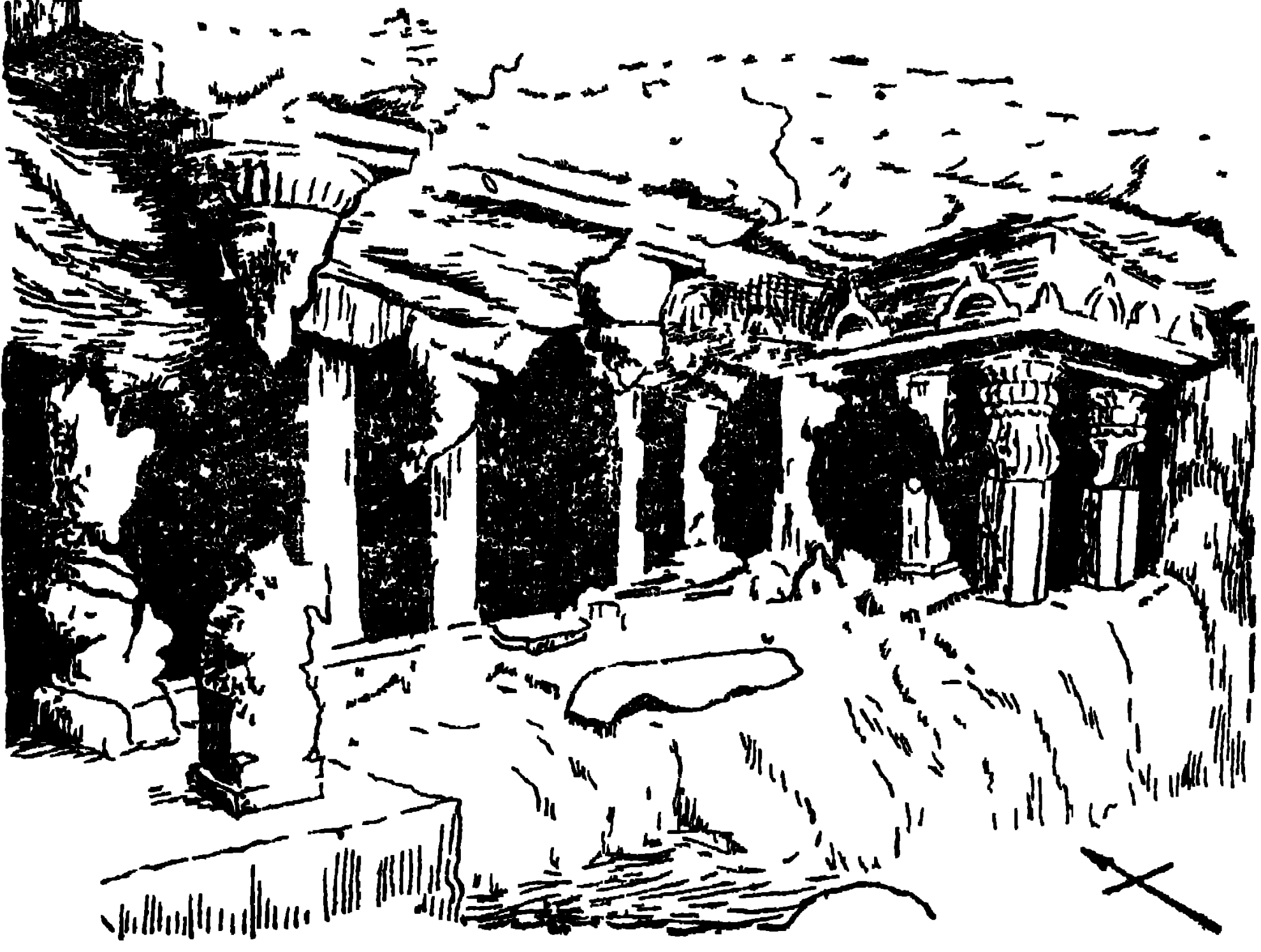


চিত্র—৩৪

সপ্তম বিহারের প্রবেশ-পথ
বর্তমান অবস্থা।

হয় নি। এমনভাবে ভেঙে-পড়া স্থাপত্য-কীর্তিগুলি সাবানো উচিত ছিল, যাতে দর্শক বুঝতে পাবেন কতটুকু অরিজিনাল বা আদিম রূপ, আর কতটুকু বর্তমান যুগের কারিগরি। মেবামতি-অংশে সিমেন্ট-গোলা দিয়ে অথবা অত্যন্ত হাল্কা চূনাপাথরের বণ্ড করে এই পার্থক্যটুকু বজায় রাখা যেত। এই নীতি আর্কিওলজিকাল-বিভাগ চিত্রগুলির মেবামতের সময় মেনে চলেছেন। প্রাচীর-চিত্রের যে অংশ ভেঙে পড়েছে, সেখানে নতুন করে আঁকবার চেষ্টা করেন নি। সিমেন্টের পলিস্টা বা করে ছেড়ে দিয়েছেন। ভালই করেছেন। আমি

খুশী হইতুম সেই নীতি ভাঙ্কর ও স্থাপত্য-কীর্তিতেও অনুসরণ করা হলে। আমার বড় বাটা বুঝিয়ে বলি : চিত্র—৩৪ হচ্ছে আমি অজন্তায় ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যা দেখেছি তাই, কিন্তু চিত্র—৩৪ দেখলে কি বুঝতে পারছেন কতটুকু অজন্তা-শিল্পীর কাজ আর এতটুকু এ-যুগের ? না, তা পারছেন না। এইরকম চিত্র—৩৫-এর দিকে চেয়ে দেখুন। এটি শিল্পী মুকুল দে-এর গ্রন্থ অবলম্বনে আঁকা। পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঐ প্রবেশ-পথেব যে রূপ তিনি দেখেছিলেন,



চিত্র—৩৫

সপ্তম বিহাবের প্রবেশ পথ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে) পঞ্চাশ বছর পূর্বের অবস্থা

তাই দেখতে পাচ্ছি। তিনি অবশ্য এঁকেছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে। চিত্র—৩৬ ও চিত্র—৩৫ মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, কতখানি মেঝামত করা হয়েছে বুদ্ধগয়াব মূল মন্দিরটি মেঝামত করতে গিয়ে যে ভুলটি করা হয়েছিল গত শতাব্দীতে, অজন্তাতেও প্রায় সেই জাতীয় ভুল করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

অষ্টম বিহাবটি বাস্তা থেকে কিছুটা নিচুতে। ঠিক সারকোটিব ধারে। দর্শনীয় কিছুই

অষ্টম বিহাব

নেই। এটি কিন্তু অজন্তার অন্যতম প্রাচীন গুহা। প্রায় নবম

শতাব্দীর সমসাময়িক। ভাষনামোটিকে এখানে বসানো হয়েছে—

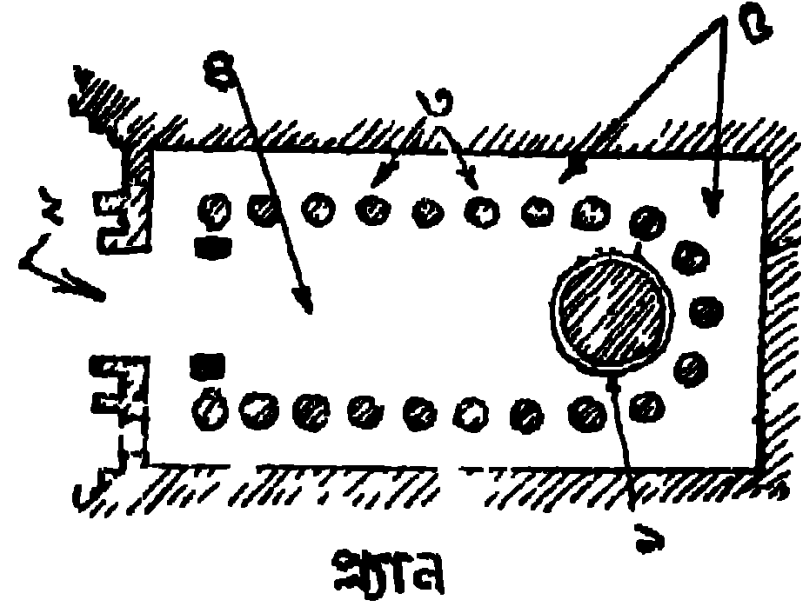
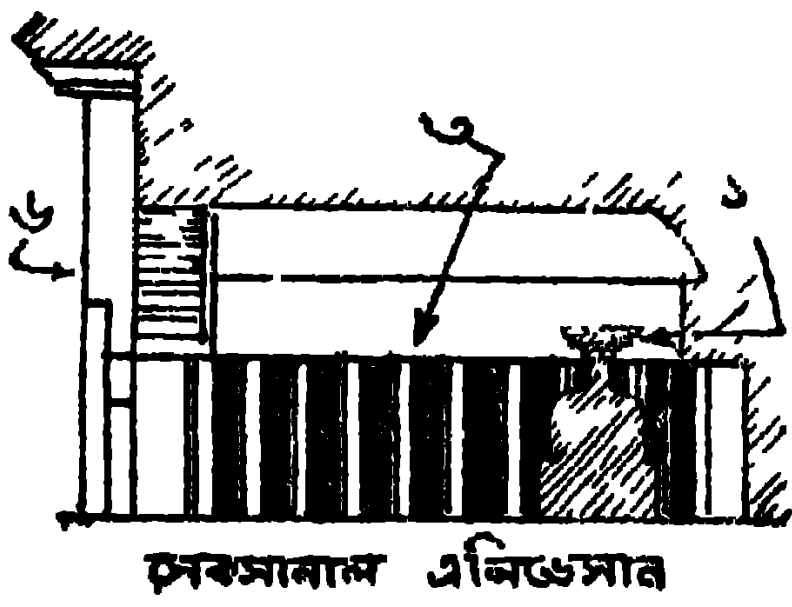
এখান থেকেই সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করা হয়।

নবম ও দশম গুহা-মন্দির দুটি, আগাই বলেছি, বিহাব নয়—চৈত্য। অর্থাৎ, বৌদ্ধ ভ্রমণদের আবাস-গৃহ নয়, উপাসনা-মন্দির। এ-দুটি অতি প্রাচীন গুহা-চৈত্য, অজন্তায়।

নবম গুহাটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত, দশমটি সম্ভবতঃ আরও প্রায় একশ বছর আগেকার, বস্তুতঃ অজস্রায় তৈরী প্রথম চৈত্যা।

নবম চৈত্যাটি দৈর্ঘ্যে ৪৫ ফুট, প্রস্থে ও উচ্চতায় ২৩ ফুট। তুলনায় দশম চৈত্যাটি অনেক বড় : দৈর্ঘ্যে ৯৫ ফুট, প্রস্থে ৪১ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৬ ফুট। চৈত্যাগুলির নির্মাণ-কৌশলের একটি বিশিষ্ট রীতি আছে। এর সম্মুখে থাকে বিশেষভাবে অলঙ্কৃত সম্মুখ-ভাগ বা 'ফাসাদ'। প্রবেশ-পথের দ্বারের উপরে থাকে একটি বৃহদায়তন গবাক্ষ। তাকে বলা হয় সূর্য-গবাক্ষ। হল-কামরাটি হয় লম্বাটে ধরনের। দু-পাশে দুই সারি স্তম্ভ, তার মাঝখানে উপাসনা-স্থল, যাকে ইংরেজিতে বলে 'নেভ' এবং স্তম্ভ ও পর্বত-গাত্রে মাঝখান দিয়ে যে গলিপথ তাকে বলে প্রদক্ষিণ-পথ, ইংরেজিতে বলে 'আইল'। এই চৈত্যাগুলির পবিত্রতার সঙ্গে বোমান 'বাসিলিকা'র আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে।

নবম চৈত্যা



চিত্র—৩৬

নবম চৈত্যের প্ল্যান ও এলিভেসান

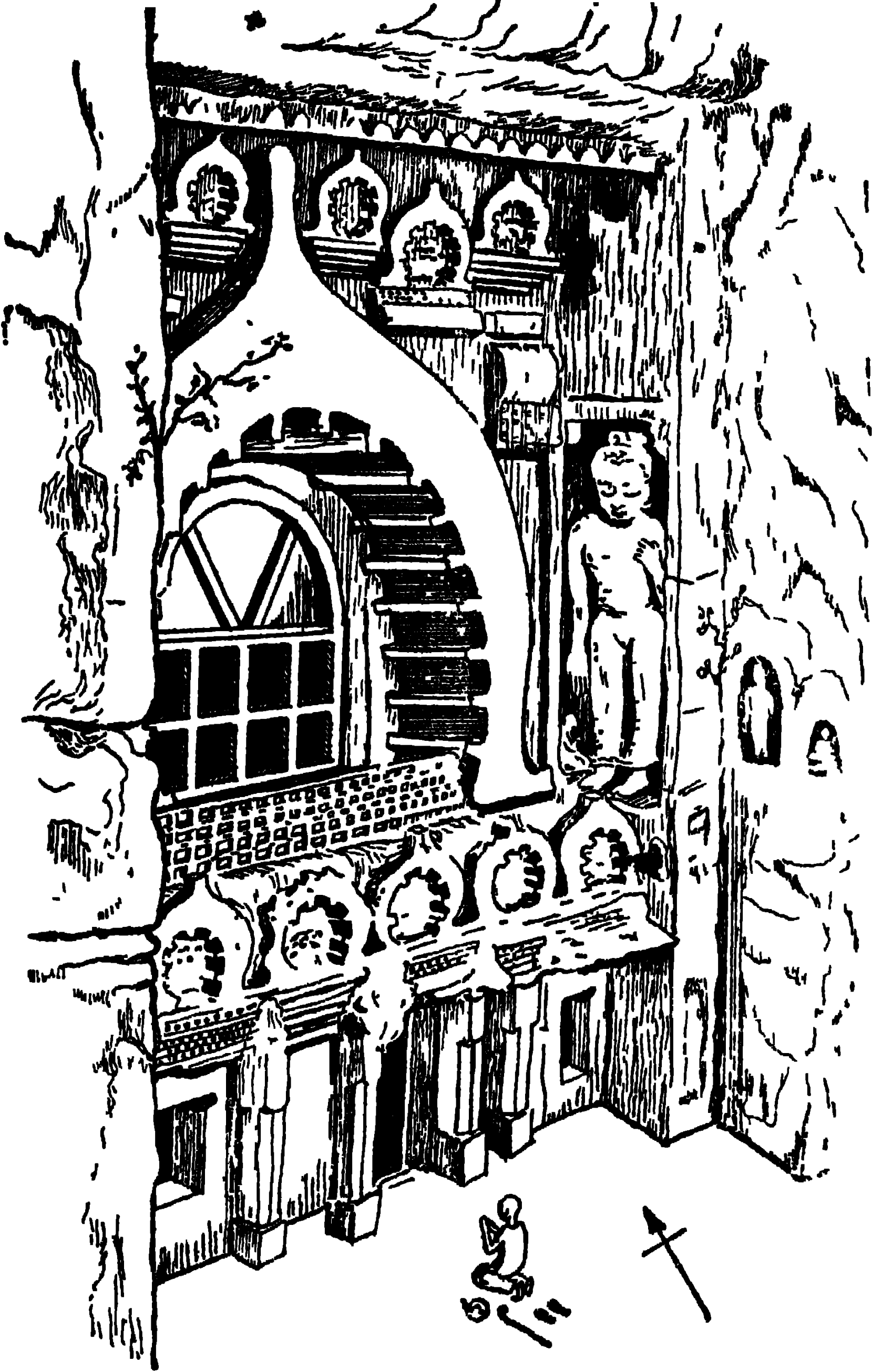
১—স্তম্ভ, ২—প্রবেশ-পথ, ৩—স্তম্ভ; ৪—উপাসনা-স্থল; ৫—প্রদক্ষিণ-পথ, ৬—সূর্য-গবাক্ষ।

চিত্র—৩৬-এ নবম চৈত্যের প্ল্যান ও সেক্সানাল এলিভেসান দেখানো হয়েছে। প্রবেশ-পথের (৯২) বিপরীত প্রান্তে রয়েছে স্তম্ভটি (৯১)। সর্বসমেত ২১টি আট-কোণা স্তম্ভ উপাসনা-স্থলকে (৯৪) বিযুক্ত করেছে প্রদক্ষিণ-পথ (৯৫) থেকে। প্রবেশ-পথের উপরে রয়েছে সূর্য-গবাক্ষটি (৯৬)। ঐ ২১টি আট-কোণা স্তম্ভ ছাড়াও প্রবেশ-পথের দুদিকে দুটি চার-কোণা স্তম্ভ আছে।

নবম গুহার সম্মুখ-দৃশ্য বা 'ফাসাদ'টির স্বরূপ বোঝাবার উদ্দেশ্যে এখানে একটি চিত্র সংযোজিত করা গেল। এই চিত্র- ৩৭ নবম গুহার বাহিরের পথ থেকে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আঁকা।

এখানে সূর্য-গবাক্ষটিকে ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। সূর্য-গবাক্ষের উপরে ও নিচে ছোট ছোট খিলানগুলিও ঐ সূর্য-গবাক্ষের অনুরণে খোদিত। প্রবেশ-পথের দু-পাশে দুটি, তারও পাশে আবার দুটি অর্ধ-স্তম্ভ বা পিলার্স্টার। এছাড়া, দুই প্রান্তে দুটি গবাক্ষও আছে। পূর্বদিকের প্রাচীরে দণ্ডায়মান বৃহদায়তন বুদ্ধমূর্তি এবং ছোট ছোট যে বুদ্ধমূর্তি দেখাছেন, এগুলি পরবর্তী যুগের সংযোজন। কারণ, এই চৈত্যাটি হচ্ছে হীনযান যুগের, তখন বুদ্ধমূর্তি

তৈরি করা হত না। হয়তো কয়েক শত বছর পরে এই মূর্তিগুলি খোদাই করে প্রবেশ-পথের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। চৈত্যের ভিতরে কিছু কিছু চিত্রের নিদর্শন আজও দেখতে পাওয়া যায়। বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি প্রভৃতি। এগুলিও পরবর্তী যুগের সংযোজন।



চিত্র—৩৭

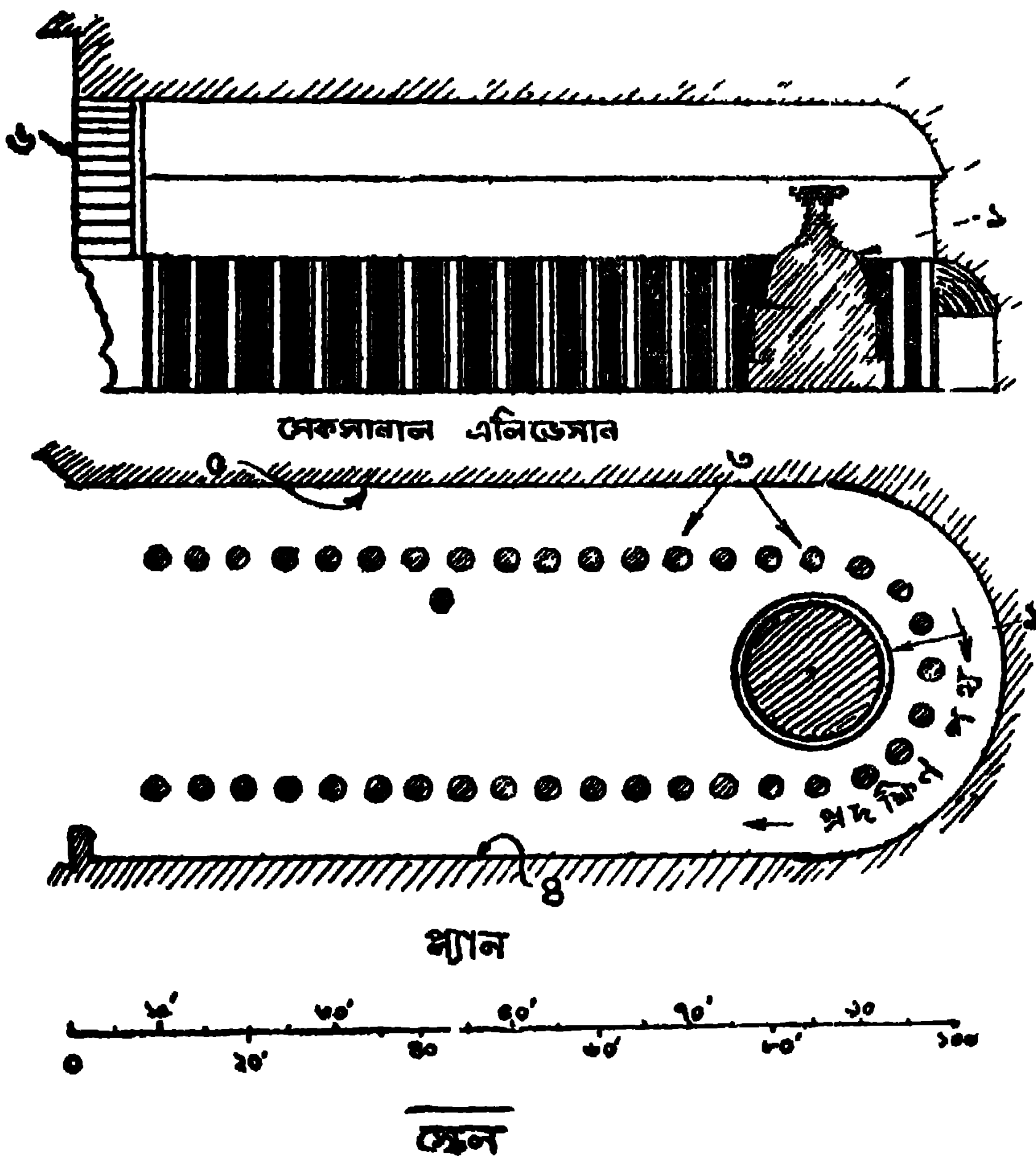
নবম চৈত্যের সম্মুখ-ভাগ বা ফাসাদ

নবম ও দশম চৈত্যের আলোচনায় ভারতবর্ষে গুহা-চৈত্য নির্মাণের বিবর্তনের কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। বস্তুতঃ, এ সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই আলোচনা করি নি। এখনও করব না—সেটি একটি বিশেষ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত হবার দাবি রাখে। আপাততঃ তাই এ দুটি চৈত্যে দর্শনীয় যা-কিছু আছে, তাই দেখে যাব আমরা।

দশম গুহা-চৈত্যটি অজস্র প্রাচীনতম চৈত্য, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর। আকারে এটি নবম গুহাব তুলনায় বেশ বড়; দৈর্ঘ্যে ৯৫ ফুট, প্রস্থে ৪১ ফুট এবং উচ্চতায় ৩৬ ফুট।

দশম চৈত্য

দশম চৈত্যের শেষপ্রান্তে গোলাকার, নবম চৈত্যের মত কোণ-বিশিষ্ট নয়। ভিতরে সর্বসমেত ৩৯টি আট-কোণা স্তম্ভ। প্রবেশ-পথে নবম গুহায় যেমন দুটি চতুর্কোণ স্তম্ভ আছে, এখানে তেমন কোনও স্তম্ভ নেই। চৈত্যপ্রান্তে স্তূপটি অলঙ্করণ-বর্জিত এবং আকারে বেশ বড়। চিত্র—৩৮-এ দশম চৈত্যের প্ল্যান ও সেক্সানাল এলিভেশান দেওয়া হয়েছে।



চিত্র—৩৮

দশম চৈত্যের প্ল্যান ও এলিভেশান

- ১—স্তূপ, ২—প্রবেশ-পথ, ৩ - স্তম্ভ, ৪—ছন্দস্তম্ভ জাতক (চিত্র—৪০ ও ৪১),
৫—নাগরাজার শোভাযাত্রা (চিত্র—৩৯), ৬—সূর্য-গবাক্ষ।

দশম চৈত্যে যে চিত্রগুলি আছে, আছে না বলে অবশ্য 'ছিল'ই বলা উচিত—কলা-বিশারদরা তাদের দুটি বিভিন্ন যুগের বলে সনাক্ত করেছেন। কিছু চিত্র খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর; বস্তুতঃ অজস্র প্রাচীনতম চিত্র। আর কিছু পরবর্তী মহাযান যুগের সংযোজন।

প্রথমেই বাম প্রাচীরে নাগরাজার শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য (১০।৫)। সপার্বদ নাগরাজ স্তূপমূলে অর্ঘ্যদান করতে চলেছেন। অজস্রায় গিয়ে আপনি এ চিত্র আর দেখতে পাবেন না। না, মহাকালের হস্তক্ষেপ নয়, মানুষের অত্যাচারে। বলছি সে-কথা। আর দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল ষড়দন্ত বা ছদ্দন্ত জাতকের একটি অনবদ্য কাহিনী-চিত্র। এটিও নিঃশেষে অবলুপ্ত। ধৈর্যশীল দর্শক যদি নমুনাচিত্র নিয়ে খুঁজতে থাকেন, তবে অল্প অল্প অংশ হয়তো এখনও দেখতে পাবেন। মেজর গিল, গ্রিফিথ, ইয়াজদানী অথবা লেডি হেরিংহামের গ্রন্থ অত্যন্ত ছাপ্রাপ্য; তাই তাঁদের গ্রন্থ অবলম্বনে এই ছুটি চিত্রের অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছি এখানে।



চিত্র—৩৯

নাগরাজ। সপরিবারে স্তূপমূলে অর্ঘ্যদান করতে চলেছেন—দশম শ্রুতি ,
প্রাচীনতম চিত্র অজস্রায়। অবস্থান—১০।৫ —খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী

নাগরাজার চিত্রটি দেখে কে বলবে, এই চিত্রের মানুষগুলি দু'হাজার বছর আগেকার যুগের। মনে হয়, দণ্ডকারণ্যেব একদল 'মাড়িয়া' আদিবাসীকে জড়ো করে কেউ বুঝি নাগরাজার স্তূপ-পূজা রঙিন গ্রুপ-ফটো তুলেছে এই বিংশ শতাব্দীতেই। ঐ রকম মোটা রুলি, পুঁতি ও কড়ির মালা, টিকলি, কর্ণাভরণ, শিরস্ত্রাণ,—অমনি অনাবৃতবক্ষা নারীর দল আমি যে এই সেদিনও দেখে এসেছি দণ্ডকারণ্যেব 'কোকোমেটার মাড়াই'-এ।

বামদিকের ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ পিলারের মাঝখানে ছিল শ্রাম জাতকের একটি কাহিনী। এর পরিষ্কার ছুটি অংশ ছিল। প্রথমাংশে ছিল বারাগসী-রাজ ধনুকহস্তে শরসন্ধানরত। তাঁর দক্ষিণে একটি অশ্ব, তাঁর পরিধানে খাটো ধুতি। শ্রাম জাতক রাজার অনুচরদলের হাতেও নানা জাতের আয়ুধ। দ্বিতীয় দৃশ্যে আঁকা হয়েছিল শ্রামের বৃদ্ধ পিতামাতাকে। তাঁদের মুখ বিষাদে ম্লান। পশ্চাৎপানে পলায়ন-পর একসার হরিণ।

দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে ছিল বিবাটাকাব একটি প্রাচীর-চিত্র (১০৮)। বিষয়-বস্তু বড়দস্ত জাতক। এ চিত্রটিও ইয়াজদানী অবলম্বনে এখানে সন্নিবেশিত করলুম। প্রথমে কাহিনীটা বলে নিই :

পূর্বজন্মে বুদ্ধদেব বড়দস্ত-গজরাজের মূর্তিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এই ধরাধামে। তিনি বুদ্ধ নন, বোধিসত্ত্ব। হিমালয়ের পাদদেশে ছিল ছদ্দস্ত নামে একটি বিশাল হ্রদ,— নিত্যপদ্ম, নির্মল তার জল। গজরাজের আয়তন ছিল বিশাল। বিরামি হাত উঁচু এবং একশ-বিশ হাত লম্বা এই মহাগজের অধীনে ছিল আট হাজার গজ

বড়দস্ত জাতক

অনুচর। মহাধার্মিক এই মহামতি গজরাজের ছিল দুই রানী—খুল্ল-সুভদ্রা আর মহা-সুভদ্রা।

দুই মহিষীকে গজরাজ সমান স্নেহ করতেন—একদেশদর্শিতা বা পক্ষপাতিত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না সমদর্শী এই মহাগজের চরিত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, বড়রানী খুল্ল-সুভদ্রা সব সময় সন্দেহ করতেন যে, গজবাজ কনিষ্ঠা মহিষীকেই বেশী স্নেহ করেন। তাঁর এ অনুযোগের উত্তরে গজরাজ তাঁকে বাবে বারে বুঝিয়েছেন—এ-জাতীয় ঈর্ষাকাতরতায় মহিষী অহেতুক মনোবেদনায় কষ্ট পান—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক; কিন্তু তবু মাৎসর্য-বিষে জর্জরিতা জ্যোষ্ঠা মহিষীর চেতনা হয় না।

একদিন পঙ্কজ সরোবরে অবগাহন-স্নানান্তে গজরাজ তীরে উঠবার সময় দেখতে পেলেন ফুল-কুসুমিত একটি অশোকতক। মহারাজ ক্রীড়াচ্ছলে বৃক্ষের কাণ্ডটি গুণ্ডে আলিঙ্গন-বদ্ধ করে প্রকম্পিত করলেন। ঝড়ে পড়ল বনকুসুম। কিন্তু দৈবের কী নির্দেশ! ফুলগুলি সবই ঝবে পড়ে কনিষ্ঠা মহিষীর বৃন্তে। আর কিছু গুচ্ছ শাখা ভেঙে পড়ে জ্যোষ্ঠা মহিষীর মাথায়। কলকণ্ঠে হেসে ওঠে গজসখীর দল। অভিমানিনী বড়বানীর ঈর্ষাকাতরতার কথা গোপন ছিল না সখীমহলে—তাই এ নিয়ে কৌতুক করতেও ছাড়ল না ওরা। প্রচণ্ড অপমান-বোধ হল জ্যোষ্ঠা মহিষীর, ছবস্ত অভিমানে স্থানত্যাগ কবলেন তিনি। ক্ষুব্ধ মহারাজ পিছন থেকে বাবে বাবে তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করলেন না।

এই সামান্য দুর্ঘটনার পথ বেয়েই এল চরম সর্বনাশ। সমস্ত দিন অপেক্ষা করে রইলেন গজরাজ, কিন্তু ফিবে এলেন না বড়বানী। যুথবেষ্টনী ভেদ কবে ছরস্তু অভিমানে সেই যে তিনি চলে গেলেন, তারপব থেকেই আর তাঁব সন্ধান নেই। পবদিন থেকে মহারাজ অনুসন্ধান চালালেন। বনে-বনান্তবে অন্বেষণ করতে থাকে অনুচরের দল, কিন্তু মহারানী যেন হাওয়ায় মিশে গেছেন। শেষকালে স্বয়ং গজরাজ উন্মাদের মত নিজেই নিরুদ্দিষ্টার অন্বেষণে বেব হয়ে পড়েন। কত মরু-প্রান্তর, কত গহন অবণ্য অতিক্রম কবে এলেন তিনি—কিন্তু নিরুদ্দিষ্টাব কোন সন্ধান পেলেন না।

হুঃখে অনুশোচনায় গজবাজ শয্যা নিলেন।

দীর্ঘদিন পরে মহারাজের এক বিশ্বস্ত অনুচর ফিরে এল মহাবানীর সংবাদ নিয়ে। রাজমহিষী হিমালয়ের এক গহন অরণ্যে গিয়ে তপস্বী করেছিলেন।

গজরাজ সোংসাহে বলে ওঠেন, তুমি তাঁর দেখা পেয়েছ ?

অধোবদনে অনুচর বলে, না মহারাজ—যে সব নির্জন গুহাবাসী সন্ন্যাসী সংসার ত্যাগ করে তপস্যা করেন, তাঁদের কাছেই সন্ধান পেয়েছি আমি। তাঁদের শরণ নিয়েছিলেন মহারানী। তাঁদের নির্দেশেই কঠিন তপশ্চর্যা করে সেই হিমশীতল রাজ্যেই তিনি দেহ রেখেছেন।

ষড়দন্ত-গজরাজের ছ'চোখে নেমে আসে ছটি জলের ধারা।

মহামন্ত্রী প্রশ্ন করেন, তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করতে পারেন নি তিনি ?

অনুচর বলে, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি পারলাম না মহামন্ত্রী। যে সন্ন্যাসীর কাছে মহারানীর সংবাদ পাই, তিনি বলেছিলেন—শেষ তপস্যায় রাজমহিষী সাফলালাভ করেছিলেন। তাঁর ইষ্টদেব এসে তাঁকে বরদানও কবে যান, অথচ—

—অথচ কি ?

—অথচ তিনি তো আজ জীবিতা নেই ! কেমন করে প্রার্থনা পূরণ হবে তাঁর ?

গজরাজ এতক্ষণে প্রশ্ন করেন, কী বর প্রার্থনা করেছিলেন খুল্ল-সুভদ্রা ?

অনুচর অধোবদনে নিরুত্তর থাকে।

গজরাজ সহাস্ত্রে বলেন, তুমি কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ? মহারানী আমার উপর প্রতিশোধ নেবার বর প্রার্থনা করেছিলেন, এই তো ?

অধোবদনেই অনুচর প্রত্যুত্তর কবে—আজ্ঞে হাঁ মহারাজ।

কনিষ্ঠা মহিষী ভীত সচকিতকণ্ঠে বলেন—ভাগ্যে তিনি জীবিতা নেই। না হলে —

বাধা দিয়ে গজরাজ বলেন—দেবতার আশীর্বাদ তা সত্ত্বেও ফলবে মহা-সুভদ্রা ! তাঁর মনস্কামনা নিষ্ফল হবে না !

কনিষ্ঠা মহিষী সবিস্ময়ে বলেন —কেমন কবে মহারাজ ?

গজরাজ সে কথার উত্তর দেন না, যান তাসেন শুধু।

কিন্তু সে প্রশ্নের উত্তর অচিবেই উপলব্ধি কবলেন কনিষ্ঠা মহিষী। গজরাজের যেন কী হয়েছে—আহার-বিহার কোন কিছুতেই তাঁর মন নেই। সমস্ত দিন তিনি অগ্ন্যমনে কি যেন চিন্তা করেন। মিথ্যা অভিমানে জোষ্ঠা মহিষী যে তাঁকে অপদস্থ কবে চলে গেছেন, এ-কথা যেন কিছুতেই ভুলতে পারছেন না বোধিসত্ত্ব মহাবাজ। তিনি যেন সকলের চোখে ছোট হয়ে গেছেন। এ অপমান সহ্য করতে পারছেন না তিনি। যিনি দুই সহধর্মিণীর প্রতিই সাম্য-দৃষ্টি রাখতে পারেন না, তিনি কেমন কবে যাবতীয় প্রজাসাধারণকে সমদৃষ্টিতে দেখবেন ? যেন এই কথাটাই ভাসতে থাকে সকলের মুখে—যেন তারা সমীহবোধে এ-কথাটা উচ্চারণ করে না শুধু তাঁর সম্মুখে।

দিন দিন ক্ষয়িত হতে থাকে মহাগজের বিশাল দেহ। শেষে রাজ্যভার যোগ্যতম গজের হস্তে সমর্পণ করে তিনিও চলে গেলেন প্রব্রজ্যা নিয়ে। জোষ্ঠা মহিষীর মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রইল না—ষড়দন্ত-গজরাজের সোনার সংসার ছারখার হয়ে গেল।

ক্রমে কনিষ্ঠা মহিষী মহা-মুভদ্রাও গত হলেন—একে একে বিদায় নিলেন সংসার থেকে মহারাজের অশ্রুত বিখ্যাত অনুচরের দল। শুধু মহাস্থবির বৃদ্ধ গজরাজেব যেন মৃত্যু নেই। সামান্য কয়েকজন অনুচরসমেত তিনি হিমালয়েব এক নিভৃততম কন্দবে শেষজীবন যাপন করতে থাকেন।

একদিন সায়াহ্নকালে সরোবরে অবগাহন-স্নানান্তে মহাগজ নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছেন—মনে মনে বলছেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনও হয় নি প্রভু? মুক্তির দিন কি আমার আজও আসে নি?

ইঠাৎ তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি প্রচণ্ড শব্দঘাত হল। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে গজবাজ পশ্চাতে ফিরে দেখেন, একজন ধানুকী তীরে দাঁড়িয়ে তাঁকে শব্দসন্ধান করছে। বাধা দিলেন না মহাবাজ। মুহূর্মুহু শব্দবাণে তাঁকে বিদ্ধ করল শিকারী। তারপর সে বিষ্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

গজরাজ ওকে ক্ষান্ত হতে দেখে বলেন—তুমি কি চাও বন্ধু? এভাবে আমাকে ক্রমাগত শরবিদ্ধ করছ কেন?

স্তম্ভিত শিকারী এ-কথায় এগিয়ে এসে বলে, আমি আপনাব এই প্রকাণ্ড ছটি দাঁত নিয়ে যাব বলে এসেছিলাম। আপনাকে যে বিষ-মিশ্রিত বাণে আঘাত করেছি, তাতে যে-কোন হস্তীব মৃত্যু হওয়াব কথা, অথচ—

গজবাজ হেসে বলেন, আমাকে বধ করবার মত বাণ তো তোমাব তুণীবে নেই বন্ধু। তা তুমি আমার দাঁতগুলি চাও তো নিয়ে যাও না। এস. কাছে এস—উৎপাটন কর আমার গজদন্ত, আমি কিছু বলব না।

সাহসে ভাব করে শিকারী সদলবলে এগিয়ে আসে। বহু আয়াসেও কিন্তু তাবা উৎপাটিত করতে পারে না গজবাজেব মহাদন্ত।

তখন গজবাজ বলেন—বেশ, তুমি অপেক্ষা কর, আমি স্বয়ং এই ছটি গজদন্ত উৎপাটিত করে দিচ্ছি। দন্ত-উৎপাটনমাত্র আমার মৃত্যু হবে। সেজন্য খেদ নেই, কিন্তু আমার এ দাঁতগুলি তোমাব কি কাজে লাগবে ভাই?

শিকারী বুঝতে পারে ইনি সামান্য গজ নন। সে তখন যুক্তকরে নিবেদন করে—মহাশয়, আপনি আমার উপর কষ্ট হবেন না। আমি আজ্ঞাবহমাত্র। আমি মহামহিম কাশীবাজেব যুগয়াধিপতি, আমার নাম সোমুত্তর। আমাদের মহাবানী স্বপ্ন দেখেছেন যে, হিমালয়েব এক নিভৃত কন্দবে এক মহাগজ আছেন—যাঁর ছটি বিবর্তাকার গজদন্ত আছে। মহাবানীর শব্দ, তিনি সেই গজদন্ত-নির্মিত পালঙ্কে শয়ন করবেন। তাই রাজ্যদেশে শত-সহস্র শিকারী সমস্ত হিমাচলখণ্ডে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে। আজ দৈবক্রমে আমি আপনাব সাক্ষাৎ পেয়েই বুঝেছি যে, মহারানী আপনাকেই স্বপ্নে দেখেছিলেন।

গজবাজ সে-কথা শুনে কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি বললেন, তোমার উপর আমি কষ্ট হই নি যুগয়াধিপতি সোমুত্তর। আমি স্বয়ং আমার ছটি

গজদন্ত উৎপাটিত করে দিচ্ছি। এ ঘটনা কেন ঘটেছে, তা ধ্যানে উপলব্ধি করেছি আমি। এ দৈবনির্দেশ। আমার এই দাঁত কয়টি তুমি নিয়ে গিয়ে তোমাদের রাজমহিষীকে দিও, আর তাঁকে বলো—এগুলি তাঁকে উপহার দিয়েছি আমি। আরও বলো, পূর্বজন্মে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মস্তকে শুষ্ক অরগ্যাশাখা নিক্ষেপ করি নি।

বস্তুতঃ, দন্ত-উৎপাটনমাত্র গজরাজের মৃত্যু হল।

সুবর্ণ পাত্রে ঐ অমূল্য গজদন্তগুলি নিয়ে সোমুত্তর উপনীত হল বারাণসীতে। মহারানীর প্রার্থিত গজদন্ত এসেছে শুনে আনন্দের হিন্দোল বয়ে গেল রাজপুরীতে। বাহকের দল গজদন্তগুলি নিয়ে এল রাজাস্তম্ভপুরে। কিন্তু সেগুলি দর্শনমাত্র শিউরে উঠলেন কাশীরাজ-মহিষী।

পূর্ব জন্ম-স্মৃতি মনে পড়ে গেছে তাঁর। সেই অনিন্দ্যসুন্দর গজদন্তগুলি দর্শনমাত্র কাশীরাজ-মহিষী উপলব্ধি করেছেন যে, পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ঐ গজরাজের প্রধানা মহিষী। মনে পড়ে গেল তাঁর প্রতিশোধ প্রার্থনার কথা! মনে পড়ে গেল ষড়দন্ত-গজরাজের প্রণয় কথা!

মহাগজের অস্তিম ভাষণ শুনে মহারানী মুর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

সে মূর্ছা তাঁর আর ভাঙল না। ক্রোড়ে দুঃখে মহারানীও প্রাণত্যাগ করলেন।

এ কাহিনী শুধু দশম গুহাতেই নয়, সপ্তদশ গুহাতেও আছে। দশম গুহাতে এই জাতক-কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্রগাথা ছিল, তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

কেমন করে জানেন? গত দেড়শ-দু'শ বছরে নানান জাতের মানুষ এসেছে অজস্রায় এবং এই চিত্রপটের উপর ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজেদের নাম খোদাই করে গেছে। অসংখ্য স্বাক্ষরে অবলুপ্ত হয়ে গেছে ষড়দন্ত-গজরাজের এই অপূর্ব চিত্রগুলি! অনেকক্ষণ লক্ষ্য করলে অসংখ্য স্বাক্ষরের ভিতর থেকে মনে হয়, যেন অল্প অল্প চিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। মহাগজের বিশাল দেহে যেমন সহস্র বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করেছিল শিকারী, এখানেও যেন তেমনি মহাচিত্রের গায়ে সহস্র বিষাক্ত স্বাক্ষর নিক্ষেপ করেছে অযুতযাত্রী। সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শুধু দেবনাগরি, ইংরেজি, উর্দু এবং দাক্ষিণাত্যের দুর্বোধ্য ভাষায় দর্শকদের নাম আর নাম। বিষ-জর্জরিত গজরাজ যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করেছিলেন মাত্র, তাতে তাঁর মৃত্যু হয় নি। সভ্য দুনিয়ার স্বাক্ষরবাজ মানুষের বিষের স্বাক্ষরেও তেমনি বিষ-জর্জরিত হয়েছে মহান শিল্পীর শিল্পকর্ম। কিন্তু তার মৃত্যু নেই! বার্জেস আর গ্রিফিথের গ্রন্থের পৃষ্ঠায় মৃত্যুঞ্জয়ী চিত্রটি অমর হয়ে আছে পৃথিবীর যাবতীয় গ্রন্থাগারে! ছাপ্রাপ্য সে চিত্র সাধারণ পাঠকের নাগালের বাইরে। তাঁদের এই গ্রন্থকারের অক্ষম প্রচেষ্টাতেই সম্ভ্রষ্ট থাকতে হবে।

এ-চিত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চোখ ফেটে জল এসেছিল আমার। শুধু একমাত্র সাস্ত্রনা স্বাক্ষরের সে হরিহরছত্র-মেলায় 'আ-মরি বাঙলা ভাষা'র সন্ধান পাই নি আমি!

চিত্র—৪০ এবং চিত্র—৪১-এর ফ্রেস্কোটি নিয়ে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। এটি বস্তুতঃ অজস্রের একটি প্রাচীনতম চিত্র। ফলে, এটির বিজ্ঞাস নিয়ে বিশদভাবে যদি আলোচনা করি, তবে পরবর্তী যুগে শিল্পী কিভাবে কাহিনী-চিত্রের বিজ্ঞাস করেছেন, তা বুঝতে সুবিধা হবে।

কাহিনীটি আমরা জেনেছি। চিত্রটি বাস্তবে অবলুপ্ত হলেও, প্রামাণিক গ্রন্থের সাহায্যে আমরা দেখতেও পাচ্ছি। আমি তো এটিকে এইভাবে সাজাতে চাই—

প্রথম দৃশ্য-সর্বদক্ষিণে (প্যানেল—১)। দেখছি, কাশীরাজ-মহিষী অভিমান করেছেন, গালে হাত দিয়ে বসে আছেন তিনি। সম্মুখে কাশীরাজ তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন—যেমন কবে হোক, স্বপ্নদৃষ্ট গজদন্ত এনে উপহার দেবেন রানীকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য তার বামে (প্যানেল—২)। মহারাজ সিংহাসনে আসীন। তাঁর মাথার উপর রাজছত্র। সম্মুখে যুক্তকবে মৃগয়াধিপতি সোমুত্তর ও তার সহকারী। শিকারীদ্বয়কে মহারাজ ষড়দন্ত-হস্তীর সন্ধানে ব্রতী হতে বলছেন। রাজার দক্ষিণে রাজমহিষী উপবিষ্টা।

তৃতীয় দৃশ্য সর্বদক্ষিণে (প্যানেল—৩)। বিশালায়তন দৃশ্যপট। ষড়দন্ত-গজবাজ হিমালয়ে বিচরণ করছেন। তাঁর চতুর্দিকে হস্তিযুথ। সোমুত্তর ধনুকহস্তে গজরাজকে নিরীক্ষণ করছে।

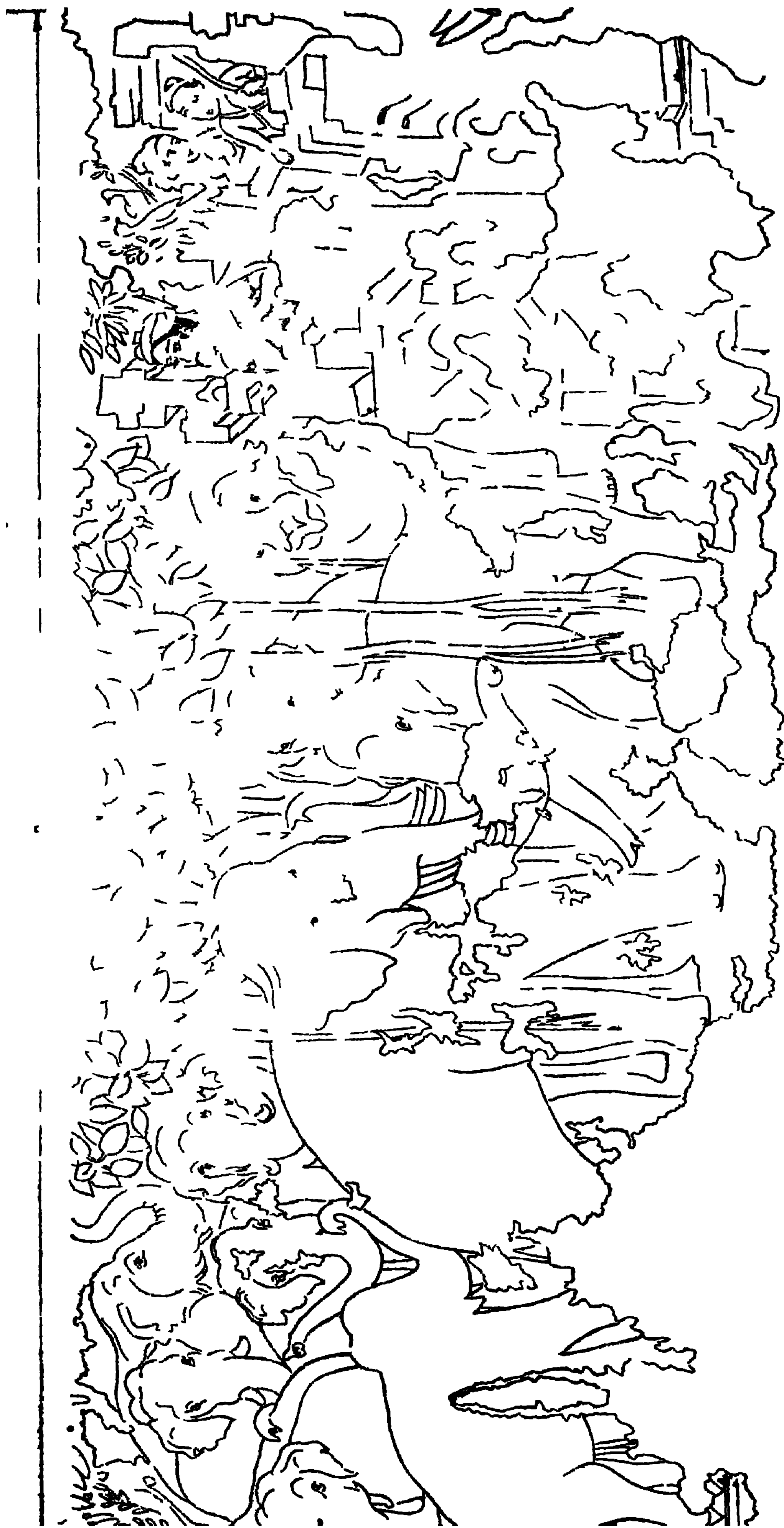
চতুর্থ ও শেষ দৃশ্য কেন্দ্রস্থলে (প্যানেল—৪)। শিকারী বাহনদণ্ডে গজদন্ত নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে কাশীরাজের অন্তঃপুরে। মহারানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে। তিনি মুর্ছাহত। তাঁর পতনোন্মুখ দেহটি ধরতে যাচ্ছেন কাশীরাজ।

এভাবে যদি আমরা কাহিনীটিকে সাজাই, তাহলে বলতে হবে কাশীরাজ-মহিষীর পূর্বজন্মের ইতিকথা, অর্থাৎ, ধুল্ল-সুভদ্রা-মহা-সুভদ্রা-কাহিনী আছে নেপথ্যে। গ্রিফিথ বলেছেন, সে অংশটুকুও ছিল। তার অল্প অল্প আভাস তিনি দেখেছিলেন।

এখন স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, এভাবে কাহিনী-চিত্রটি সাজানো হল কেন? কালানুক্রমিকভাবে সাজালে প্যানেল—৪টি সর্ববামে আসা উচিত ছিল। তাহলেই দর্শকের পক্ষে কাহিনী-চিত্রটি বোঝা সহজ হত। এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা পাই, তাহলে হয়তো পরবর্তী যুগের কাহিনী-চিত্রগুলি এইভাবে বিজ্ঞাসের একটা অর্থ পাওয়া যাবে।

একটা যুক্তি মনে আসছে।

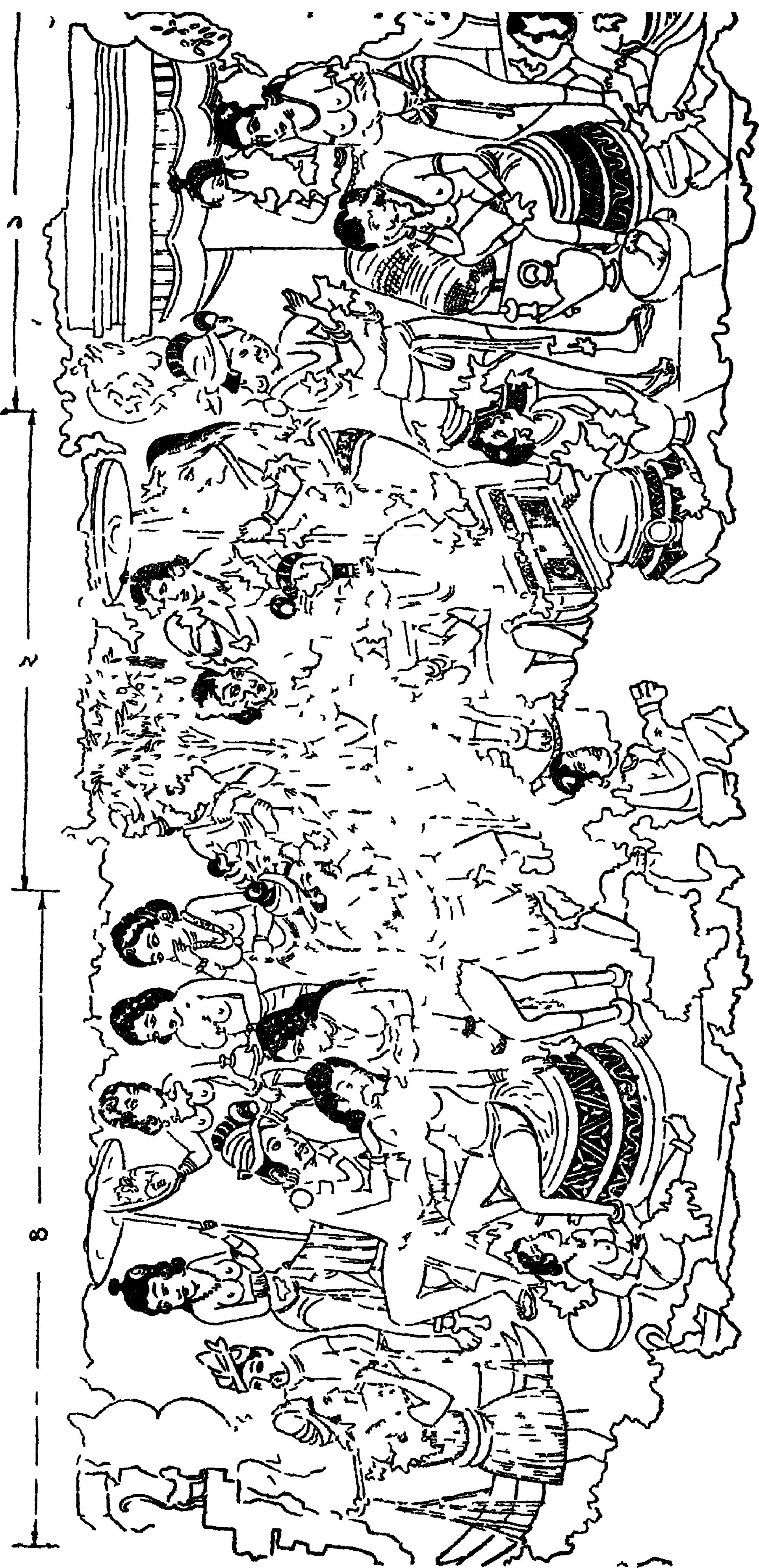
কাব্য বা নাটকে আখ্যানভাগ ক্রমে ক্রমে পাঠক বা দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করা যায়। তাই কাব্য বা নাটকের চরম দৃশ্য বা ক্লাইমাক্সের স্থান হয় শেষ দৃশ্যে। কারণ, সেটাই রসোপলব্ধির যবনিকা এবং সেই শেষ স্মৃতিটুকু মনে নিয়েই রসপিপাসু ক্ষান্ত দেয়। ফ্রেস্কোতে কিন্তু তা নয়—এখানে সমস্ত দৃশ্যপট একই সঙ্গে একই কালে দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করতে বাধ্য হন শিল্পী। ফলে, স্বতঃই এখানেই কেন্দ্রস্থলটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেখানেই ক্লাইমাক্সের স্থান। প্রতिसাম্যমূলক চিত্রে যেমনমূল



চিত্র ৬০

ছন্দ জাতক কাহিনী চিত্র ১৫২

অবস্থান— ০০



চিত্র- ৪১

হৃদয় জাতক কাহিনী চিত্র [দ্বিতীয় পৃষ্ঠা]

অবস্থান—১০৭

ফিগরটি কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপিত করে তার চারপাশে অন্যান্য ফিগর আঁকা হয়, এখানেও তেমনি শিল্পী মূল দৃশ্যটি কেন্দ্রস্থলে ঐক্যে অন্যান্য দৃশ্যপট দু-পাশে সাজিয়েছেন। নিঃসন্দেহে বাবাগসী-রানীও মৃত্যু এ কাহিনীর চরম দৃশ্য। তাই তাকে কেন্দ্রস্থলে ঐক্যেছেন শিল্পী।

যুক্তিটা এক্ষেত্রে বেশ খাপ খেয়ে গেল বলে আত্মসন্তুষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, এই সূত্রটি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়। উদাহরণস্বরূপ, নন্দের ধর্মাস্তর-গ্রহণ চিত্র-কাহিনীতে (মোড়শ গুহা) কাহিনীর শ্রেষ্ঠ খণ্ডচিত্র তথা ক্লাইমাক্স মরণাহতা রাজকন্যার চিত্রটি। কিন্তু সেটি ফ্রেস্কোর কেন্দ্রস্থলে নেই; একেবাবে সর্বপ্রথমে অবস্থিত। কেন?

মে যাই হোক, এই চিত্রগুলি থেকে দ্বি-সহস্র বর্ষের পূর্বকার ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক-কিছু ধারণা করতে পারি আমরা। তিনটি ঘড়া ও সিংহাসনের নকশা লক্ষ্য কববার মত। কমণ্ডলু ও গাড়ুর মাঝামাঝি আকারের যে ছটি জলপাত্র আছে, তাও লক্ষণীয়। কাশীবাজারে পারে প্রথম ও চতুর্থ দৃশ্যে যে চঞ্চল জোড়া দেখছি, সে-জাতীয় হাওয়াই চঞ্চল আঙ্গু ও বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় দৃশ্যে হস্তিযুগের চিত্র তো অনবদ্য। হস্তীর সঙ্গে কদলীবৃক্ষের কথাটা স্বতঃই মনে আসে; শিল্পী কিন্তু তার পরিবর্তে ঝুর-নামা বটগাছের চিত্র ঐক্যেছেন। বিশালায়তন বটবৃক্ষের সঙ্গে কি গজরাজের তুলনা করতে চান শিল্পী?

কাশীবাজ, মহিষী ও শিকারী—এদের প্রত্যেককে শিল্পী তিনবার করে ঐক্যেছেন। বিশেষ লক্ষণীয়, তিনবারই প্রত্যেককে একই বেশে একই সাজ-সজ্জায় আঁকা হয়েছে। এ তিনটি চিত্র যে একই মানুষের, তা মুখাকৃতি দেখে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অশুবিধা হয় না। শুধু তাই নয়—অন্যান্য চরিত্রগুলির মধ্যেও মোট সাদৃশ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ—প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে পদসেবিকার মুখাকৃতিতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। যেটুকু অমিল দেখছেন, তা গ্রন্থকারের আঁকার দোষে—মূল চিত্রে তা নেই। এ থেকেই বোঝা যায়, উত্তরসাধকরা বিশ্বাস্তর, মহাজনক, বিপূর বা জুজুকার আলেখ্য বিভিন্ন ভঙ্গিতে আঁকবার সময়েও কেমন করে ফটোগ্রাফ-সুন্দর নির্ভুলতায় একই মুখের ছবি ঐক্যেছেন।

এবার এ ফ্রেস্কোর যতি-চিহ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথম দৃশ্যে অভিমানা-হঁতা মহারানীই কেন্দ্রচিত্র। ফলে, সকলেই তাঁর দিকে ফিরে আছে। দ্বিতীয় দৃশ্য বাজাস্তম্ভপূর্বে নয়, প্রকাশ্য দরবার। ফলে, প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের স্থান ও কাল বদলেছে। অথচ ছটি দৃশ্যের মাঝখানে কোন যতি-চিহ্ন নেই। শুধুমাত্র মুখ-ফেবানোর ভঙ্গিমায় এই আদিম শিল্পী দৃশ্যান্তরে আসতে পেরেছেন। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যের মাঝখানেও কোন সুস্পষ্ট যতি-চিহ্ন নেই। দ্বিতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে যথাক্রমে মহাবাজ ও মহারানী মূল কেন্দ্রচিত্র। তাঁদের দিকে অন্যান্য ফিগর যে ভাবে মুখ ফিরিয়েছে, তাতে আমরা অনায়াসেই বুঝে নিতে পারছি, কোথায় দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ হয়েছে এবং চতুর্থ দৃশ্য শুরু হয়েছে। চতুর্থ ও তৃতীয় দৃশ্যের মাঝখানে কিন্তু একটি সুস্পষ্ট যতি-চিহ্ন আছে।

উচ্চত-লাঙ্গুল হুমানটি যে প্রাসাদের কার্নিশে বসে আছে, তার একটি ভাঙা প্রাচীর সেই যতি-চিহ্ন। তৃতীয় দৃশ্যে বটগাছের ঝুরিগুলি যতি-চিহ্ন নয়—তারা হস্তীর বৃহদায়তন শরীরের রেখার একঘেয়েমি দূর কবছে মাত্র।



কোন একটি মহান শিল্পকর্মকে উপলব্ধি কবতে চলে তার প্রকৃত পটভূমি প্রস্তুত জ্ঞান থাকার দরকার। দেশ-কালের কোন অবস্থায় বিচার্য শিল্পবস্তুটি নিমিত্ত হয়েছিল, কী তার পশ্চাত্তপট এবং কী তার পবিত্রতা তা জানা না থাকলে, শিল্পকর্মটির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম কবা যায় না। অজ্ঞতা-গুহাব মূগাঘনের জন্ম তাই গুহা-মন্দিরের কম-বিন্যাসের একটি আলোচনা এ গ্রন্থে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

আগেই বলেছি, অজ্ঞতার স্থাপত্য এক বিশেষ জাতের স্থাপত্য, যাকে “গুহা-স্থাপত্য” (Cave Architecture) বলা যেতে পারে। পার্বত্য প্রদেশে প্রাচীর খোদাই করে, অথবা স্বেচ্ছা পাহাড় কোটে কৃত্রিম গুহা বানিয়ে তাকে হল, স্তম্ভ, পিলার ইত্যাদি ব্যাপায়িত কবাই এ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, সম্রাট চাংশানের ১৫০০ এ-ফ্রান্সীয় গুহা খনন প্রথম শুরু হয়। প্রায় সমসময়ে বর্তমান বিহার প্রদেশে এই প্রকারের ১৫টি গুহা খনন কবা হয়েছিল। সেগুলি—

বরাবর পর্বতে... চাবটি সুদামা, কর্ণকোপন, লোমশগাষি ও বিশ্ব কোপডি।

গয়া থেকে উনিশ মাইল উত্তরে।

নাগার্জুন পর্বতে তিনটি গোপিকা, বহজিকা ও বদলিকা।

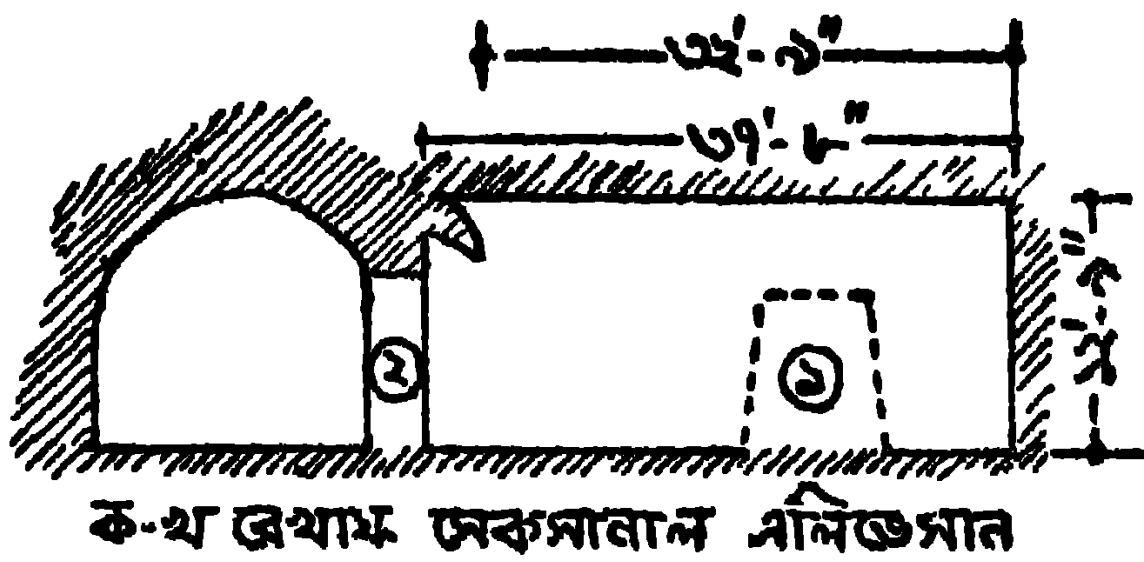
বরাবর থেকে আধ মাইল উত্তরে

সীতামাবিতে একটি সীতামারি। গয়া থেকে পঁচিশ মাইল পূর্বে অথবা বাজগীর থেকে তের মাইল দক্ষিণে।

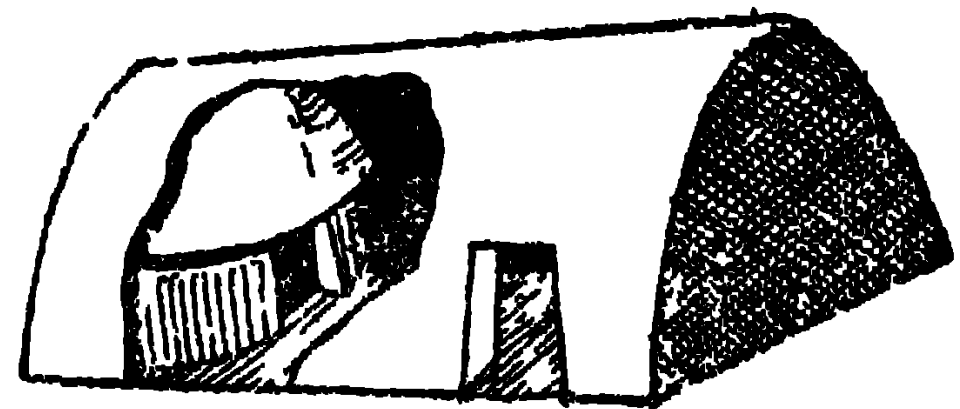
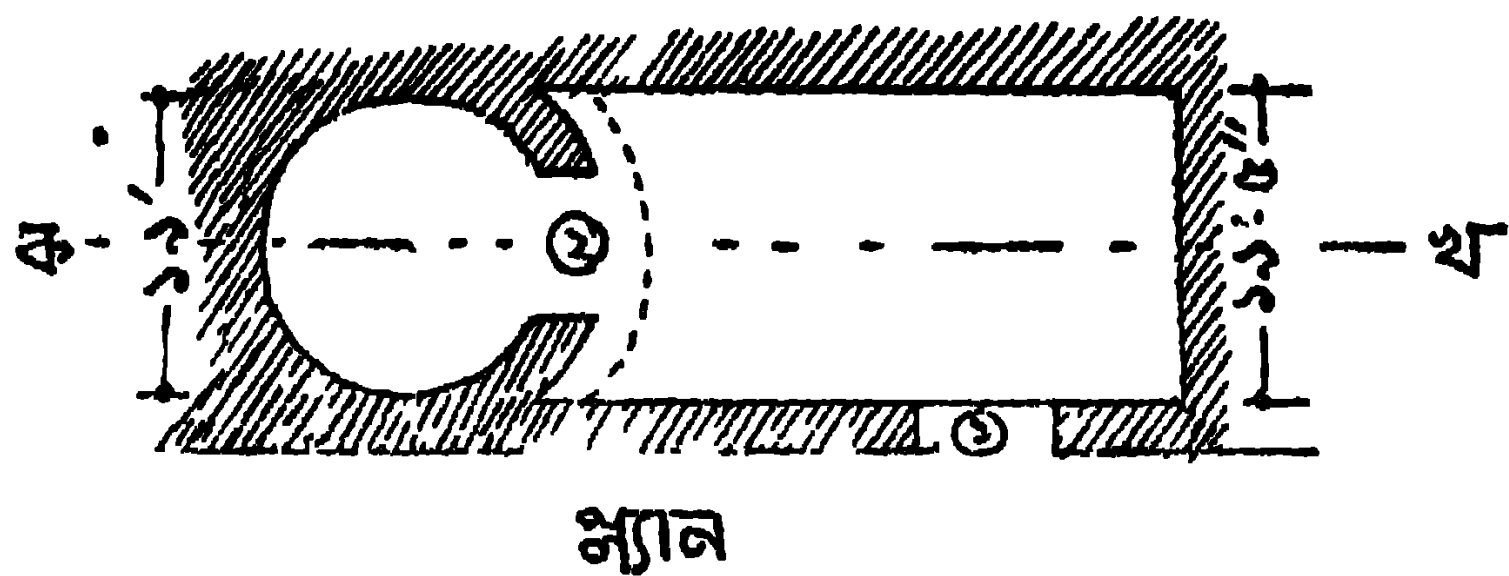
এদের মধ্যে প্রাচীনতম হচ্ছে সুদামা। চিত্র—৪২-এ এই আদিমতম গুহা-মন্দিরের স্বরূপটি বোঝাবার চেষ্টা করেছি। লক্ষ্য কবে দেখুন, গুহাব ভিতরে গর্ভগৃহের ছাদটি কেমন ছায়া (eave) বাব কবে খোদাই কবা হয়েছে। খড়ের বা টিনের ঢালাঘবে আমবা যে ধরনের ছায়া বা ঈভ বার কবি, ঠিক যেন তেমন দেখতে ওটা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মাটিকোঠায় আমরা ছায়া বানাই কেন? যাতে ছাদ থেকে বৃষ্টির জলটা দেওয়াল বেয়ে না নামে, সেইজন্মই তো? কিন্তু এক্ষেত্রে দেওয়াল তো পাহাড়ের গা! তাছাড়া,

গর্ভগুহাটি তেঁ, আবার গুহার ভিতর। ফলে, বৃষ্টির জলের তেঁ কোন প্রশ্নই এখানে উঠছে না। তাহলে ?

তাব কারণ এই যে, যে সব আদিম কবিগর এই প্রথম গুহা-মন্দিরটি খনন কবেছিল, তারা তখনও খড়র চাল আর মাটির দেওয়ালের কথা ভুলতে পারে নি। তাদের হাত কাজ



কবেছে পাথরের উপর, কিন্তু চিম্বাবাধায তাবা তখনও বয়েছে খড়র যাগ। ফলে, গুহার ভিতর পাথরের দেওয়ালেও তারা ছা। বানিয়ে যাচ্ছে খড়র দেওয়ালের অভ্যাসবশত।



চিত্র—৪১

১ পাণ্ডীনাথ্য ভাণ্ডারীয় বর্ম্মি গুহা, লাক্ষ্মী-নিব

২ গুহা-পান্ডা ১, ২ যুগ-পান্ডা ১২ প্রাচীন ১২।

প্রথম যুগের এই গাটিটি ও গা মন্দির মতো বৈমান লোমশাধি প্রবেশ-পাথর ও কিছুটা বাককাঁচ—অন্যায়গুলি এতদ্বাবে অলঙ্করণ বর্জিত। কিন্তু তাবকাঁচ না থাকলে কি হবে, গুহা-মন্দিরগুলির অভ্যন্তর-ভাগ ঠিক নাগোক সম্ভব মত ও বস্তুবাক বসমে মসৃণ।

প্রথম যুগের এই গাটিটি বর্ম্মি গুহাকে হক্কর দাঁত হাচ্ছ বস্তুবাক গিটি কাননে। প্রথমতঃ, এগুলি আদিমতম বর্ম্মি গুহা, পান্ডা পান্ডা গুহাও গুহা-মন্দির ও গুহা-ভাস্কর্যে—ভাজা, বাসিন্দা, গুহা-প্রাচীর, গি টালি ও গি আদি-ভনক। দ্বিতীয়তঃ, কাঠ ও খড়র যুগ থেকে গা গুহা গুহা-ভাস্কর্যে স্থাপত্য-শিল্পের প্রথম পদক্ষেপ। তৃতীয়তঃ, সম্রাট অশোকের বাঙালি গুহা গুহা একা দিক এরা দেখাটিত কবে দিচ্ছে—সম্রাটের আদেশে ও গুহা নির্মিত এ গুহা-মন্দিরগুলি। অজগীক গুহা-মন্দির জৈন (বৌদ্ধ নয়) সম্রাসীদের সাধন-স্থল হিমাবেক খনন করা হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের ধাবক প্রিয়দর্শী অশোকের উদাবতার সাক্ষী এরা।

নাগার্জুন পর্বতে গোপিকা-গুহাটি অবশ্য সম্রাট অশোকের আমলে নির্মিত নয়। অশোক-পৌত্র সম্রাট দশবথের আদেশে সেটি খোদিত। আকারে, সেটি অপেক্ষাকৃত বড়—৪৪ ফুট লম্বা, প্রস্থে কিন্তু সেই ১৯ ফুট।

এব পরই দেখতে পাচ্ছি, নাসিকেকে কেন্দ্র করে পশ্চিমঘাট পর্বতমালায় একদল বৌদ্ধ শ্রমণ পাহাড়েব বুকে গুহা-মন্দির খনন শুরু করেছেন একাধিক স্থানে। সেগুলির আকাব, আয়তন, রচনাশৈলী প্রায় একই বকমের। এগুলি সবই উপাসনা-গৃহ বা চৈত্য।

বস্তুতঃ, এখন থেকে আমরা 'গুহা-মন্দির' শব্দটির পরিবর্তে গুহা-চৈত্য ও গুহা-বিহার শব্দ দুটি ব্যবহার করব। কারণ, এই সময় থেকে গুহা-মন্দির খননের কাজ ঐ দুটি নির্দিষ্ট ধারায় বইতে শুরু করে। সমবেত উপাসনার জন্য খোদিত হত চৈত্য এবং বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস স্থানাবে তৈরি করা হত বিহার। বিহারের কথা পাবে বলছি। প্রথমে গুহা-চৈত্যের কথা বলি।

নাসিকেকে কেন্দ্র করে 'তিন-গাবন' নামের ভিতর যে চৈত্যগুলি খোদিত হয়েছিল,

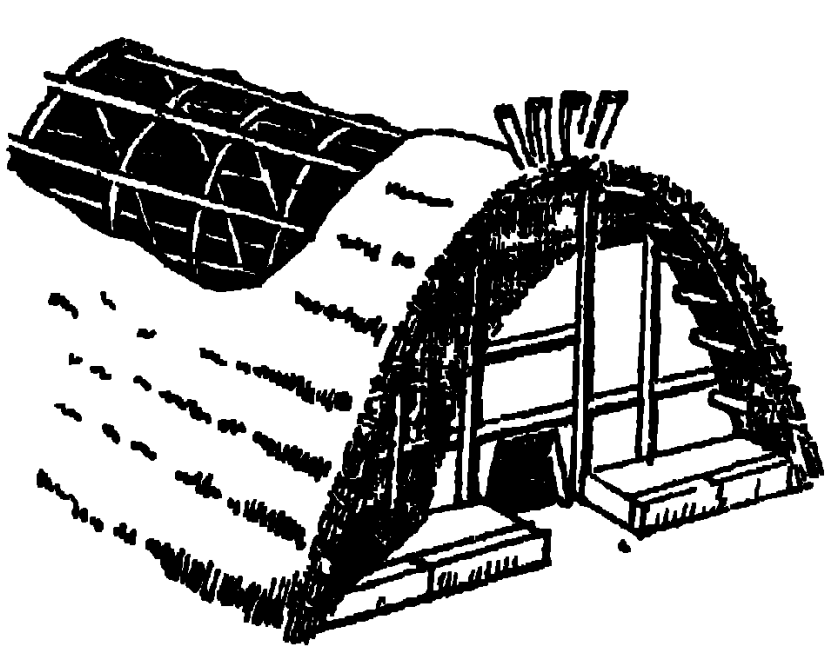
সেগুলিকে কাগান্ডন মিকভাবে দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি।

চৈত্য

১১পূর্ব দ্বিতীয় শতকের শাগ ভাজা, কনডেন, পিঠালকোবা এবং অজন্তাব দশম গুহা। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বেদশা, অজন্তাব নবম গুহা, নাসিক ও কার্ণে। এছাড়াও, আবও শতখানেক বছরের ভিতর তৈরি হয়েছিল জুলাবে দুটি এবং কার্ণেবিতে একটি চৈত্য। এদের মধ্যে সব কবে বৃহত্তম হচ্ছে কার্ণে এবং ক্ষুদ্রতম হচ্ছে নাসিকেব পাণ্ডলেনা চৈত্য। চৈত্যগুলির আকৃতিতে বিশেষ পার্থক্য নেই। সবগুলিই অজন্তাব দশম চৈত্যের (চিত্র—৩৮) মত। লম্বাটে একটা হলু-কামবা, তাতে ছদিকে এই সারি স্তম্ভ এবং শেষপ্রান্ত পাহাড়েব গায়ে অর্ধ-গোলাকৃতি করে খোদাই-করা। সেই 'পছন্দিকেব গোলাকৃতি অংশেব কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো হত ভূপটিকে। 'বসানো হত' বলাটা অবশ্য ঠিক বাকবগসঙ্গত হ'ল না। কারণ, ভূপটিকে বাইরে থেকে এনে বসানো হয় নি আদপেই, গেঁথে তৈরি হ'ল। পাহাড় খনন করবার সময়ে ঐ অংশটা বাদ দিয়ে খনন করা হয়েছে এবং পাবে সেই অংশটিকে ছেনি-হাতুড়ি দিয়ে খোদাই করে ভূপের আকাব দেওয়া হয়েছে। ঠিক এইভাবেই এসেছে স্তম্ভগুলি।

এই দশটি উদাহরণেব মধ্যে একমাত্র অজন্তাব নবম গুহাব শেষপ্রান্তটি চৌকোনা, অন্যগুলি গুহাব শেষপ্রান্ত অর্ধ-গোলাকৃতি। এই আদিম গুহা-চৈত্যগুলির আবও কয়েকটি বেশিষ্টা লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, গুহা। ছাদে কাঠেব কডি-ববগাব আকাবে পাথর খোদাই করা হয়েছে। ছাদের ভানবহনের কাজে এ-জাতীয় বীম-ববগাব কোনও প্রয়োজন ছিল না, ও শুধু অলঙ্করণ। এছাড়া, শিল্পীবা বোধ কবি পূর্ব-যুগের অভ্যাসটা তখনও ত্যাগ করতে পাবেন নি। চিত্র—৪৩ থেকে চিত্র—৪৮-এ আমরা গুহা-চৈত্যের সম্মুখ-দৃশ্য কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে তা দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি। চিত্র—৪৩-এ টোডা-কুটিরের ছাদের খড় কিছুটা সবিয়ে আমরা ভিতরে কাঠেব কাজটা দেখাবার সুযোগ করে দিয়েছি। সব কয়টি গুহা-চৈত্যেই ঐ জাতীয় কৃত্রিম বীম-ববগা বা বাফটার-পার্লিন খোদাই করা আছে। চিত্র—৭৬-এ উনবিংশ গুহা-চৈত্যের অভ্যন্তরভাগ এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এছাড়া, চিত্র—৪৩ থেকে চিত্র—৭৭-এ সব কয়টি গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথেই ববগা বা পার্লিনেব

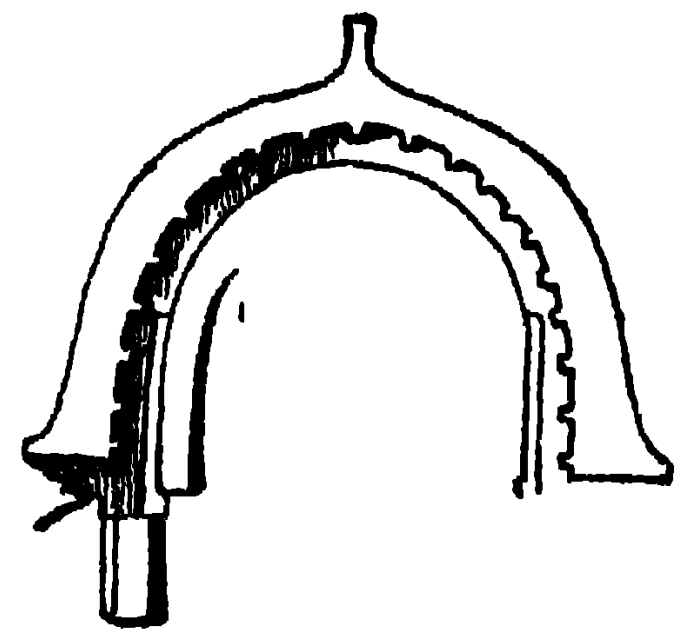
প্রাচুর্যদেখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, অনেকক্ষেত্রে গুপ্তগুলি জমি থেকে ঠিক খাড়াভাবে ওঠে নি। কাঠের খুটি যেমন বাকা করে ঠেং দেওয়া হয় (পার্শ্বগা প বা side thrust-এর প্রতিবিধান করতে), সেভাবে বাকা করে বসানো। লোমশঋষির প্রবেশ-পথে (চিত্র—৪৪) এটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয়তঃ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবেশ-পথের উপরে একটি গবাক্ষ তৈরি করা হয়, যাকে বলে “মূষ-গবাক্ষ”।



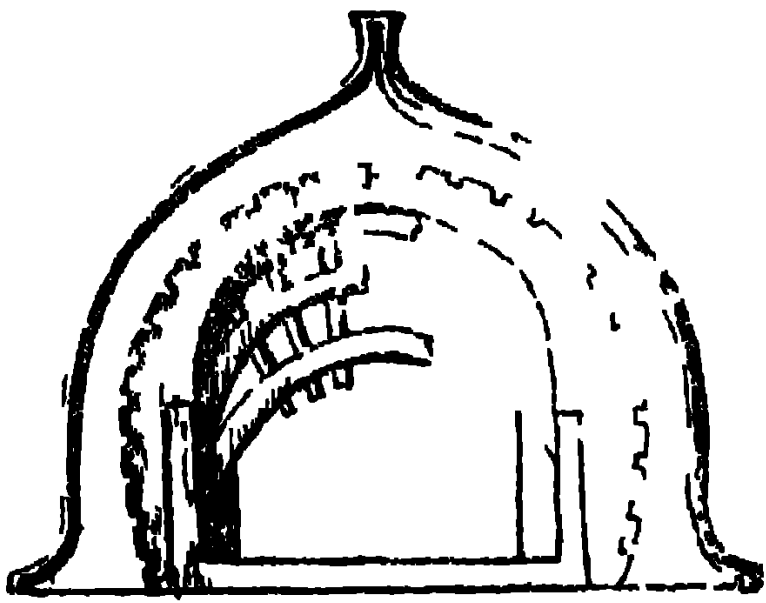
চিত্র - ৪৩



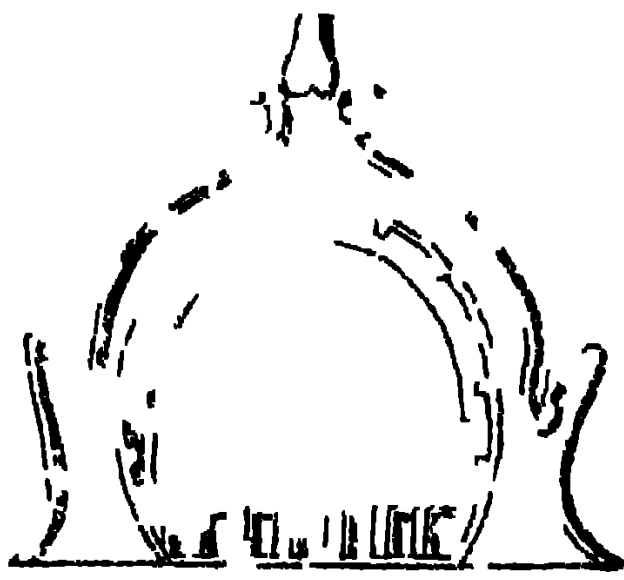
চিত্র—৪৪



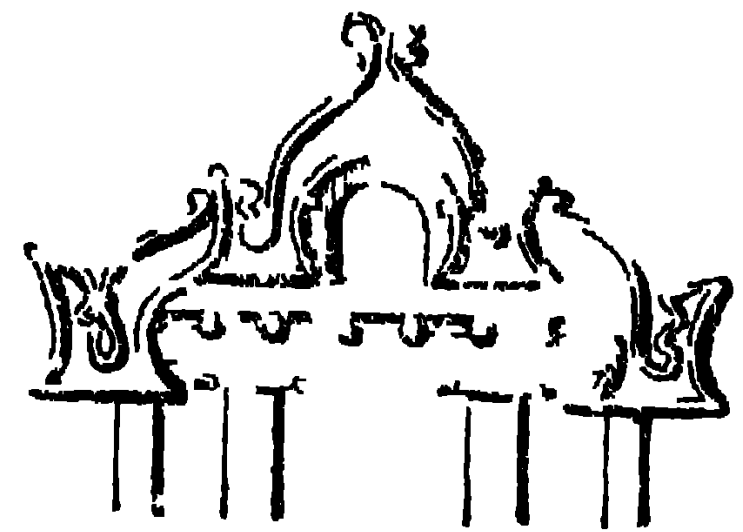
চিত্র—৪৫



চিত্র ৪৬



চিত্র—৪৭



চিত্র ৪৮

গুপ্তা-চৈতন্য কথায় এই পদ্ধতি লোমশ ঋষির বিহা-বিহাবের কথা। লোমশ মত বৌদ্ধ শ্রমণদের আবাস-স্থল এই বিহা-গুপ্তিদের একটা সামান্যদিসম্মত কপ আছে। অজগুয় ত্রিংশতি, অষ্টম, দ্বাদশ ও এয়োদশ বিহাব হচ্ছে প্রাচীনতম। এগুলি গুপ্তপূর্ব গুপ্ত বিহাব কালের এবং হীনযান বৌদ্ধ যুগের। এগুলিতে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ অভ্যন্তরীণ অংশে কক্ষ, দ্বিতীয়তঃ, এতে কোন গুপ্ত নেই, তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রস্থ হলেও সপ্তম কয়েকটি ছোট ছোট খুপরি বা গুপ্তগুপ্ত আছে। এই গুপ্তগুপ্তগুলির উপরে মূষ-গবাক্ষের মত কয়েকটি জানালার প্রতীক। এগুলি কিন্তু সত্যিকারের গবাক্ষ নয়- আলো-হাওয়া যাওয়ার পথ, এ গুপ্ত অলঙ্কার। চতুর্থতঃ, এই প্রাচীনতম বিহাবে কোন গুপ্ত নেই। বুদ্ধমূর্তি থাকার হেতু প্রশংসিত ওঠে না, যেহেতু এগুলি হীনযান যুগের।। পঞ্চমতঃ, বিহাবের ভিত্তি পাথরের খোদাই-করা শয়নের উপযুক্ত আসন বা বেদী আছে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা হীনযানী বৌদ্ধ শ্রমণদের জীবনযাত্রার কথা কিছুটা আন্দাজ করতে পারি। প্রথমতঃ, তাঁরা চৈত্যা-গুহাকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন—তাই আদিম গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথে নানাবকম অলঙ্করণেব প্রচেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজেদের আবাস-স্থল বিহারগুলির প্রবেশ-পথে কোনবকম অলঙ্করণ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, হীনযানী শ্রমণের দল মূর্তিপূজা অথবা প্রতীক পূজার চেয়ে ‘শীল’ ও ‘বিনয়’-এর উপবেই বেশি জোর দিতেন। তাঁর বিহারে ভূপের কোন অস্তিত্ব নেই। তৃতীয়তঃ, অনুমান করতে পারি, সাধারণ শ্রমণরা মাঝের হল-কামবায় নৈশ বিশ্রাম করতেন এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চ-শ্রেণীর অর্হতেবা ঐ ছোট ছোট খুপরিগুলিতে বাস করতেন। চতুর্থতঃ হীনযানী যুগের প্রস্তুত-শয্যা পববর্তী যুগের বিহারে দেখতে না পাওয়ার কারণ হিসাবে অনুমান করছি, পববর্তী যুগে কাঠের তৈরী চৌকি ব্যবহার করা হত।

মহাযান যুগেই অজন্তার অধিকাংশ বিহার নির্মিত। কালানুক্রমিকভাবে আমরা তাদের চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি :

প্রথম পর্ব : ৪০০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ গুহা নং ৬, ৭, ১৫, ১৬ ও ১৭

দ্বিতীয় পর্ব : ৫০০—৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ১৮, (১৯) ও ২০

তৃতীয় পর্ব : ৫৫০—৬০০ খ্রীষ্টাব্দ—গুহা নং ২১, ২২ ও ২৩

চতুর্থ পর্ব : ৬০০—৬৪২ খ্রীষ্টাব্দ গুহা নং ১—৫, ১৪, ২৪, ২৫ (২৬), ২৭, ২৮, (২৯)

বন্ধনীর ভিতর উল্লিখিত অর্থাৎ গুহা নং ১৯, ২৬ ও ২৯ অবশ্য বিহার নয়, চৈত্যা সময়-কাল বোঝাবার জন্য এগুলি উল্লেখ কবেছি।

এগুলি গুপ্ত ও চালুক্য রাজবংশের শাসনকালে নির্মিত। বেশ বোঝা যায়, আদিম পবিকল্পনাকারের স্থান-নিবাচন এতই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, ধীরে ধীরে অজন্তাতেই অধিকসংখ্যক শ্রমণ এসে বসবাস করতে শুরু করেন। ফলে, অজন্তার দশম চৈত্যের সমসময়ে অথবা পববর্তী কালে অন্ততঃ যেসব গুহা-চৈত্যা নির্মিত হয়েছিল—যথা ভাজা, কার্লে, নাসিক প্রভৃতি—সেগুলিতে সম্প্রসারণের প্রয়োজন ততটা অনুভূত হয় নি, যতট হয়েছিল অজন্তায়। তাই ক্রমাগত একটির পর একটি বিহার অজন্তায় বানাতে হয়েছে নবীন আগন্তুকদের স্থান দিতে। আবার যখন দেখা গেল, নবীন আগন্তুকদের আর পূর্বকার উপাসনা-চৈত্যা স্থান হচ্ছে না, তখন নূতন চৈত্যাও তৈরি করতে হয়েছে। এভাবেই আদিম শিল্পীর দশম চৈত্যা-লাঙ্কিত অজন্তা ছদিকে ছ-বাহু প্রসারিত করে মহিমময়-রূপে ক্রমে সম্পূর্ণ পাহাড়টাকেই আলিঙ্গনবদ্ধ করেছে।

হীনযান বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা^১ ছিলেন বস্তুতঃ জ্ঞানমার্গী। তাঁরা ধ্যান করতেন, তপস্যা করতেন, চারিত্রিক শীলতার দিকে ছিল তাঁদের প্রথম দৃষ্টি। বোধ করি, প্রাতে ও সন্ধ্যায় তাঁরা সমবেত হতেন চৈত্যা-গুহায়। সমবেতকণ্ঠে প্রার্থনা করতেন এবং তাবপর নিজ নিজ বিহারাবাসে ফিরে এসে ধ্যানে বসতেন। কিন্তু মহাযানী ভিক্ষুরা ক্রমে হয়ে

(১) পরিণিষ্ট ভ্রষ্টব্য

পড়লেন ভক্তি-মার্গের পথিক। তাঁরা ধর্মাচরণের সময় বুদ্ধমূর্তির পূজা করতে ইচ্ছুক। তাই বারে বারে, দিনের মধ্যে অনেক বার তাঁদের যেতে হত চৈত্যে—ভূপমূলে পূজা, নৈবেদ্য, অর্ঘ্য দান করতে। কলে, সমস্ত দিবারাত্রই চৈত্যে লেগে থাকত ভীড়। এই অশুবিধার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্মই বোধ করি বিহারেও ভূপ তৈরি করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কিন্তু বিহারেই যদি পূজার ব্যবস্থা করা অনুমোদনযোগ্য হয়, তাহলে ভূপ কেন, একেবারে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরি করলেই হয়। তাতে তো আর বাধা নেই এখন। তাই দেখছি, মহাশয় যুগে বিহারের দূরতম প্রান্তে একটি গর্ভমন্দির তৈরি করে তাতে বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিপূজা অনুমোদনযোগ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ চিন্তাধারায় নানান দেব-দেবীর অনুপ্রবেশও ঘটল। তৈরি হল জম্বুনের মূর্তি, হারিতীর মূর্তি—দেওয়ালে চিত্রিত হল শক্র, ব্রহ্মা প্রভৃতির আলেক্ষা।

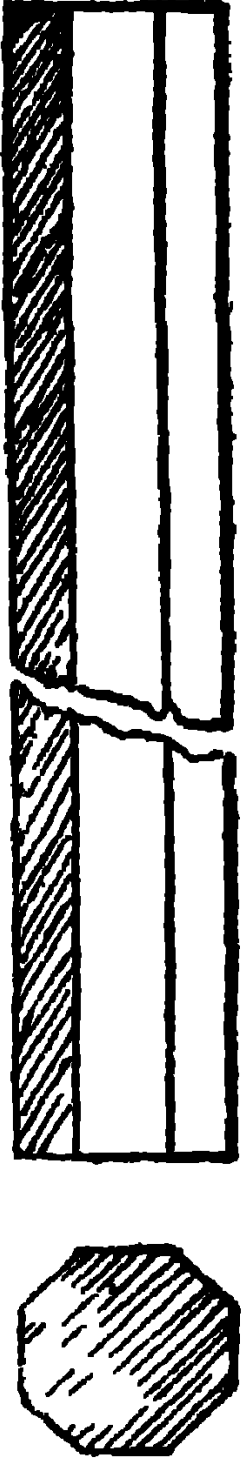
শুধু তাই নয়, কোন কোন স্থানে চৈত্য-ভূপের গায়েও বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হয়েছিল—যেমন দেখতে পাই কাহ্নেরিতে। কিন্তু এর কন্ভাস থিয়োরেমটা অনুমোদিত হল না। অর্থাৎ, মহাশয় যুগে চৈত্য ভূপের গায়ে বুদ্ধমূর্তি খোদাই করা হল বটে, কিন্তু বিহারে বুদ্ধমূর্তির বদলে ভূপ তৈরি হল না। প্রসঙ্গত, বালি, এই নিয়মের একটিমাত্র ব্যতিক্রম দেখতে পাই নার্মিকের তিন নং গুহায়। এটিকে বলা হয় ‘গৌতমীপুত্র বিহার’। এটি একেবারে হীনযান যুগের, কিন্তু এই বিহারে একটি ভূপ খোদাই করা হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমটির পিছনে একটি বিশেষ কারণও ছিল। ঐ গৌতমীপুত্র বিহারে বাস করতেন ভিক্ষুগীরা। মহিলাদের পক্ষে বারে বারে বাসস্থান ত্যাগ করে চৈত্যে যাওয়া অশুবিধাজনক হতে পারে মনে করেই প্রধান অর্থাৎ গৌতমীপুত্র বিহারে একটি ভূপ নির্মাণের বিশেষ অনুমতি দিয়েছিলেন।

চিত্র—৪৪ থেকে চিত্র—৪৮-এ আমরা লক্ষ্য করেছি, গুহা-চৈত্যের প্রবেশ-পথে কি ভাবে ক্রমশঃ অলঙ্করণের বাহুল্য এসেছে। অজন্তায় বিভিন্ন যুগে খোদাই-করা স্তম্ভগুলিকে লক্ষ্য করলেও আমরা দেখব, প্রথম যুগের সরল অনাড়ম্বর স্তম্ভ কেমনভাবে ক্রমশঃ নানা

স্তম্ভ অলঙ্করণে বিভূষিত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার যে, অজন্তায় কোন

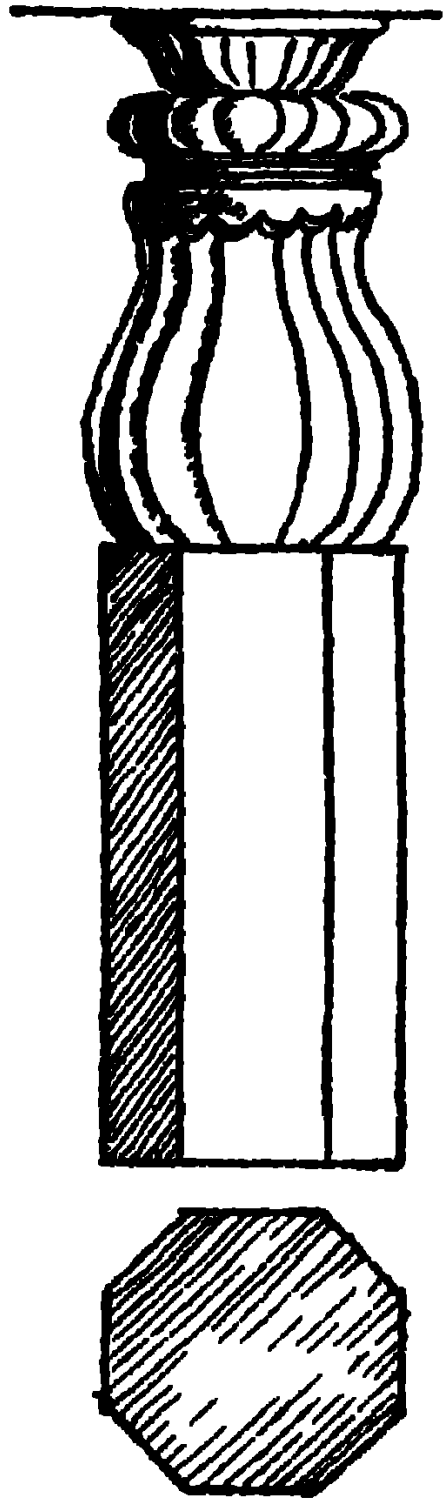
স্তম্ভই ভারবাহী নয়। ছাদের অথবা কোনও বীমের ওজন তারা বহন করছে না। স্তম্ভগুলি ভেঙে ফেললেও ছাদ ভেঙে পড়বে না। অজন্তায় প্রাচীনতম স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি নবম ও দশম গুহায়। এগুলি আট-কোণা এবং জমি থেকে অল্প বাঁকা হয়ে উঠেছে (চিত্র—৪৯)। পরবর্তী যুগের একটি স্তম্ভের চিত্র সপ্তম গুহা থেকে সংকলিত হয়েছে চিত্র—৫০-এ। এখানে দেখছি, অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট নিম্নাংশের উপর সুন্দর একটি ‘ঘট-পল্লব’ এবং তার উপর একটি ‘আমলক’ বসানো আছে। আমলকটি যেন পল-তোলা একটি আমলকী ফল। অজন্তায় এ-জাতীয় অলঙ্করণ এসেছে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে। ষোড়শ গুহাতে দু-তিন রকমের স্তম্ভ দেখতে পাচ্ছি, সপ্তদশ গুহাতেও তাই। আদিম আট-কোণা স্তম্ভও আছে, আবার নানান জাতের অলঙ্করণ-সম্বলিত স্তম্ভও

আছে। চিত্র—৫১-এ ষোড়শ বিহারের একটি বিশেষ জাতের স্তম্ভের সেক্সানাল প্র্যান, এলিভেসান ও স্কেচ সংযোজন করা গেল। তাতে পরিষ্কার চারটি অংশ দেখতে পাচ্ছি। (i) সবার নিচে চতুষ্কোণ পাদপীঠ। (ii) তার উপরে আট-কোণা দ্বিতীয় অংশ, সেখানে অমরাবতীর অনুকরণে আলিম্পন-নকশা। (iii) তার উপরে ষোল-কোণা-বিশিষ্ট স্তম্ভের মধ্যদেশ, যার উপরে আবার ঐ অমরাবতী-নকশা। (iv) সবার উপরে চতুষ্কোণ গ্র্যাবাকাস, অলঙ্করণ বর্জিত।



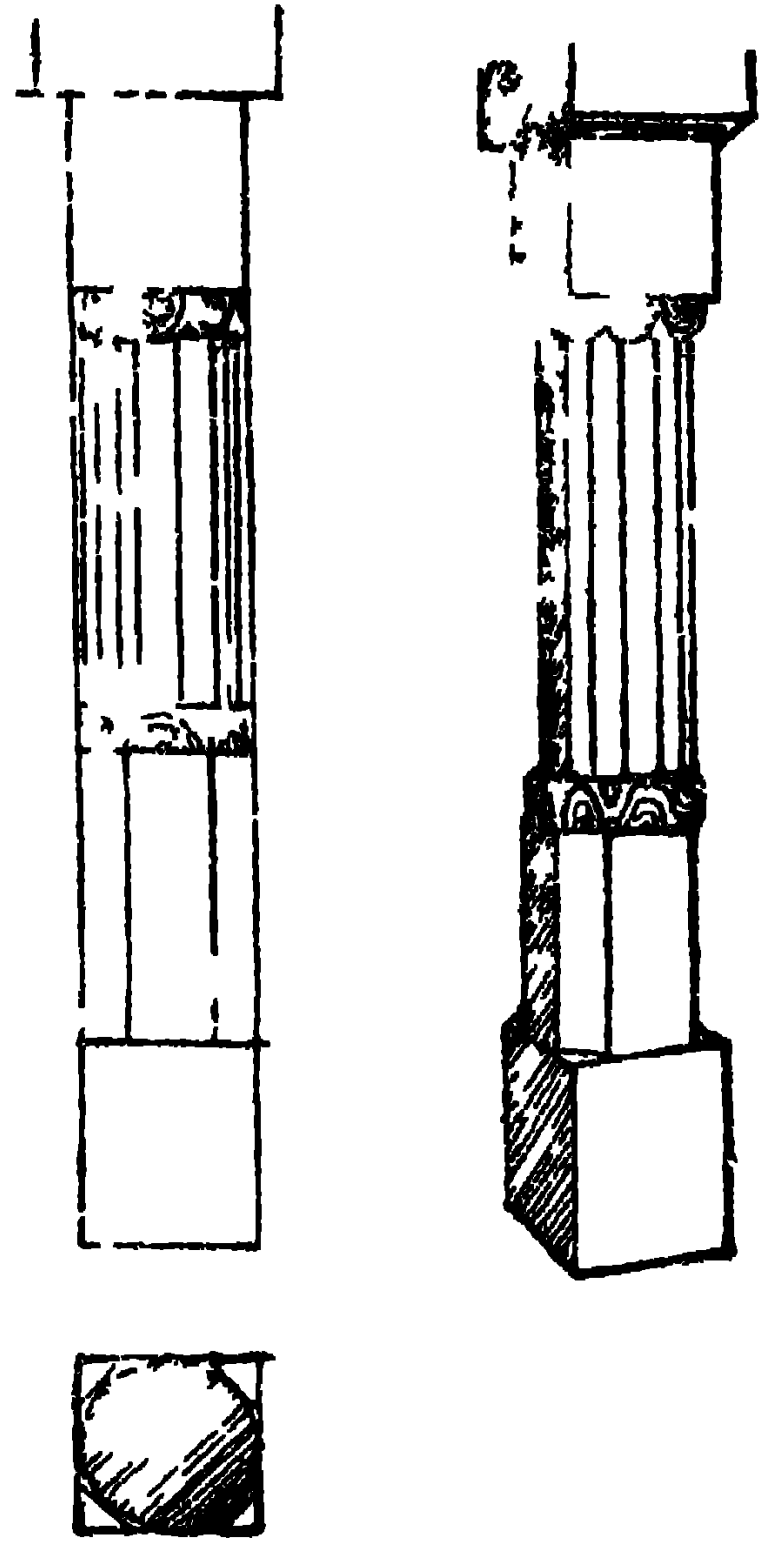
চিত্র—৪৯

অজস্র প্রাচীনতম স্তম্ভ
(নবম ও দশম শতাব্দী)



চিত্র—৫০

সপ্তম শতাব্দীর প্রবেশ-পথেব স্তম্ভ
(দ্বিতীয় যুগ)



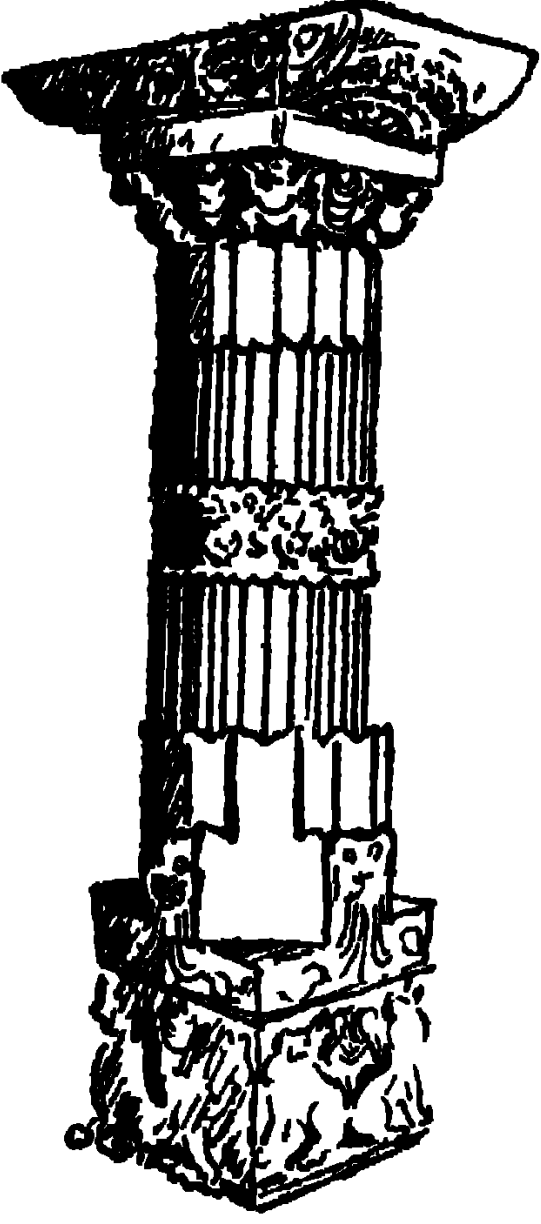
চিত্র—৫১

ষোড়শ-বিহারের অভ্যন্তরস্থ স্তম্ভ
(তৃতীয় যুগ)

সপ্তদশ বিহারটিও প্রায় ঐ একই সময়ে নির্মিত। সেখানকার একটি বিশেষ জাতের চিত্র এখানে দেওয়া গেল। এটিকে আমরা উপরি-বর্ণিত স্তম্ভের পরিবর্তন বলিতে পারি (চিত্র—৫২)। এখানে দেখছি, পর্বেকার উদাহরণের চারটি অংশকে বাড়িয়ে সবসময়ে ছটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: (i) সবার নিচে চতুষ্কোণ পাদপীঠটি এবার মোটেই অলঙ্করণ-বর্জিত নয়। (ii) তার উপরের অংশে কিছুটা চতুষ্কোণ এবং কিছুটা আট-কোণা। তাতে আবার রাক্ষসের মুখের নকশা। (iii) মধ্যদেশের ষোলো-কোণা-বিশিষ্ট অংশের মাঝামাঝি আছে একটি বাজুবন্ধ ধরনের নকশা। এতে লম্বাটে মধ্যদেশের একঘেয়েমি দূর হয়েছে। (iv) তার উপরে আবার একটি আট-কোণা অংশ। (v) শীর্ষদেশের গ্র্যাবাকাস, সেখানে ক্ষুদ্রকায় বামনগতি। (vi) সবোচ্চ ত্র্যাকোটটিও নূতন ধরনের।

সপ্তদশ শতাব্দীর নানান জাতের স্তম্ভ আছে। তার ভিতর একটিমাত্র এখানে আলোচিত হল। পরবর্তী উদাহরণটি (চিত্র—৫৩) গ্রহণ করা হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর

চৈত্যের প্রবেশ-পথ থেকে। চিত্র—৭৬-এ এই সম্পূর্ণ ফাসাদটিকে দেখানো হয়েছে। সেখানে প্রবেশ-মুখের ছদিকে এই স্তম্ভ দুটিকে দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। এবার দেখছি, বৈচিত্র্য-সম্পন্ন অজস্রা-শিল্পী আর চতুর্দশ প্রস্তরখণ্ডে পাদপীঠ তৈরি করতে রাজী নন। পাদপীঠটি এবার আট কোণা এবং তাতে তিন-সারি ধাপ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ নক্ষণীয়, উপরের দিকে ঘট-পল্লবের আধখানামাত্র খোদাই করা হয়েছে। আমলকটিকেও এবার আমদানি করা হয়েছে।



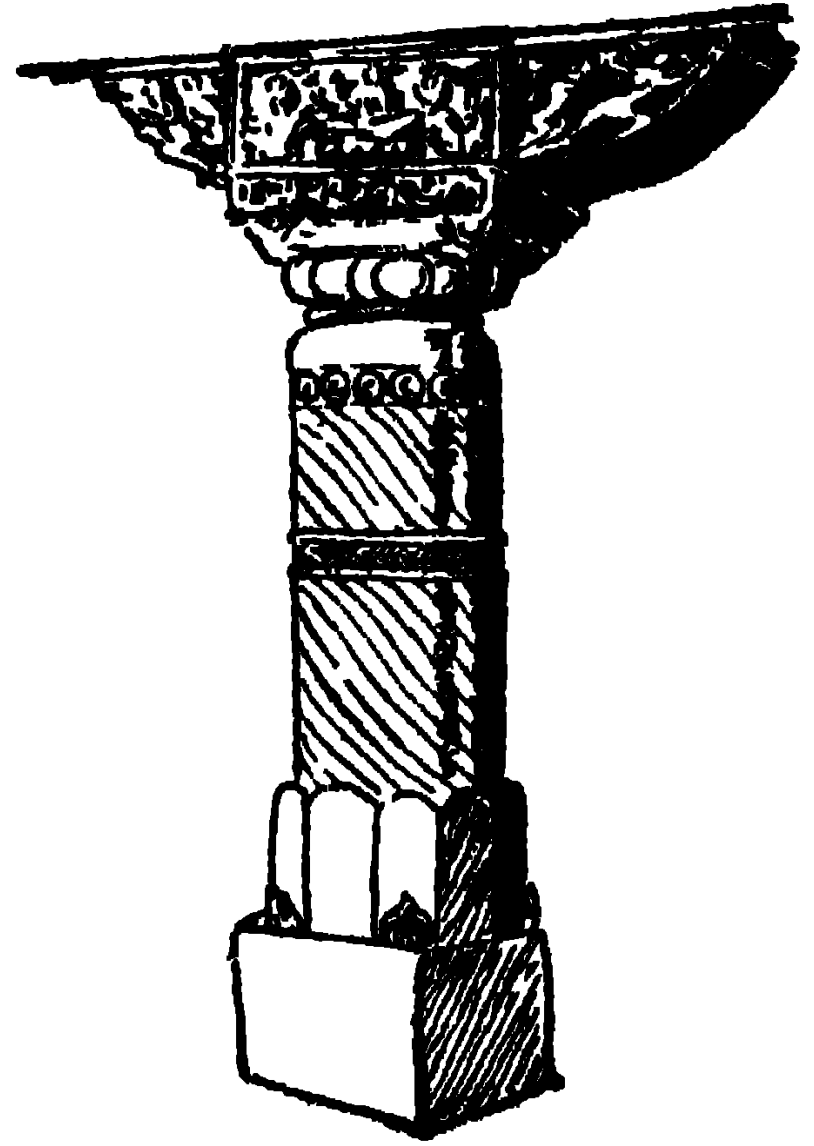
চিত্র—৫২

সপ্তদশ বিহারে অভ্যন্তরে
(তৃতীয় যুগ)



চিত্র—৫৩

উনবিংশতি চৈত্যের ফাসাদে
অবস্থিত স্তম্ভ (চতুর্থ যুগ)



চিত্র—৫৪

প্রথম বিহারের অলিন্দে অবস্থিত
(শেষ যুগ)

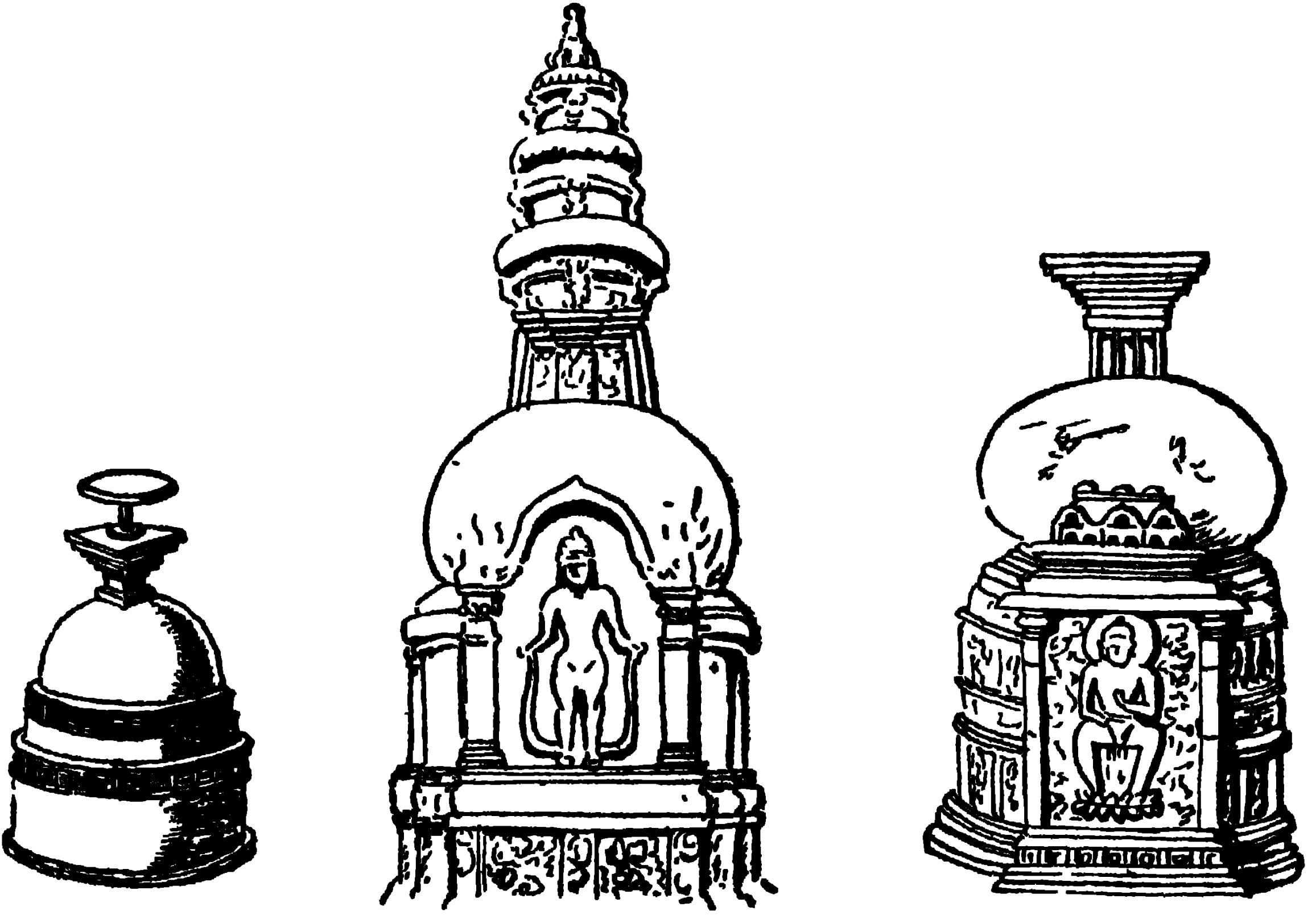
শেষ উদাহরণটি প্রথম গুহা-মন্দিরের সম্মুখস্থ বারান্দা থেকে নেওয়া (চিত্র—৫৪)।

স্তম্ভের বিষয়ে আলোচনা ঐ পর্যন্ত। এবার আমরা স্তম্ভের বিষয়ে আলোচনা করব। অজস্রায় স্তম্ভ আছে চারটি। সেগুলি আছে এখানকার চারটি চৈত্যের প্রত্যক্ষদেশে ;—নবম, দশম, উনবিংশতিতম ও ষড়বিংশতিতম চৈত্যে। নবম ও দশম চৈত্যের স্তম্ভ হীনযানী-যুগের অলঙ্করণ-বর্জিত। নাসিক, ভাজা, কার্লে প্রভৃতি চৈত্যের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য পকট। দশম গুহার স্তম্ভের একটি ভার্টিকাল সেক্সান চিত্র—৩৮-এ আমরা দেখেছি। এখানে চিত্র—৫৫-তে কার্লে-চৈত্যের একটি নকশা সংযোজিত হল তুলনা করলেই বোঝা যাবে, দুটির সৌসাদৃশ্য কতখানি।

উনবিংশতিতম চৈত্যের স্তম্ভটি অনেক পরে তৈরী—মহাযান যুগে। এখানে দেখছি (চিত্র—৫৬), সেই আদিম সরল স্তম্ভ আর নেই। নানান রকম অলঙ্করণে ভরে উঠেছে তার সর্বাঙ্গ। পাদপীঠে নানারকম পল-তোলা নকশা খোদাই করা হয়েছে। মধ্যভাগে দুটি ছোট স্তম্ভও খোদাই করা হয়েছে। মাঝখানে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। অণ্ডটি গোলাকৃতি; তার সম্মুখভাগে অজস্রার বিশেষ জাতের খিলানের নিচে যেন একটি কুলুঙ্গি—

তাতে আছে একটি বুদ্ধমূর্তি। কার্লে স্তূপে অণ্ডের উপর কর্বেলিঙ-করা যে অংশটা আছে, তাকে বলে হর্মিকা ; বর্তমান উদাহরণেও সেই কর্বেলিঙ-করা হর্মিকার আদিম রূপটি আছে অবিকৃত। তার উপর রচিত হয়েছে তিনটি ছত্র, যাকে বলে ছত্রাবলী। আরও লক্ষণীয়, ছত্রাবলীর উপরে আছে একটি অংশ, ক্ষুদ্রায়তন একটি আমলক, যা নাকি ইতিপূর্বে কোথাও দেখি নি।

ষড়বিংশতিতম চৈত্য স্তূপটির সঙ্গে (চিত্র—৫৭) পূর্বোক্ত স্তূপের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। বৈসাদৃশ্যও কম নয়। এবারে দেখছি, পাদপীঠ বা মেধির আপেক্ষিক উচ্চতা অনেকটা কম। পূর্বোক্ত স্তূপে জমি থেকে খাড়া হয়ে উপরে-ওঠা রেখার প্রাবল্য ছিল। এবারে দেখছি, জমির সমান্তরাল সরলরেখার সংখ্যাও কম নয়। তার কারণ, ঊনবিংশতিতম



চিত্র—৫৫

চিত্র—৫৬

চিত্র—৫৭

কার্লে চৈত্যের স্তূপ খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী ঊনবিংশতিতম চৈত্যের স্তূপ ষড়বিংশতিতম চৈত্যের স্তূপ স্তূপের গঠনটি এমন, যেন উচ্চতার দিকেই আমাদের নজরটা টানে। তাই অধিকাংশ রেখাই মাটি থেকে খাড়াভাবে উপরের দিকে উঠেছে (চিত্র—৫৬)। অপরপক্ষে, ষড়বিংশতিতম চৈত্য স্তূপটির আকার এমন, যেন সেটি উচ্চতা ও প্রস্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে চায়; তাই সেখানে জমি থেকে খাড়া ও জমির সমান্তরাল রেখাগুলি ভারসাম্য রক্ষা করে রচিত। তাই বুদ্ধমূর্তির উপর এবার আর খিলান নেই, জমির সমান্তরাল লিটেল খোদাই করা হয়েছে। এই লিটেলের উপর ক্ষুদ্রাকৃতি তিনটি অজ্ঞতা-খিলান—সেই ত্রিবর্ণিকার প্রতীক। অণ্ডটিও অনেকটা চাপা। কিন্তু হর্মিকার সেই খাঁজ-বার-করা কর্বেলিঙ, সেই নিচের থাকের চেয়ে উপরের থাকের বেশি ঝুঁকে

ধাকার প্রাচীন কায়দাটা আছে অব্যাহত। সেই আদিম কার্ণের অনুকরণ। এখানে বুদ্ধমূর্তিটি দেখছি ধর্মচক্রমুদ্রায়।

লক্ষ্য করে দেখুন, ঊনবিংশতিতম গুহার স্তূপটির সামগ্রিক রূপটা হচ্ছে মোচার মত (কনিকাল)। তলার দিকে মোটা, উপরদিকে ক্রমশঃ সূচালো। পাদপীঠের তুলনায় স্তূপের সামগ্রিক উচ্চতাটা বেশি। তাই অজন্তার ভাস্কর এখানে বুদ্ধদেবের দণ্ডায়মান মূর্তি খোদাই করেছেন। তাই তাঁর দুই হাত থেকে মালার আকারে দুটি বস্ত্রখণ্ড নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। দেখুন, বুদ্ধমূর্তিটি স্তূপের সামগ্রিক আকৃতির সঙ্গে যেন এক সুরে বাঁধা।

এবার দেখুন, ষড়বিংশতি গুহার স্তূপটিকে (চিত্র—৫৭)। এখানে বুদ্ধদেব উপবিষ্ট। কলে, মূর্তির প্রস্থ ও উচ্চতা স্তূপের সামগ্রিক রূপের সঙ্গে আবার এক সুরে বাঁধা হয়েছে। কারণ, এ স্তূপটি প্রস্থের তুলনায় সূচালো নয়। বুদ্ধমূর্তির তিনটি ভাগ—তলায় পাদপীঠ-ভরা পদ্ম, মাঝখানে তথাগতের দেহাবয়ব, উপরে গোলাকৃতি জ্যোতিঃপ্রভা বা ছটা। সমগ্র স্তূপটিরও তলায় পল-তোলা পাদপীঠ বা মেদিকা, মাঝখানে লিটেল পর্যন্ত মধ্যাংশ এবং উপরে গোলাকৃতি অণ্ড। যেন দুটি ক্ষেত্রেই শিল্পী বলতে চাইছেন—হে তীর্থযাত্রী, অনুধাবন কর, স্তূপ ও বুদ্ধদেব অভিন্ন!

অজন্তা প্রদক্ষিণ-পথে দশম গুহা থেকে পথ হারিয়ে আমরা এতক্ষণ ভারতীয় স্থপতির ইতিহাস-রাজ্যে বিচরণ করছিলাম। এতক্ষণে আবার আমরা অজন্তা-গুহারাজ্যে ফিরে এসে বাদবাকি শিল্প-নিদর্শনগুলি দেখবার চেষ্টা করতে পারি।

দশমের পরে একাদশ গুহা। এটির নির্মাণকাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। পাসি ব্রাউনের মতে, এটিও যথেষ্ট প্রাচীন—হীনযান যুগের শেষ পর্যায়ে অথবা মহাযান যুগের উষা মুহূর্তে এটির নির্মাণ শুরু হয়। তিনি বলেছেন, সম্ভবতঃ
 একাদশ গুহা প্রথম শতাব্দীতে এর খনন-কার্য আরম্ভ করা হয়। অথচ অন্যান্য গ্রন্থে দেখছি এটি পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত।

বিহারটি ৩৭ ফুট লম্বা, ২৮ ফুট চওড়া এবং উচ্চতা প্রায় ১০ ফুট। সম্মুখস্থ অলিন্দের স্তম্ভগুলিতে দেখছি চতুষ্কোণ পাদপীঠ, আট-কোণা মধ্যাংশ এবং চওড়া শীর্ষপীঠ। বিহারের ছাদে নানান জাতের জ্যামিতিক নকশা আর ফুল-লতা-পাতা আঁকা। অলিন্দের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরে বুদ্ধদেবের একটি চিত্র—তার দু-পাশে দুটি বোধিসত্ত্ব। অলিন্দ থেকে বিহারে প্রবেশের জন্তু নির্মিত দ্বারের বামদিকে, ভিতরের দিকে সুন্দর একটি বোধিসত্ত্বের আলেকথ্য। তাঁর হাতে সেই লীলাপদ্ম—তিনি বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি। বোধিসত্ত্বের বামে দুটি রমণী অর্ঘ্য দান করছে—তার ভিতর একটি নারীচিত্র নিখুঁতভাবে আঁকা।

একাদশ বিহারেও দেখলুম সেই চার হরিণের একমাথার শিল্প-চাতুর্য। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলুম এই যে, দূরতম প্রান্তে বুদ্ধমূর্তির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ-পথ আছে—যা নাকি অন্য কোন বিহারে নেই।

আগেই বলেছি, এ গুহাটির কাল-নির্ণয় নিয়ে মতানৈক্য ঘটেছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে। পার্সি ব্রাউন সাহেবের গ্রন্থটি পূর্বে প্রকাশিত। ফলে, অনুমান করছি, পরবর্তী গ্রন্থকাবরা পরবর্তী গবেষণার ফলাফলপাই এটিকে পঞ্চম শতাব্দীতে চিহ্নিত করেছেন। আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেন্টে এ-সব গবেষণার ফলাফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়, সহজলভ্য রিপোর্ট থেকে আমি তা বুঝতে পারি নি। সংধারণ দর্শক হিসাবে আমার তো মনে হয়েছে পার্সি ব্রাউন সাহেবের যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, এই একাদশ গুহাতেও দেখছি নার্সিকেব অনুকরণে সেই প্রস্তর-শয্যা—যা নাকি ত্রিশতী, অষ্টম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বিহারের বৈশিষ্ট্য বলে মনে হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত পঞ্চদশ, ষোড়শ বা সপ্তদশে তো তা নেই। তাই আমার মনে হয়েছে, এ গুহা-বিহারটি মহাযান যুগের উষাকালেই প্রথম খনন করা শুরু হয়েছিল—যদিও গর্ভমন্দিরস্থ প্রদক্ষিণ-পথসম্মত বুদ্ধমূর্তি, চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি অনেক পরের যুগের যোজনা। অবশ্য বিশেষজ্ঞের নির্দেশে আমার এ নিছক আন্দাজ সম্বন্ধে বলে প্রমাণিত হতে পারে।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গুহার কথা আমরা আগেই বলেছি। পঞ্চদশ গুহার বৈশিষ্ট্য
 ৭ দশ ও হল এই যে গটি তীনমান যুগের না হওয়া সত্ত্বেও এতে কোনও
 দ্বাদশ বিহার স্তম্ভ নেই

এর পব আমরা ফ্রেস্কো-সমৃদ্ধ ষোড়শ বিহারে পদার্পণ করতে পারি।

এই ষোড়শ বিহারের প্রবেশ-পথে দুটি অপর ভাস্কর্যের নিদর্শন দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হল নাগরাজ। ও নাগবানী দ্বিতীয়টি হল বিশালায়তন দুটি নতজানু হস্তিমূর্তি। প্রবেশ-পথে বলা অবশ্য ঠিক হল না। যে সমতল পথটি বাগোডা নদীর চক্রাবর্তনেব সমান্তরালে অজ্ঞতা-গুহাগুলিকে সংযুক্ত করেছে, সেই পথ থেকে ষোড়শ বিহারে প্রবেশ করতে হলে আবার কতকগুলি সোপান অতিক্রম কবে আসতে হয়। সেই সোপান-শ্রেণীর প্রথম ধাপের কাছে আছে যুগল হস্তী, মধ্যপথে বা ল্যাংগুণ্ডে আছে নাগরাজ ও রানীর মূর্তি।

নাগ-দম্পতির মূর্তি একটি কুলুঙ্গির মধ্যে খোদিত। বসে আছেন দুজনে একটি প্রস্তরাসনে। রাজার বামপদ প্রলম্বিত, বামহস্তে দেহভার সংরক্ষিত। দক্ষিণহস্তটি ভেঙে গেছে। নাগরানীর মুখটি ঈষৎ ফেরানো, তিনি যেন সোপানবাহী যাত্রীদের দেখছেন। রাজার দক্ষিণে একজন চামরধারিণী। রাজার মাথায় বিরটাকার নাগের ফণা। কুলুঙ্গির দুপাশে দুটি স্তম্ভ -গোলাকৃতি, কোন পাদপীঠ নেই, কিন্তু শীর্ষপীঠে মঙ্গলকলস ও আমলক আছে।

দ্বিতীয় মূর্তি অর্থাৎ নতজানু যুগল হস্তিমূর্তির বিষয়ে মহম্মদ ইসমাইল সাহেব আমাকে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য জানিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগে মহম্মদ মীর্জা ইসমাইলের পরিচয়টা আপনাদের জানাতে হয়।

(১) 'বাক্তরর একানে বুড়ো' নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী বেশ পত্রিকার একবার লিখেছিলাম। তাতে এ তৃতীয় একটি কল্পিত নাম ব্যবহার করার আমাকে গুরু বিব্রত হতে হয়েছিল দণ্ডক-শবরী'ত বর্ণিত কয়েকটি চরিত্র সম্বন্ধেও আমার কাছে বহু প্রশ্নাণ গ্রাসছিল। তাই সবিনয় বলে রাখতে চাই—এ নামটি কল্পিত বাস্তবে গাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল ভাঁকে যাতে সনাক্ত করা না যায় তাই তার নাম কাপে ইচ্ছাকৃত পরিবর্তন ঘটিয়েছি।

অজন্তায় পৌঁছে গুহা-মন্দিরগুলির অবস্থান দেখাবার উদ্দেশ্যে আমি একটি সাইট-প্ল্যান আঁকবার চেষ্টা করি। আমার সে প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি এ গ্রন্থের চিত্র -১। গাইড বইতে অজন্তার মাপ নেই।

অজন্তার বিষয়ে একটি চিত্র-বহুল মোটা বই^১ সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। সত্তর টাকা দাম। তাতে অজন্তার কোন মাপ নেই। ইয়াজদানী সাহেবের চার খণ্ডে প্রকাশিত প্রামাণিক গ্রন্থে মাপ আছে, কিন্তু উত্তর-নির্দেশক রেখাটি নেই। কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে লেডি হেরিংহাম-সকলিত যে গ্রন্থটি আছে, তাতেও অজন্তার প্ল্যান পাই নি। সে প্রাচীন গ্রন্থে প্রথম দশটি পৃষ্ঠাই নেই। আমার সঙ্গে এছাড়া ছিল ভারতীয় স্থাপত্যের উপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ, কিন্তু মুশকিল এই যে, সে বইতে প্লানে যে উত্তর-নির্দেশক রেখা আছে, আমার কম্পাস বলছে সেটা দক্ষিণ দিক^২। সূর্য তখন মথুর উপর। উত্তর দিকটা সনাক্ত করতে পারছি না। ফলে, রীতিমত মুশকিলে পড়লাম। সূর্য-গবাক্ষের অবস্থানের সঙ্গে উত্তর নির্দেশক রেখাটির নিবিড় সম্পর্ক—ওটা না হলে চলবে না। জরীপের কাজে বহুবার বহু সমস্তার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু প্রামাণিক গ্রন্থের নির্দেশ এভাবে নষ্ট করে নি কখনও আমার দীর্ঘদিনের সহচর এই ছোট কম্পাসটি।

শেষ পর্যন্ত কম্পাসটি হাতে নিয়ে হাজির হলাম আফিসের অফিসের অফিসে অর্থাৎ টিকিট-ঘরে। অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলি—মাপ করবেন, আপনাদের এখানে উত্তর দিক কোন্টা?

ভদ্রলোক হেসে বলেন—এমন অদ্ভুত কথা তো কখনও শুনি নি। আপনার হাতে কম্পাস, আর আপনি উত্তর দিক খুঁজতে এই অফিসের ভিতরে এসেছেন?

আমি বলি, কিন্তু মুশকিল কি জানেন, কম্পাস ছাড়াও আমার হাতে রয়েছে ভারতীয় স্থাপত্যের উপরে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

বইটি মেলে ধরি ওঁর সামনে।

ভদ্রলোক অবাক হলেন। অফিসের আলমারি থেকে ওঁর নিজস্ব বইটি বার করে দেখে বলেন—আশ্চর্য, এটা তো এতদিন নজরে পড়ে নি।

এই সূত্রে আলাপ হল ভদ্রলোকের সঙ্গে। আমার উদ্দেশ্যের কথা শুনে বলেন—আচ্ছা, আপনার একটা সুাবধা করে দিই। ডা. ইয়াজদানীর একজন বন্ধু ছাত্র এখনও এখানে আছেন। নিজাম সরকারে পুরাতত্ত্ব-বিভাগে চাকরি করতেন, ডা. ইয়াজদানীর শিষ্য হিসাবে দীর্ঘদিন এই গুহা-মন্দিরে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। অবসর নেবার পরও অজন্তা ছেড়ে যেতে পারেন নি। তিনকূলে তাঁর কেউ নেই। এই গুহার আকর্ষণে ডনি এখানেই পড়ে আছেন, এখন গাইডের জীবিকায় গ্রাসাচ্ছাদন করেন।

(১) Ajanta & Ellora—By Gupte & Mahajan, Taraporevala, Bombay

(২) Indian Architecture (Buddhist & Hindu Period)—By Percy Brown, Taraporevala Publication, 2nd Enlarged Edition, Page 28.

উনি খবর পাঠালেন। ভদ্রলোকের আসতে যেটুকু দেরী হল তার মাঝে আমাকে সাবধান করে দিলেন—গুণীলোক, বুঝেছেন, কিন্তু ভারী খামখেয়ালী। জাতকের কাহিনীগুলি ঠাঁর কণ্ঠস্থ—চোখ বুজে প্রতিটি চিত্রের অবস্থান বলে যেতে পারেন।

তারপর টিকিটবাবুর দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে একটু ঝুঁকে পড়েন আমার দিকে। অরুচিস্বরে বলেন—আর একটা গোপন কথা! এই গুহা-চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ একটি সুদরীকে নাকি উনি ভালবাসতেন, আর তাই এখান থেকে অন্য কোথাও গিয়ে বেশিদিন টিকতে পারেন না। দারোয়ানদের অনেকেই বলেছে—যা হী না থাকলে উনি সেই নারীচিত্রটির সামনে নাকি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

প্রচণ্ড কৌতূহল হল, বলি—কোন চিত্রটি বনুন তো?

কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব শুনবার আগেই দ্বারপ্রান্তে পদধ্বনি শুনতে পেলুম। এসে উপস্থিত হলেন ভদ্রলোক। মহম্মদ মীর্জা ইস্মাইল। শীর্ণকায় বৃদ্ধ, মাথায় একমাথা সাদা চুল—গাঁফ-দাড়ি কামানো। গায়ে গলাবন্ধ কোট, মাকলার, পরিধানে পায়জামা। বশুর্ক ইংরেজি বলতে পারেন। আমি অজ্ঞতার বিষয়ে গ্রন্থ-প্রকাশ ইচ্ছুক শুনে সাগ্রহে আমাকে নিয়ে বার হলেন।

অদ্ভুত গুণীলোক। জাতক-কাহিনীগুলি তাঁর কণ্ঠস্থ, এমন দরদ দিয়ে চিত্রগুলির মর্মকথা বর্ণনা করতে থাকেন যে, মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। কিন্তু নবম গুহা পর্যন্ত এসে লক্ষ্য করলুম, ভদ্রলোকের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্রমাগত কাশছেন। প্রশ্ন করে জানি, গতরাত্রি থেকে তাঁর সর্দিকাশ হয়েছে। বলি, আমি এখানে কদিন থাকব, কাল না হয় বাকিটা দেখা যাবে।

ভদ্রলোককে তাঁর পারিশ্রমিক দেবার উদ্যোগ করতেই তিনি এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলেন—মাপ করবেন। আপনার কাছে কিছু নিতে পারব না।

আমি অবাক হয়ে বলি—সে কি, কেন?

—ডাক্তারে কি ডাক্তারের কাছে কি নেয়?

—তার মানে?

—আপনি অজ্ঞতা দেখতে আসেন নি, দেখাতে এসেছেন। আপনি টুরিস্ট নন, আপনি গাইড। আমি ও আপনি স্বগোত্র।

অনেক গীড়াপীড়ি করেও যখন কিছু হল না তখন বলি—তাহলে এক কাজ করুন। আপনি বিদেশী যাত্রী যোগাড় করুন। আমি যখন গাইড তখন আপনার সাক্ষরদি করব। আপনাকে কথা বলতে হবে না—শুধু সঙ্গে থাকবেন। আমি কোথাও কিছু ভুল বললে শুধরে দেবেন শুধু।

—তাতে কার কি লাভ?

—আপনার লাভ আর্থিক, আর আমার লাভ এভাবে ভুল-ত্রুটিগুলি শুধরে নেব। বারে বারে দেখে ও বলে ছবিগুলি মনে গাঁথা হয়ে যাবে।

বাজী হলেন শেষ পর্যন্ত। ইস্‌মাইল সাহেবের সাক্ষেপে আমিও কম লাভবান হই নি।

যাক সে কথা। যে কথা বলছিলাম। ষোড়শ গুহা-মন্দিরের প্রবেশপথে এই যুগল নতজানু হস্তিমূর্তি দেখিয়া উনি বলেন, - হিউ এন-স্যাড কখনও অজ্ঞাত আসেন নি, কিন্তু বৌদ্ধ ভ্রমণদেব মূর্তি গুলে তিনি দাক্ষিণাত্যের একসারি অপূৰ্ণ গুহা-মন্দিরের উল্লেখ কবেছেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে। বলেছেন, সেখানে দেব-নব-নাগ-গন্ধবেরা তো বটেই, এমনকি ঐবাবতুল্য যুগলহস্তী নতজানু হয়ে সেখানে তথাগত বুদ্ধদেবকে শাস্ত্রতর্কাল ধরে প্রণাম কবড়ে।

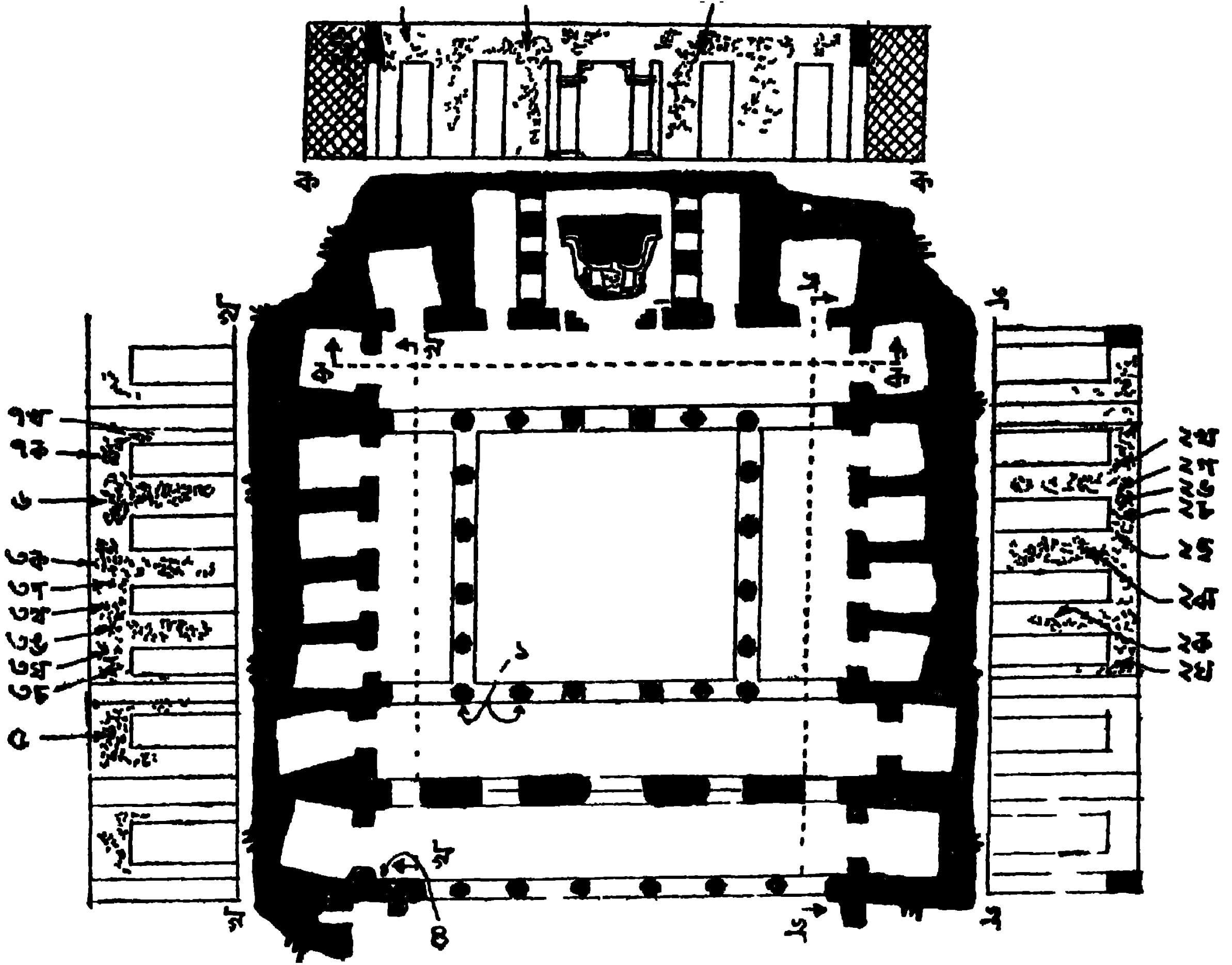
ষোড়শ গুহা-বিহারের প্ল্যান ও শিল্প-নিদর্শনগুলির অবস্থান চিত্র ৫৮-এ দেওয়া গেল। প্রথমেই একটি প্রশস্ত অলিন্দ, প্রায় ৬৫ ফুট দীর্ঘ এবং ১১ ফুট প্রস্থ। সম্মুখে ছটি আট-কোণা স্তম্ভ এবং দুটি অধঃস্থ। স্তম্ভ-গুলির বর্ণনা উপরেই করা হয়েছে (চিত্র ৫১)। অলিন্দের বামপ্রান্তে পাহাড়ের গায়ে শিলালিপি থেকে জানতে পারি, বাকটিক রাজবংশের রাজা হাব্ষেণের আমলে (৭৭৫-৫০০ খ্রীষ্টাব্দ) এই বিহারটি নির্মিত হয়।

অলিন্দের পূর্ব মণ্ডল বিহারের পাঁচ-চতুষ্কোণ স্থল-কামরা। দৈর্ঘ্য ৬৬ ৩ , প্রস্থ ৬৫ ৩ , উচ্চতা ১৫ ৩ । অলিন্দ পার হয়ে উপরে তাকালেই ষোড়শ গুহা-বিহার নজরে পড়বে ক্ষুদ্রাকায় বামনের দল বীম বা কড়িগুলিকে পিঠ দিয়ে বসে বেয়েছে। উপরের চাপে যেন তাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে (১৬১)।

গুহাটির পূর্ব প্রাচারে বুদ্ধদেবের জীবনের আদিপর্বের কয়েকটি ঘটনা বিচিত্রিত। সেগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সাজানো নয়। চিত্রের অবস্থান অনুযায়ী বর্ণনা না করে বরং বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাচক্র অনুসারে তা বর্ণনা করা যাক। পূর্ব অধায়ে বর্ণিত যতি-চিহ্ন অনুসরণে এবং চিত্র ৫৮-এ লিখিত নির্দেশ অনুসারে পাঠকের পক্ষে চিত্রগুলি সনাক্তকরণ কঠিন হবে না।

পূর্ব পর্বেছেদে ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস আলোচনাকালে আমরা বলেছিলাম, বুদ্ধদেবের জীবনের সঙ্গে অজ্ঞতা-শিল্পের সম্পর্ক আছে। সেই মহাপুরুষের জীবনী তখন আমরা আলোচনা করি নি। এবার তা কববার সময় হয়েছে। আর তাব জীবনের ঘটনা কালানুক্রমিকভাবে বর্ণনা কবাব সময় অজ্ঞাত্য তাব কোন আলোচনা থাকলে এখানে আমরা তাব উল্লেখ কবে যাব।

গৌতমবুদ্ধের জন্ম-সময় নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিবোধ আছে। কেউ বলেন, তিনি খ্রীষ্টাব্দ ৫৬৩-তে জন্মগ্রহণ করেন, কেউ বলেন আরও তিন বছর আগে, অর্থাৎ ৫৬৬-তে। নেপালী শাস্ত্রকারদের মতে, আরও ষাট বছর আগে অর্থাৎ ৬-৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। গৌতমবুদ্ধ বা শাক্য সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের পূর্বে তিনি নানান কপ নিয়ে এ ধ্বাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং নানান বকম লীলাখেলা করে যান। এক এক জীবনে তাঁর এক



চিত্র ৫৮

ষোড়শ গুহা-মন্দিরের প্রাণ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| ১ | সুস্তনীর্ষে বামন মূর্তি | গ | কপিলাবস্ততে বুদ্ধদেব |
| ২ | বুদ্ধদেবের জীবনীর প্রথমাংশ | ঘ | নন্দের কেশকর্তন |
| ক | মহর্ষি অসিত কর্তৃক নবজাতক দর্শন | ঙ | নন্দের মনোবেদনা |
| খ | চতুষ্পাঠিতে শিক্ষা | চ | মরণাহতা রাজকন্যা, চিত্র—৫৯ |
| গ | ভিক্ষোদনের সমস্তা | ৪ | হস্তিজাতক |
| ঘ | গৃহত্যাগ | ৫ | চিত্র সনাক্ত করা যায় নি |
| ঙ | উরুবিষে উপনীত | ৬ | কতিপয় মাহুসীবুদ্ধ |
| চ | স্বজাতার পায়সায় রন্ধন | ৭ | ক যুগনয়ন |
| ছ | অপুত্র ও ভল্লিক | খ | মীননয়না |
| ঝ | বিশ্বিসারের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান | ৮ | বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার |
| ৩ | নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ | ৯ | অজাতশত্রুর বুদ্ধদর্শনে আগমন |
| ক | কালোদায়ী ঘোষণা | ১০ | বুদ্ধদেবের আলেখ্য |
| খ | অগ্রোধাক্রমে বুদ্ধদেব | | |

এক লীলা। কখনও বাজপুত্র হয়ে, কখনও নাগ, বানব, ষড়দন্ত হস্তীৰূপে পৰিগ্রহ কৰেছিলেন। তাদেব বুদ্ধৰূপে চিহ্নিত কৰা হয় না -তঁাবা সবাই বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধদেবেৰ অংশ-অবতাব।

বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, শুদ্ধোদন-পুত্র সিদ্ধার্থৰূপে জন্মগ্ৰহণেৰ পূৰ্বেও ছয়জন (কাবও মতে, চুয়ান্তৰ জন) বুদ্ধ- বোধিসত্ত্ব নন। পূৰ্ণ বুদ্ধৰূপেই এ ধৰাধামে অবতীৰ্ণ হয়েছিলেন। অনেকৰ মতে, এঁদেব সংখ্যা বস্তুতঃ চব্বিশ জন। ললিতা-বিস্তাব ও মহাবাস্তৱমতে, গৌতম বুদ্ধ-দীপঙ্কৰেৰ অধীনে বুদ্ধভ্ৰলাভ কৰতে মনস্থ কৰেন। বহু জন্মচক্ৰপথ অতিক্ৰম কৰে অবশেষে তিনি তৃষিত-স্বৰ্গে এসে অবতীৰ্ণ হলেন। সেখানেই শেষবাবেৰ মতো দেহধাৰণেৰ জন্ম

গৌতমবুদ্ধেৰ
জীবনালেখ্য

অপেক্ষা কৰে বহিলেন। তৃষিত-স্বৰ্গে বসে তিনি চিন্তা কৰতে থাকেন। অতপৰ কোন ভ-ভাগে তিনি অবতীৰ্ণ হবেন। বুদ্ধদেবেৰ জীবনীৰ

এই অংশটুকু অবলম্বন কৰে আঙ্কিত কৰ্ত্তকণ্ঠলি প্ৰাচীৰ-চিত্ৰ আমবা দ্বিতীয় বিহাবে ইতিপূৰ্বেই দেখেছি (চিত্ৰ ২১১-ক-চ)। এখানে, এই ষোড়শ বিহাবে প্ৰথম চিত্ৰটিতে (১৬১-ক) দেখছি, সন্তোজাত সিদ্ধার্থকে ক্ৰোড়ে তুলে নিয়ে মহৰ্ষি অসিত তাকে নিবাস্ত্ৰণ কৰেছেন। ভবিষ্যদ্বাণী কৰেছেন, জাতক সংসাবে আবদ্ধ থাকলে হবেন ত্ৰিভুবনজয়ী বাজচক্ৰবৰ্তী, আব যদি কোনদিন মুণ্ডিত হয় তাব মস্তক, অঙ্গে ওঠে পীত অৰ্জুন, তাতলে তিনি হবেন জগৎত্ৰাতা যুগাবতাব। শ্মশ্ৰু-সমন্নিত অসিতেৰ মূৰ্তিটি অনবদ্য। তাব সে মুখে আনন্দ ও বিষাদেৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ। কিন্তু বিষাদ কেন? তাব জবাব পাচ্ছি ঈশানচন্দ্ৰ ঘোষ মহাশয়েৰ সঙ্কলিত বুদ্ধদেবেৰ জীবনীতে। ঘোষ-মশাই লিখেছেন, এটি ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চাৰণ কৰাব পৰ মহৰ্ষি অসিতেৰ শীৰ্ণ গণ্ড বেয়ে অশ্রুধাৰা গড়িয়ে পড়ে। বিস্মিত মহাবাজ শুদ্ধোদন প্ৰশ্ন কৰেন মহৰ্ষি, আপনি বোদন কৰেছেন কেন?

উত্তৰে মহৰ্ষি বলেছিলেন, মহাবাজ, এই সন্তোজাত শিশু যখন পৰম সন্তোৰ সন্ধান পাবেন, তখন আমি এ ধৰাধামে থাকব না, তাব পূৰ্বেই আমি দেহবস্তু কৰব। এব শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰাব সৌভাগ্য থেকে আমি বাঞ্ছিত হয়েছি। এজন্তাই বোদন কৰছি শাক্য-অধিপতি।

এই কথা বলে সেই সন্তোজাত শিশুৰ সম্মুখে মহৰ্ষি অসিত ভৰ্মিষ্ঠ হয়ে প্ৰণাম কৰলেন। তখন দেবলাদি অগ্ৰাণ্য ঋষিবাও শিশুকে প্ৰণিপাত কৰলেন। তাই দেখে বিস্ময়াহত মহাবাজ শুদ্ধোদন প্ৰণাম কৰলেন নিজ পুত্ৰকে।

সিদ্ধার্থেৰ জন্মেৰ সপ্তম দিবসে তাব গৰ্ভধাৰিণী জননী মাযাদেবী স্বৰ্গাবোহণ কৰেন। শিশু সিদ্ধার্থকে মানুষ কৰে তোলেন মাযাদেবীৰ ভগ্নী ও শুদ্ধোদনেৰ অপবা মহিষী মহাগৌতমী বা মহাপ্ৰজাপতি। এই মহাগৌতমাৰ একটি পুত্ৰ ছিল। তাব নাম নন্দ। সিদ্ধার্থ অগ্ৰাণ্য বাজপুত্ৰদেব সঙ্গে একত্ৰে বড় হয়ে ওঠেন। যথাসময়ে তাদেব হাতেখড়ি ও চুড়াকৰণ হ'ল। শিক্ষাগুরু আচাৰ্য বিশ্বামিত্ৰেৰ চতুষ্পাঠীতে তাদেব বিদ্যাভ্যাসেৰ চিত্ৰটিতে

(১) বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, মহাবাজ শুদ্ধোদন চাৰবাব স্বায় পুত্ৰ গৌতমকে প্ৰণাম কৰেছিলেন। চাৰটি ঘটনাই কোতুকানত সময়মতো তা বলা যাবে। এটি-ই প্ৰথমবাব।

(১৬২-খ) এবাৰ আমবা মনোনিবেশ কৰতে পাৰি। দেখছি শিশু সিদ্ধাৰ্থেৰ এ-পাশে মস্তাধাৰ, হাতে লেখনী, সম্মুখে ভূৰ্জপত্ৰ এ-পাশে আবও কয়েকজন সহাধাৰী। তাঁৰা সকলেই শাকা বাজপৰিবাৰেৰ শিশু -বাজপুত্ৰ, মহাগৌতমীপুত্ৰ নন্দ, আনন্দ, মহানাম, দেবদত্ত এব, অন্তকদ্ধ। পাঠশালাৰ চাব-চালা ঘৰটি লক্ষণীয়। একেবাবে বাংলা দেশেৰ চাব-চালা। শিল্পী এ চিত্ৰে আবও দুটি জিনিস একেছেন, যা খুটিয়ে দেখাৰ অপেক্ষা বাখে। একটি পিঞ্জৰাবদ্ধ পক্ষী ও একটি বীণায়ন্ত। পাঠশালাৰ ঘৰোয়া পৰিবেশে এ দুটি খুবই স্বাভাৱিক, কিন্তু মনে হয়, শিল্পী এ দুটিকে পতীৰ হিনাবে ব্যবহাৰ কৰবাৰ উদ্দেশ্যেই একেছেন। পাঠশালাৰ এ আবেষ্টনীতে মুক্তিকামী সিদ্ধাৰ্থেৰ অবস্থা কি পিঞ্জৰাবদ্ধ ও পক্ষীশাৰকেৰ মতো নহয়? মহাজ্ঞানৰ মুক্ত নীলাকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমেব-মা • ভেসে বড়াবাৰ তথা বান জন্ম, পাঠশালাৰ এ শিষ্টাব ব্যাকবণ আৰ নানান পাঠ্যপুচিব শৃঙ্খল কি তাকে তেধ না গন নি হুমুশাতি? আৰ পাঠশালাৰ এ পাত্ৰব বী বীণায়ন্তটি হা, ওটি এ চিত্ৰেৰ আবশ্যিক অঙ্গ নীবৰ বাণায়ন্তৰ তটীৰ মাতা বী শিশুব অন্তৰ • তাবীণবাতৰ অঙ্গুলিম্পাশ বদ্ধত হায উঠবাৰ জন্ম পত্ৰব • গাছ

। যু বজাৰ ছোলেৰে হো ওৰ বজাভাস কবলেই চলব না তাকে শিনাও হব অশ্বাবোহণ, যুদ্ধাবজা। ওই ঠিক পাবৰ চিত্ৰটি ও দৰছি শিশু সিদ্ধাৰ্থ • ব-ধন্য দিয়া শবসন্ধান অধ্যাস কৰাছেন।

ওদিকে বপিলানন্তৰ বাজান্তঃপুৰে কিন্তু বাজাৰ মনে থান্ন নেন। কিছুতেই তিনি ভুলতে গাবছেন না সভানাগুত ও মহৰ্ষি অসিনেৰ ভবিষ্যদ্বাণী। পাতিছা কবাছন মনে মনে, এ ছোল যেন কোন দন পী • বসনধাৰা না হয়, ওৰ ঐ কুৰি • কশদাম যেন কোনদিন মস্তকচূত না হয়, এ বাবস্থা তাকে কবাতই হাব। সিদ্ধাৰ্থ বাজপত্ৰদৰ মনো বয জোছ। সেই যববাজ। বাজাশাসনেৰ ভাব তাৰ উপযুক্ত হস্তে সমপণ কৰা • প বাল ওবেই তাৰ মুক্তি। তাহ'লেই তিনি বানপ্রস্থ নিয়ে ধমাচৰণ কবতে পাৰাবন।

পাৰ্শ্ববতী প্যানেলটিতে দেখছি একটি বৃত্তাকান মণ্ডপ। মণ্ডপ বাজা শুদ্ধোদন ও সিদ্ধাৰ্থেৰ বিমান মহাগৌতমী পৰামৰ্শ কবছেন কিভাৰে সিদ্ধাৰ্থেৰ স সাৰে আবদ্ধ কৰা যায়। সভামণ্ডপে আবও ছয়-সাতটি নবনাৰীৰ আলেখ্য (১৬২-গ)। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য কৰে দেখুন, বৃত্তাকান মণ্ডপটিতে পৰিপ্ৰেক্ষিত ৬ তিনমাত্ৰাব প্ৰকাশ কী নিখুঁতভাবে আঁকা হযেছে।

ঠিক তাৰ পাশেৰ প্যানেলটিতে দেখছি, একটি কিশোৰীৰ সঙ্গে বাজান্তঃপুৰে সিদ্ধাৰ্থ আলাপনবত্ত। কে এই কিশোৰী? ও, বোঝা গেছে। ইতিমধ্যে কিশোৰ সিদ্ধাৰ্থেৰ বিবাহ হযেছে। মাত্ৰ ষোড়শ বৰ্ষ বয়সে। ঐ কিশোৰী মেয়েটি সুপ্ৰবুদ্ধতনয়া যশোধৰা, সিদ্ধাৰ্থেৰ সন্তোবিবাহিতা সহধৰ্মিণী।

মুগ্ধ হযে দেখতে থাকি চিত্ৰটিকে। তৰণ সিদ্ধাৰ্থ ও কিশোৰী যশোধৰাৰ এই চিত্ৰটিতে শিল্পী গৌতমবুদ্ধেৰ দাম্পত্য জীৱনেৰ মধুৰ বসেৰ একটিমাত্ৰ বিন্দু পৰিবেশন

কবেছেন। যশোধবাব বহু চিত্র বহু স্থানে দেখেছি—কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে, সেই মন্দভাগিনীৰ আলেখ্য দেখেছি মাত্র দুটি পৰিবেশে। হয় তিনি নিদ্রাভিত্তা বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগকালে, নয় তিনি ভিক্ষা দান কবেছেন বুদ্ধদেবকে। সহস্রাব্দী কাল ধৰে অজ্ঞতাব শিল্পীবা, তার শুধু অজ্ঞতা-শিল্পীদেব দোষ দিয়ে কি হবে, সমগ্র বৌদ্ধ জগতেব শিল্পীবা মন্দভাগিনী যশোধবাব অন্য কোন কপাচিন্তা করতে পাবেন নি। সেই নিষ্ঠুর আঘাটী পূৰ্ণিমাৰাত্রিৰ কালঘমই যেন তাৰ জীবনেব একমাত্র পৰিচয়, যেন সেই উদাসীন সন্ন্যাসীৰ সম্মুখে প্রত্যাখ্যাত হওয়াই তাৰ একমাত্র নিষতি। যেন এ দুটি ঘটনা ছাড়া অন্য পৰিবেশ আসে নি তাঁৰ জীবনে তিনি হাসেন নি, কাঁদেন নি, ভালবাসেন নি।

তাঁই শিল্পীৰ এ চিত্রটি দেখে ভাবি ভাপ্ত পেলাম। ছুনিয়াব কাছে, ইতিহাসেব কাছে গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বৰেব অবতার হ'তে পাবেন, কিন্তু কপিলাবস্তুর একটি কিশোরী বালিকাৰ চোখে তিনি যে অন্য কাপে, অন্য মাধুৰ্যে ধরা দিয়েছিলেন এটা শিল্পী ভোলেন নি। প্রথম গুহায় দেখা মহাজনক-পুত্রী সাবলাৰ কথাই বান বাব মনে পড়ে যাচ্ছিল আমান, এ কিশোরী-কিশোরীৰ নিষ্ঠুর আলাপন দৃশ্যটি দেখে।

কপিলাবস্তুর সে-যুগে মহা-গাভৰুবে হলকৰ্ষণ উৎসব হ'ত। পৰবৰ্তী চিত্র দেখাছ, তরুণ সিদ্ধার্থকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছে। উৎসব-মগ্ন নবনাৰীৰ মিছিল, তার মাঝখানে কুজপৃষ্ঠ বলদদেব ক্রেশেব কথা চিন্তা কবে দেখাছ বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন বাজপুত্র।

পসঙ্কত বর্গে, এখানে একটি অলৌকিক ঘটনায় অভিভূত হয়ে মহাবাজ শুদ্ধোদন দ্বিতীয়বার প্রণাম কবেন গৌতমকে। মহাবাজ লক্ষ্য কবেন, উৎসবেব আসব থেকে সরে গিয়ে বালক সিদ্ধার্থ বসে আছেন একটি বৃক্ষচ্ছায়াৰ ধানমগ্ন হয়ে, আরও বিস্ময়েব কথা, সমস্ত দিনে বৃক্ষেব ছায়া একটুও সবলো না। ব্যান'স্তমি' গৌতমকে আতপতাপ থেকে বক্ষা কবতে বৃক্ষ তাৰ ছাযাকে সমস্ত দিন অপসারিত হ'তে দিল না। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিস্ময়াবিষ্ট শুদ্ধোদন পুত্রকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কৰোছিলেন, জীবনে দ্বিতীয়বার।

বুদ্ধদেবেব জীবনীতে এব পৰেব ঘটনা হচ্ছে, নগর-ভ্রমণে বেবিযে ব্যাধি-জবা-মৃত্যু এ সন্ন্যাসী দর্শন। তখনই তিনি উপলব্ধি কবলেন, সন্ন্যাসেব পথেই শান্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি মনস্থির কবেন, অচিবেই সন্ন্যাসগ্রহণ কবতে হবে তাঁকে।

আকৈশোব জাগতিক দুঃখ-কষ্টেব হাত থেকে পৰিত্রাণেব কথা ভাবছেন তিনি— এখন তিনি উনত্রিশ বর্ষেব পূর্ণ যুবাণকষ। যৌবনেব সেই অত্যাচ্ছ শিখবচড়াব বাজভোগ থেকে অববোহণ কবে সন্ন্যাস নেবেন স্থির কবলেন। প্রাসাদে প্রত্যাভর্তন কবে সংবাদ পেলেন বাজববৃ যশোধবা একটি পুত্রসন্তান লাভ কবেছেন। প্রাসাদে সেদিন আনন্দেব প্রাবন। বাজপুত্রকে দলে দলে পুৰবাসীবা অভিনন্দন জানাতে থাকে, কিন্তু সিদ্ধার্থেব মনে তখন অন্য চিন্তা। তিনি ভাবছেন, পুত্র হয়েছে তাব, সংসাবেব বন্ধন বাড়েছে। আর বিলম্ব ক'বা উচিত নয়। স্থির কবলেন, সেই বাত্রেই গোপনে গৃহত্যাগ কববেন।

উত্তবাষাটা নক্ষত্রে আষাঢ়ী পূর্ণিমাব পুণ্য তিথি সেটি। গভীর বাত্রে নিজ শযনকক্ষ থেকে বাব হয়ে এলেন তৰুণ সিদ্ধার্থ। দেখেন উৎসব-ক্লান্ত নর্তকীর দল যে যেখানে স্থান পেয়েছে—নিদ্রামগ্ন। মহাবাজেব মহলে নেমে এসেছে স্মৃতিব অন্ধকাৰ ঘন মেঘজালে পূৰ্ণচন্দ্র অবলুপ্ত। ধীৰপদে সিদ্ধার্থ এগিয়ে এলেন যশোধবাব স্মৃতিকা-গৃহে। পুত্র বাহুলকে একবাব চোখেব দেখা দেখে যাবেন। দ্বাবী নিদ্রাভিত্ত—গৃহমধ্যে প্রবেশ কবলেন সিদ্ধার্থ। দেখলেন যুঁই জাব পদ্মফুলে আকীৰ্ণ পালঙ্কে ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্ন যশোধবাকে। ঘবে জ্বলছে নির্বাণোন্মুখ একটি বত্তুদীপ। তাবই ক্ষীণ আলোয় দেখলেন যশোধবাব পদ্মকোবকতুলা একটি হাত সজোজাত শিশুব মস্তকে পড়ে আছে। পুত্ৰকে কোলে তুলে নেওযাব ছবন্ত প্রলোভনকে দমন কবলেন সিদ্ধার্থ—তাতে নিদ্রাভঙ্গ হ'তে পাবে বাজববব। নিঃশব্দচৰণে ঘব ছেড়ে বেবিযে এলেন বাজপুত্ৰ। আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গঠে একবাব।

এই অনবদ্য বিষয়-বস্তুটিকে উপেক্ষা কবন নি শিল্পী। পবেব প্যানেলে (১৬।২-খ) সেটিকে কপাযিত কবেছিলেন তিনি। ছৰ্ভাগা আমাদেব, কালেব কবলে এ চিত্ৰটি সম্পূৰ্ণ অবলুপ্ত। এ চিত্ৰটিব কথা পূবেই আলোচনা কবেছি গ্রিফিথ সাহেবেব মল গ্ৰন্থ অবলম্বনে। বলেছি, পালঙ্কেব নীচে নিৰ্বাপিত দীপ, দীপাধাব এব ছিন্ন-তাব শীণায়ন্ত্ৰটি আঁকতে শিল্পী কী জাতীয় সমস্তাব সম্মুখীন হয়েছিলেন, এবং কেমনভাবে পৰিপ্ৰেক্ষিতেব মানদণ্ড পালটিযে সে সমস্তাব সমাধানও কবেছিলেন

প্রসঙ্গতঃ বলি, ইযাজদানীৰ মতে, এই অবলুপ্তপ্রায় চিত্ৰটি বুদ্ধদেবেব জন্মেব দৃশ্য। পালঙ্কে শায়িতা নাবীমূৰ্তিটি মহামাযাব, সজোজাত সন্তানটি স্বয়ং বুদ্ধদেব। আমাব মনে হয়েছ, তা কখনও হ'তেই পাবে না। প্রথমতঃ, কাহিনীৰ পাবম্পদ বক্ষাব দিক থেকে এটি তাব গৃহত্যাগেব দৃশ্যই হওয়া উচিত। পূবদৃশ্যে সজোবিবাহিত সিদ্ধার্থ ও যশোধবাকে দেখেছি আমবা, তাবপব হঠাৎ বুদ্ধদেবেব জন্মচিত্ৰ আসবে কেন? কিন্তু এটা কোন প্রমাণ নয়, কাবণ, অজস্কাতে অনেক ক্ষেত্রেই চিত্ৰগুলিকে কাহিনীৰ কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় নি। তাই দ্বিতীয় কাবণটাব উপবেই জোব দেব বেশি কবে—বুদ্ধদেবেব জন্ম লুশ্বিনী কাননে, সেখানে মাযাদেবীৰ ভাগ্যে কোন পালঙ্ক জোটে নি। শালভঞ্জিকা মূৰ্তিতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি পুত্ৰলাভ কবেছিলেন। তৃতীয় যুক্তিটি এই—নিৰ্বাপিত প্রদীপ বুদ্ধদেবেব জন্মেব চিত্ৰে কোন শিল্পীই কল্পনা কববেন না। সুতবাং আমি নিঃসন্দেহ—গ্রিফিথ-ই ঠিক বলেছেন—এটি সিদ্ধার্থেব গৃহত্যাগেব চিত্ৰ।

পববর্তী কাহিনীৰ দৃশ্য উকবিষ্ণু গ্রামে। কিন্তু অন্তবর্তী কালেব ইতিহাসটুকু আলোচনা কবে নিয়ে সে দৃশ্যে উপনীত হব আমবা।

সেই নিষ্ঠুব আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সজোজাত শিশুপুত্ৰ ও তাব মন্দভাগিনী জননীকে ত্যাগ কবে সিদ্ধার্থ বেবিযে এলেন প্রাসাদ থেকে। পদব্রজে নয়—সাবথী চন্ন তাঁকে তাঁর প্রিয় বথে কবেই পৌঁছে দিল বাজ্যসীমান্তে। আমনা নদীৰ তীবে এসে তিনি বথ থামাতে

বললেন। বিশ্বস্ত অমুচর সাবথী চন্ন এতক্ষণ কোন প্রশ্ন করে নি, এখনও কোন প্রশ্ন করলো না। গতিবেগ সম্বরণ করলো রথের। নেমে এলেন রাজপুত্র—চন্নের কাছে ডেকে এনে বললেন তাঁর মনোবাসনার কথা। এইখানে এই মুহূর্তে, নগরপ্রান্তে এই বিজন বনে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। 'স্তুতিভূত হয়ে গেল চন্ন। একে একে রাজ-পরিচ্ছদ খুলে ফেললেন সিদ্ধার্থ; মণিময় মুকুট, কণ্ঠহার, মণিবলয় কেয়ূব। তুলে দিলেন চন্নের হাতে। তরবারি নিক্ষেপিত করে স্বহস্তে কণ্ঠিত করলেন রাজপুত্রের দীর্ঘ ঘনকুঞ্চিত কেশদাম। পীতবসনে আবৃত করলেন দেবদুর্লভ কাশ্মি।

চোখের জলে ভেসে গেল চন্ন। বললে—ভগবন, কাল প্রাতে মহাবাজ যখন বলবেন, কেন তুমি তাকে যেতে দিলে?

সিদ্ধার্থ বললেন বলবে, তুমি আজ্ঞাবহমাত্র, তোমাকে আমি আদেশ করেছিলাম এই বিজন অরণ্যে আমাকে পরিত্যাগ করে নগরে প্রত্যাবর্তন করতে।

ছুটি হাত জোড় করে চন্ন বলে--আর কি কোনদিন দেখা হবে না প্রভু?

সিদ্ধার্থ বললেন—তোমার সঙ্গে হবে চন্ন, কণ্ঠকের সঙ্গে এই তোমার শেষ সাক্ষাৎ।

কণ্ঠক রাজপুত্রের প্রিয় অশ্ব। আবাল্যেব সহচর। রাজপুত্রের এ কথা শুনে কণ্ঠক আর স্থির থাকতে পারল না, সেখানেই শয্যা নিল এবং প্রভুর বিবাহে দুঃখে মনোভঞ্জে তখনই শেষনিশ্বাস ত্যাগ করলো।

একাকী প্রত্যাবর্তন করলো চন্ন সরোদনে। একলা চলাব দুর্গম পথে যাত্রা করলেন তরুণ পথিক! আষাঢ়ী পূর্ণিমার সে বিচিত্র রাত্রে সে দুর্গম পথে কখনও আলো, কখনও অন্ধকার।

ওদিকে রাজপ্রাসাদে মণিময় পালঙ্গে নিদ্রাভিত্ত। যশোধরা একটি সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন। পুত্রজন্মেব পর তখনও রাজপুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি। যশোধরা স্বপ্ন দেখছেন, রাত্রি প্রভাতে যুবরাজ পুত্রদর্শনে এসেছেন সেই স্মৃতিকাগৃহে। বৈতালিকের দল যুবরাজের বন্দনাগান ধবেছে। দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেবদুর্লভকাশ্মি যুবাপুরুষ, সর্বস্বায়ে ছুটি পদ্পলাশলোচন বিক্ষিপিত করে দেখছেন অতি-ক্ষুদ্র একটি মানব-শিশুকে। এ শিশু যশোধরার, এ শিশু সিদ্ধার্থের। এই আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সার্থক হয়েছে যশোধরার জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা; মহাজনক-জায়া সীতলীর তপস্বী।

সহসা বজ্রপাত হ'ল কোথাও অদূরে। স্বপ্ন ভঙ্গ হ'ল যশোধরার। চন্নের উত্তেজনে তিনি শয্যায়; দেখেন নিবাপিত হয়েছে কখন রত্নদীপ। আষাঢ়-বাত্রির ঘনান্ধকারে ঢেকে গেছে স্মৃতিকাগৃহ।

কপিলাবস্ত্র থেকে সত্যসন্ধানী ক্রমে এসে উপস্থিত হলেন মগধে—রাজগৃহে। এখানে সন্ন্যাসী আড়ার কালাম-এর আশ্রমে গেলেন প্রথমে। কালাম সিদ্ধার্থকে ধ্যান ও তপস্ব্যাব পাঠ দিলেন; কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁর সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করে তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। রাজগৃহের অপর একজন জ্ঞানী সন্ন্যাসী উদক (কল্ক) রামপুত্রের কাছেও তিনি সত্যের সন্ধানে

গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ অনুধাবন কবলেন, প্রকৃত জ্ঞানলাভের জন্য তাঁকে একক সাধনায় ব্রতী হ'তে হবে। বাজগৃহ ত্যাগ করে তিনি চললেন দক্ষিণাভিমুখে। কদ্রক ও কালাম-এর অযুত শিষ্যদলের ভিতর পাঁচজন এই তরুণ তপসেব সত্যানুসন্ধানের নিষ্ঠা দেখে তাঁর অনুগমন কবলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন, এই তরুণ সিদ্ধার্থই প্রকৃত জ্ঞান বা বুদ্ধত্বের অধিকারী হ'তে পাববেন, আর তাহলে সে প্রসাদ-কণিকা থেকে তাঁরাও বাঞ্ছিত হবেন না। এই পাঁচজন শিষ্যের নাম অন্ন-কোদন্ন, ভান্সা, মহানাম, ভদ্র আর অশ্বপী।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে তাঁরা কোন এক অখ্যাত গ্রাম উকবিষে উপনীত হলেন অশেষে। এই শান্ত নিজন স্থানটি ভালো লাগলো তাব, স্থির কবলেন এখানেই সাধন। কবলেন।

চিত্রে দেখছি (১৬।১-৬), চারজন অনুচরসহ (পাঁচজন নয় কেন •) সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ এসে দাড়িয়েছেন উকবিষ (বর্তমান বুদ্ধগয়ায় দক্ষিণে উবইল) গ্রামপ্রান্তে। এখানেই কঠিন তপস্যা শুরু হ'ল তাব।

এব পববে দীর্ঘ ছটি বছর আসন্ন-হিমাচলে কত মহাজনপদের কত ক্ষমতাদম্পী বাজা-মহাবাজা কত প্রচণ্ড যুদ্ধ-বিগ্রহ করেছিলেন, কত অযুত মিনাব-সৌধ-দীর্ঘস্থিত নিমাণ করিয়েছিলেন, ভাবতবর্ষের ইতিহাস তা অমানবদনে ভুলে বসে আছে। অবশেষে আছে অখ্যাত উকবিষ গ্রামে অশ্বখবৃক্ষমূলে এক অজ্ঞাত ওকণ সন্ন্যাসীর তপস্যার ফলশ্রুতি। কিন্তু সেদিন কে লক্ষ্য করেছিল সেই একক তপসেব নিবলস সাধনাকে।

না, ভুল বললাম। একজন লক্ষ্য করেছিল। সে এ উকবিষ গামের সন্ন্যাসিনী গোপতনয়া স্মৃজাতা। কিশোরী বয়স থেকে মেয়েটি লক্ষ্য করেছিল এই তরুণ তপসেব অদ্ভুত তপশ্চর্যাকে। সে দেখেছে সন্ন্যাসী তিল তিল করে আহাৰ্য-পানীয় ত্যাগ করেছেন শীর্ণ হয়ে পড়েছেন গঠন, ছবল হয়ে পড়েছেন। সে অনুভব করেছে অনাহারকিঞ্চ তপস অনিবার্য মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন। দীর্ঘ ছ' বছরে কিশোরী হয়েছে বৃদ্ধা সে বুঝতে পেরেছে, একে রক্ষা করতে হ'লে তাকে আহাৰ্য এনে দিতে হবে। শাস্ত্রকার বলেন নি, কিন্তু আমরা কি অনুমান করতে পারি না, যুবতী স্মৃজাতার মনে সঞ্চাৰিত হয়েছিল সেই কামনাটি যা নিয়ে অপেক্ষা করেছিলেন মাতঙ্গের আশ্রমে শবরী, শ্রীবামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় তাব ফল-মূলের খালাখানি সাজিয়ে।

অনাহাবকিঞ্চ সন্ন্যাসী অবশেষে একদিন অনুধাবন কবলেন শবীরকে অহেতুক পীড়ন কবলে কোন লাভ হয় না। মাত্রাতিবিক্ত আহাবে বা নিদ্রায় যেমন ইন্দ্রিয় অবশ হয়ে যায়, মাত্রাতিবিক্ত নিদ্রাভেও তেমনি ছবল এবং অশক্ত হয়ে যায় শবীর। জাগতিক কামনা-বাসনার হাত থেকে মনকে মুক্ত কবতে হ'লে এ ছুটি চরম পথ পবিত্যাগ করে পবিত্রপথের পথে অভ্যস্ত কবতে হবে দেহকে। তিনি স্থির কবলেন দেহ-পীড়নের তপস্যা ত্যাগ করবেন এবার। কিন্তু হায়, এ সিদ্ধান্ত যখন নিলেন সিদ্ধার্থ, ততদিনে তাঁর দেহ এতদূর অশক্ত হয়ে পড়েছে যে, আসন্ন ত্যাগ করে আহাৰ্যের কাছে পর্যন্ত তিনি এগিয়ে

যেতে পাবেন না। সিদ্ধার্থ অনুভব করেন, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তাঁকে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ তাঁর ললাট-লিখন নয়। মৃত্যুকে চক্ষের সম্মুখে দেখলেন তিনি। লুটিয়ে পড়ল তাঁর অনাহারক্লিষ্ট দেহ ভূমিগম্যায়।

ভাবতবর্ষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, তার ধর্ম, তার মমবাণী একটি অখ্যাত গোপবালার কাছে একান্তভাবে ঋণী, সে ঐ সৃজাতা। সে লক্ষ্য করে, তখন তাপসের অনাহার-মৃত্যুর উপক্রম। সৃজাতা ছুটে চলে যায় নিজ কুটিরে। প্রণয়ন করে গোশালাব শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-ধেমুৱ ছুঁকে প্রস্তুত পায়সান্ন। পায়স তো নয়, অমৃত! সে অমৃতের অমিত প্রভাবেই পৃথিবী একদিন শুনতে পেয়েছিল সেই মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী : অহিংসা পবমোধর্মঃ।

চিত্রে দেখছি (১৬।২-চ), নিভৃত গৃহকোণে মৃৎপাত্র পায়সান্ন প্রস্তুত কবছে গোপকন্যা সৃজাতা। বাহিব-দ্বারে বিশ্রামবত তার চাবটি বেহু।

শবৎচন্দ্র বহুবাব বলেছেন, নিজের হাতে দুটি বেঁধে সামনে বসিয়ে পুরুষমানুষকে খাওয়াবার সুযোগ পেলে ভারতীয় মেয়েবা আর কিছু চায় না। আমার মনে হয়, তার কারণ ঐ সৃজাতা আর শবরীর রক্ত তাদের ধমনাতে প্রবাহিত হয় বলেই।

পরের প্যানেলটিতে দেখছি, সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে সৃজাতা^১ পায়সান্নের ভাণ্ডটি নামিয়ে রাখছে। দুই হাতে অর্ঘ্যদানের ভঙ্গিতে সে ধবেছে অমৃতভাণ্ড, নতজানু ভঙ্গি তার।

পায়সান্ন আহাব করে সুস্থবোধ কবলেন সিদ্ধার্থ। সম্পূর্ণ নূতন পথে সাধনা শুরু কবলেন এবার। দেহকে নিপীড়ন করা বন্ধ কবলেন, ও বিষয়ে পবিমিত আহাব-নিদাকে তিনি বরণ কবলেন অতঃপর। এই সময়েই সিদ্ধার্থের পাঁচজন অনুচর তাঁকে ত্যাগ করে ঋষিপতন^২ অভিযুগে প্রস্থান করেন। সিদ্ধার্থকে কঠোর উপশ্চমাদ পথ ত্যাগ করতে দেখে তারা ভেবেছিলেন, তিনি এতদিনে হলেন ব্রাত্য, ব্রতচ্যুত।

তাতে ক্রক্ষেপও কবলেন না সিদ্ধার্থ। ধ্যানের জগতে তিনি অভিভূত হয়ে বইলেন চব্বম সত্যের সন্ধানে। বুদ্ধিলাভ করার পথে যখন অল্প পথ মাত্র বাকি, তখন এলেন সসৈন্য মার। সর্বপ্রথম আবিভূত হলেন ছদ্মবেশে। কপিলাবস্তুর এক বাজদূতের রূপ ধরে উপনীত হলেন সিদ্ধার্থের সম্মুখে। সিদ্ধার্থের ধ্যান ভঙ্গ করে মার সর্বোদনে বলতে থাকেন —বাজপুত্র আপনি এখানে। আমি ভূতাবত আপনার অগ্রেগণে বৃথাই যুবে মবেছি। আপনার অমুজ দেবদত্ত মহাবাজ গুহোদনকে হত্যা করে আজ কপিলাবস্তুর সিংহাসনে উপবিষ্ট। মহাগৌতমীকে সে কাবাকদ্ধ করে বোখেছে, আর লক্ষ্মীস্বকপিণী মা যশোধবার ধর্মনাশ কববার জন্য সে বদ্ধপবিকর। যুববাজ, আপনি ক্ষত্রিয়সন্তান, এই মূহুর্তে ঐ আসন ত্যাগ করে উঠে আসুন, আমাকে অনুসরণ করুন, ক্ষাত্রোজে অধিকার করুন নিজ সিংহাসন, উদ্ধার করুন জননী ও জায়াকে।

(১) সন্দেহবোধের মত মাননে এটি সৃজাতার আলোচ্য নয় পূর্ণালক্ষ্যের চিত্র কারণ “১৭শাখা পুণিমায়া অবগাহনাত পূর্ণালক্ষ্মী দামীৱ হস্ত সৃজাতা কর্তৃক মূৰ্ঘপাত্রে প্রেরিত পায়সান্ন ভক্ষণ”।

(২) বর্তমান কাশীর নিকট।

সিদ্ধার্থ সমস্ত শুনে বললেন : তোমার কুটকৌশল বার্থ হয়েছে, হে ছদ্মবেশী গিরি-মেখল-বাহন।^১ আমি তোমাকে চিনেছি !

অধোবদনে মার ফিরে গেল। কিন্তু নিবস্ত হল না সে,—তখনই সে প্রবেশ করে তার ভ্রবনমোহিনী তিন কন্যাকে—ভৃগু, আবতি আর বাগকে। তপস্শ্রাবত সিদ্ধার্থকে সঙ্কল্পচ্যুত কবতে। বিফল হয়ে ফিবল তাবা। শেষে মার পাঠাল তার বীভৎস অনুচরদের—সন্ন্যাসীকে ভয় দেখাতে, কিন্তু ফল হল একই। মার স্বয়ং এল এবার স্বরূপে, কিন্তু পবাস্ত হল সে-ও। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যকে জয় কবেছেন ততদিনে সিদ্ধার্থ, হয়েছেন জিতেন্দ্রিয়, স্থিতপ্রজ্ঞ। এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে সাবনাথ মূল-গন্ধেশ্বরকুটিতে একটি বৃহদায়তন ত্রেন্দ্রো আছে, অজন্তায় প্রথম গুহায় এ চিত্রটি (১।১০) আমবা ইতিপূর্বেই দেখেছি।

পবাস্ত মার নিকপায়ভাবে বলে ওঠে—এ পৃথিবী আমার সাম্রাজ্য ষড়বিপু-পয় দস্ত আমার এ পৃথিবীতে তোমার কোন স্থান নেই।

সিদ্ধার্থ নীববে দক্ষিণহস্ত দিয়ে স্পর্শ কবলেন মাতা ধবিত্রীকে। যেন নীববে সাক্ষী মানলেন পৃথিবীকেই। অমনি ভূকম্পন শুরু হল প্রচণ্ডভাবে সসৈন্য মার ভূতলশাযী হল সে আলোড়নে, কিন্তু অটল বইল সিদ্ধার্থের সাধনপীঠ। সিদ্ধার্থের এই ভূমিস্পর্শ মতিটি অজন্তার অনেক গুহাতেই দেখতে পাবেন। একেই বলা হয় ‘ভূমিস্পর্শ-মুদ্রা’।

সেই বাত্রেই সিদ্ধার্থ পবমজ্ঞান লাভ কবলেন। সিদ্ধার্থ এতদিনে হলেন পবমবুদ্ধ। সেটিও ছিল বৈশাখী পূর্ণিমার বাত্রি—শুক পূর্ণিমা। বুদ্ধ লাভ কবে শাক্যসি হ অনুভব কবলেন চার প্রকার আয়সত। এবং দর্শন কবলেন পবমপ্রাপ্তির অষ্টমুখ পথ। তিনি অনুভব কবলেন অজ্ঞতা থেকে জন্মলাভ কবে কামনা, কামনা থেকে দেহজ দুঃখ-কষ্ট জন্ম-যন্ত্রণা-জবা-মৃত্যু, তিনি প্রাণবান কবলেন জাগতিক যত দুঃখ-দুঃশাব মল হল অজ্ঞতা এব কামনা। যদি এই মূল দুটিকে উৎপাটন কবা যায়, তবেই হতে পাবে পবমমুক্তি—নিবাণ।

সিদ্ধার্থ এই পবমজ্ঞান লাভ কবায়, বুদ্ধ হওয়ায়, গাবাব ফিবে এল মার। বললে—ভূমি তো মহাপবিনিবাণের পথেব সন্ধান পেয়েছ, তবে আর অহেতুক বিলম্ব কবছ কেন মুক্ত হও এ জাগতিক বন্ধন থেকে।

হেসে বুদ্ধদের বললেন—তোমার অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি আমি, কিন্তু তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে না। যতদিন না এ সন্ধামের নিশ্চিত প্রচাবেব সুবন্দোবস্ত করতে পারছি, যতদিন না এ মবজগতে মুক্তিব বাণী প্রচাবেব আয়োজন হচ্ছে, ততদিন ব্যক্তিগত মুক্তিব সন্ধানে আমি নিবাণ লাভ কবব না।

শেষ প্রয়াসে বিফল হয়ে গেল মার।

পবমপ্রাপ্তির পবে বুদ্ধদের এক সপ্তাহকাল সেই বোধিবৃক্ষের তলাতেই অবস্থান কবলেন—দ্বিতীয় ‘সপ্তাহে’ তিনি বিশ্রাম নিলেন পার্শ্ববর্তী একটি শ্রোগ্রোধ বৃক্ষতলে। তৃতীয়

(১) মারের বাহন একটি খেতহুঁটা, নাম গিরি-মেখল।

সপ্তাহে যখন মুচলিন্দ বৃক্ষতলে তিনি অবস্থান করছিলেন, তখনও তাঁর দেহ দুর্বল, তখন আকাশ জুড়ে নামল বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তখন নাগবাজ মুচলিন্দ আপন ফণা বিস্তার করে রক্ষা করলেন বুদ্ধদেবকে^১। দুজন উৎকলী বণিক এই সময় সেখান দিয়ে তাঁদের বাণিজ্য-সম্ভাব নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা দৈববাণী শুনলেন, পথপার্শ্বে একজন মহামানব অনশনে আছেন। তাঁরা দুজনে অল্প-কিছু অধেষণ করেই দেখতে পেলেন ধ্যানস্থ বুদ্ধদেবকে। পবন শ্রদ্ধাভবে মধুক ও পবমান্নের অর্ঘ্যদান করলেন তাঁরা ঐ মহাসন্ন্যাসীকে। এই উৎকলী বণিকদ্বয় হলেন ব্রহ্মশ্রু ও ভল্লিক।

পরের প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু নিয়েই আঁকা (১৬।২-৬)।

বুদ্ধদেব তখন চিন্তা করতে থাকেন -কোথায় গিয়ে, কার কাছে উপস্থিত হযে সন্ধামের প্রথম প্রচাব করবেন তিনি। প্রথমেই তাঁর মনে উদয় হল, বাজগৃহবাসী সন্ন্যাসী আলারা কালাম ও উদ্দকেব কথা, কিন্তু ব্যানযোগে তিনি উপলব্ধি করেন ইতিমধ্যেই তাঁরা দুজন দেহবল্লা কবেছেন। ফলে, বুদ্ধদেব স্থির করলেন, বাজগৃহের পরিবর্তে তিনি যাবেন কাশীতে—যেখানে ছিলেন তার সেই পাঁচজন দলভাণ্ডা অনুচর। বুদ্ধদেব অতঃপর অগ্রসর হলেন কাশী অভিমুখে। তার সেই পাঁচজন অনুচর তাকে দেখতে পেয়ে বললেন বন্ধুবর গৌতম, আমরা জানি কঠিন তপশ্চর্যা করেও তুমি পবনসত্তার সন্ধান পাও নি—শেষ পর্যন্ত তুমি ত্যাগ করেছিলে দেহ-নিপীড়নের পথ। এখন তুমি কী উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে এসেছ।

বুদ্ধদেব প্রত্যুত্তরে বললেন—আমি পবনপ্রাপ্তি লাভ করেছি, আমি আজ তথাগত বুদ্ধ। তোমরা আমাকে আর ‘বন্ধু গৌতম’ বলে সম্বোধন করো না, এতে আমার কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমরাই অধঃপতিত হবে। আমি যে সত্য গণ্যমান্য করেছি তা তোমাদের কাছে বিবৃত করতেই এসেছি, অবধান কর এন এই ভগৎ-প্রপঞ্চের যাবতীয় দুঃখ-দুঃশাব তাত থেকে মুক্তিপথের সন্ধান জেনে নাও।

তিনি সেই সাবনাথ মৃগদানেরই প্রথম উচ্চারণ করলেন তাঁর সন্ধামের মূল বাণী। আবর্তিত হল সবপ্রথম সেই মহাধর্মচক্র। তিনি বললেন—

: ছুটি চরম পথই পবিত্যাজ।। কী সেই চরম পথ? প্রথমতঃ, ইন্দ্রিয়জ মুখ-সন্ধান, দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়-নিপীড়ন। তোমাদের অবলম্বন করতে হবে মধ্য-পথ। কী সেই মধ্যপথ? সে হল জ্ঞানের পথ। অষ্টাঙ্গিক সত্যমার্গ। কী সেই অষ্টমুখী সত্যমার্গ? সন্ম্যা-দিট্ঠি (সত্য-দৃষ্টি), সন্ম্যা-সঙ্কল্পো (সত্য-সঙ্কল্প), সন্ম্যা-বাচা (সত্য-বাক্য), সন্ম্যা-কস্মন্তো (সৎ-কর্ম), সন্ম্যা-আজীবো (সৎ-জীবিকা), সন্ম্যা-বাযামো (সৎ-উদ্যোগ), সন্ম্যা-সতি (সৎ-চিন্তা বা সৎ-স্মৃতি) এবং সন্ম্যা-সমাধি (সৎ-ধ্যান)।

(১) সীচির পশ্চিম তীরে এই বিষয়-বস্তু নিয়ে একটি সুন্দর ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, বন্ধন-দুঃখ কী ? অবধান কব,—জন্ম-ব্যাধি-জবা-মৃত্যুই বন্ধন, অপ্ৰিয়েব সঙ্গে মিলন দুঃখেব, প্রিয়-বিবহ প্রকৃত দুঃখেব, পবনসত্য-লাভে বঞ্চিত হওয়া চবম দুঃখেব ।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন-দুঃখের মূল কাৰণ কী ? অবধান কব, কামনা-বাসনাই এ দুঃখেব মূল, এ বন্ধনেব বনিয়াদ । ইন্দ্রিয়জ সুখেব কামনা, আত্ম-তৃপ্তিব বাসনা, অহং-বোধ-সম্ভূত যশেব অভীপ্সাতি এই বন্ধন-দুঃখেব মূল ।

: হে পঞ্চ সন্ন্যাসী, এই বন্ধন-দুঃখেব মলোৎপাটনেব উপায় কী ? অবধান কব . —কামনা-বাসনাকে নিঃশেষ পবিত্যাগ কবাতি এ মলোচ্ছেদেব উপায় । পবোক্ত অষ্টমুখী সৎ-মার্গে এ মলোচ্ছেদ সম্ভব ।

এই হল তথাগত বুদ্ধেব প্রথম বাণী । সাবনাথ মৃগদাবে এই ধর্মোপদেশই ধর্মচক্র আবর্তনেব সূচনা কবল । শ্রবণমাত্র ভিক্ষু কোদল বুদ্ধদেবেব চরণে প্রণিপাত কবে বললেন—প্রভু, আমি উপলব্ধি কবোঁ, আপনিই প্রকৃত বুদ্ধ । গ্রামকে প্রব্রজ্যা দান ককন, প্রভু ।

তিনিই হলেন বুদ্ধদেবেব প্রথম শিষ্য । অল্প পবে অপব চাবজনও তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন । সাবনাথে আবও কয়েকজন এই সময়ে তাঁব শিষ্যত্ব গ্রহণ কবেন । তাদেব মধ্যে কাশীব বণিকশ্রেষ্ঠ যশদেবেব নাম উল্লেখযোগ্য । যশেব জননী এব, স্বীও এই সদ্ধম গ্রহণ কবেন । কাশী থেকে বুদ্ধদেব পুনবায উকবিষ গ্রামে ফিবে আসেন । সেখানে উকবিষ-কাশ্যপ^১ এবং গয়াকাশ্যপকে^২ দীক্ষা দেন । এতদিনে বুদ্ধদেবেব পাঁচশতাব উপব শিষ্য হয়েছো । এবাব তিনি সশিষ্য বাজগৃহে আসেন ।

সংবাদ পেখে রাজা বিম্বিসাব নগবপ্রান্তে এসে সশিষ্য বুদ্ধদেবকে অভ্যর্থনা কবেন । রাজা তাঁকে সপাষদ বাজপুৰীতে অবস্থানেব উচ্চ আমন্ত্রণ জানালেন, কিন্তু অসম্মত হলেন বুদ্ধদেব, বললেন তিনি ভিক্ষু, উদ্ধৃত আকাশেলেই তাঁব স্থান । তখন মহাবাজ বিম্বিসাব বাজগৃহ-প্রবেশপথে একটি মনোবম উদ্যানে তাঁব বিশ্রামেব আয়োজন কবেন । বেম্বন নামে এ উদ্যানটি বাড়ীবে আজও দেখতে পাওয়া যায় ।

ষোড়শ গুহায় যে চিত্রাবলী আমবা দেখছি, তাব পববতী প্যানেলটি এই বিষয়-বস্তু অবলম্বনে রচিত । পূর্ব-চিত্রেব নীচেব প্যানেলে দেখছি প্রাসবাসনে বুদ্ধদেব আসীন (চিত্রটি প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে) । সম্মুখে জোড়হস্ত মহাবাজ বিম্বিসাব—তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বুদ্ধদেবকে, প্রাসাদে অতিথি হওয়াব জন্য । কিন্তু বুদ্ধদেব সম্মত হলেন না ।

(১) বুদ্ধদেব, যে একমুঠি মগাজানী একা কাশ্যগবংশীয় দুই ভ্রাতা অস্বীকার করায় বুদ্ধদেব তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে বাধ্য হন । তিনি নৈলয়ন নদীর তীরে উপর দিখে পায়ে হেঁটে নদী পার হন । সঁচিক পূর্ব তে'রণে এই ঘটনাটি অবলম্বন একটি অগুণ্ড প্রাসাদেব নমুনা আছে ।

(২) '১৩ গঙ্গাদেশ' পর নামই বুদ্ধদেবেব নামেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে উকবিষ গ্রামকে করেছে 'বুদ্ধ-গয়া' ।

তাই দেখছি (১৬১-খ) বুদ্ধদেব তোবণদ্বার অতিক্রম করে ভিক্ষায় বের হচ্ছেন। পাশেই বাঁধা রয়েছে বাজা বিদ্বিসাবের খেতবর্ণের অশ্বটি।

এদিকেব প্রাচীরে চিত্র-কাহিনীর এখানেই শেষ। মণ্ডপেব অপব প্রান্তে নন্দেব দীক্ষা ও মবণাহতা রাজকুমারীর অপূৰ্ণ চিত্রাবলী। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আসাব আগে আমবা বুদ্ধদেবেব জীবনীৰ পথ ধরে আৰও কিছুটা এগিয়ে যাব

বুদ্ধদেবেব বেত্তবনে অবস্থানকালে বাজগৃহে সন্ন্যাসী সঙ্ঘেব দুই শিষ্য এসে বুদ্ধদেবেব শরণ নিলেন। তাঁরা হচ্ছেন সারিপুত্র ও মৌগল্লায়ন। এবা দুজনেই আবাল্য বদ্ধ এব হবিহবাস্থা। পববর্তী কালে এব দুজন বুদ্ধদেবেব প্রধান-ম শিষ্য বলে স্বীকৃত হন এব ঐদেব পুতাস্তিই আবিষ্কৃত হয়েছে সাচব তিন ন আপব ভিতর থেকে।

বাজগৃহে তথাগত প্রায় দুই মাসকাল অবস্থান করেন। কপিলাবস্তব বাজা শুদ্ধোদনের কাছে এই সময় সংবাদ পৌছাল যে, তাঁব গৃহত্যাগী পুত্র বুদ্ধত্ব লাভ কবেছেন এবং বাজগৃহে অবস্থান কবেছেন। পুত্রদর্শনে ইচ্ছুক বাজা শুদ্ধোদন একজন অমাত্যকে পাঠালেন পুত্রকে আমন্ত্রণ জানাতে, কিন্তু সেই অমাত্য বাজগৃহে এসে বুদ্ধদেবেব দর্শনমাত্র তাঁব কতবা বিস্মৃত হলেন এবং বেদে বসে দীক্ষা নিয়ে সেখানেই বাস করতে থাকেন। শুদ্ধোদন এব পণ ক্রমাগত নযজন অমাত্যকে পব পব প্রেবণ কবেন এব সকালেই বাজগৃহে এসে বাজকায় বিস্মৃত হবে বোধ হবে যান। শেষ পথস্থ তিনি একজন অত্যন্ত বিশ্রান্ত বাজানুচব কালুদায়ীকে প্রেবণ কবলেন যে একই উদ্দেশ্যে। এবাব সংবাদ পেলেন বুদ্ধদেব। আমন্ত্রণ গ্রহণ কনালেন তিনি। সপাঞ্চ বুদ্ধদেব অগ্রসব হতে থাকেন কপিলাবস্তব উদ্দেশ্যে। বিশ্বস্ত শাসনা-অমাত্য কালুদায়ী দ্রুতগতি অশ্বে পুনেই সে সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন কপিলাবস্তবত সুসজ্জিত কবা হল কপিলাবস্তব বাজপ্রাসাদ-সন্নিকটস্থ শ্রোগ্রোধাবাম বিহাব। মহাপুরষেব আগমন-সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র বাজা শুদ্ধোদন শাক্য-অমাত্যদেব সঙ্গে নিয়ে অগ্রসব হলেন শ্রোগ্রোধাবাম বিহাবেব অভিযুখে। কিন্তু একটি প্রশ্ন জাগল তাঁব মনে। সন্ন্যাসী-দর্শনে যাচ্ছেন তিনি। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীৰ স্থান নৃপতিৰ উল্লে। বাজাই সন্ন্যাসীকে প্রণাম কবে থাকেন—প্রথা এই বলে। সামাজিক অনুশাসনেব তাই নির্দেশ। কিন্তু এক্ষেত্রে সন্ন্যাসী যে তাঁব প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র—সেই সিদ্ধার্থ, সেই গৌতম যাকে ববে-পিঠে কবে মানুষ কবেছেন তিনি। এ-কথা বাজা শুদ্ধোদন কেমন করে ভুলে যাবেন? তাহলে? দীঘ অদর্শনেব পর পুত্র পিতাকে প্রণাম কবে, না নৃপতি প্রণাম জানাবেন মহাসন্ন্যাসীকে?

উৎকণ্ঠিত মহাবাজ প্রশ্নটি নিবেদন কললেন মহামন্ত্রীকে, কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর মহামন্ত্রী-ও এ সমস্তাব কোন সম্ভাযজনক উত্তব খুঁজে পেলেন না। একটি অলৌকিক ঘটনায় এ সমস্তাব সমাধান হয়ে গেল আপনা থেকেই। শুদ্ধোদন লক্ষ্য কবে দেখেন, তাঁব সঙ্গে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেব অগ্রসব হয়ে আসছেন ভূমি স্পর্শ না করেই।

বায়ু-তাড়িত মেঘের মত শূণ্যে ভেসে আসছেন তিনি। স্তম্ভিত মহারাজ লুটিয়ে পড়লেন সন্ন্যাসীর চরণমূলে।^১

সপ্তদিবসকাল বুদ্ধদেব অবস্থান করেছিলেন ঞ্চোথোরামে। তার প্রতিদিনের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লিখিত আছে বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থে। সে একটি অপূর্ব নাটক।

মহারাজ শুদ্ধোদনের জ্যেষ্ঠপুত্র অকালে সন্ন্যাস নিয়েছেন। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয় নৃপতি। অশ্রুজলে সাস্ত্রনার ব্যবস্থা তাঁর জ্ঞান নয়। তাই এই শোকাবহ দুর্ঘটনাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। এতদিনে শাস্ত্র করতে পেরেছেন হৃদয়কে। স্থির করেছিলেন, সিদ্ধার্থের অন্তর্জ মহাগৌতমী-তনয় কুমার নন্দকে কপিলাবস্তুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন রাজ্যভাব আব তিনি বইতে পারছেন না—এবার অবসর নেবেন। পঞ্চাশোত্তর বয়স হয়েছে তার—এবার বানপ্রস্থ গ্রহণ করবেন। এ-সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে পরামর্শও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ-সব পার্থিব প্রসঙ্গে মহামানব বুদ্ধদেব কোন মতামত প্রকাশ করেন নি। শুদ্ধোদন তখন ঘোষণা করলেন, জ্যেষ্ঠপুত্রের কপিলাবস্ত্র-অবস্থানকালের মধ্যেই তিনি নন্দকে যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করবেন। বাজা জানতেন কপিলাবস্ত্র জনপদেব সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ‘জনপদ-কল্যাণী’ব^২ সঙ্গে কুমার নন্দের গোপন প্রণয়ের কথা। তাই তিনি আনন্ড ঘোষণা করলেন—অভিষেকের শুভদিনেই এই দুটি মিলন-তৃষিত তরুণ-তরুণীকে পবিত্র-সূত্রে আবদ্ধ করে দেবেন।

দ্রুতগামী ঘোষকের মাধ্যমে এ আনন্দবাতা বর্ষাগমে মৌসুমী মেঘের মত হড়িয়ে পড়ল সমস্ত বাজ্যে। দলে দলে প্রজাবৃন্দ আসতে থাকে কপিলাবস্ত্র অভিমুখে। রাজ্যদেশে নগরীকে সাজানো হল উৎসব-সাজে। গৃহে গৃহে উড়ল নিশান, পথে পথে নিমিত্ত হল পুষ্প-তোষণ, দীপাবলীতে সজ্জিত হল জনপদ। দূর গ্রামপ্রান্তের উৎসব-বিলাসী প্রজাব ভীড়ে জনাকীর্ণ হয়ে গেল রাজধানী। রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে অনুবোধ করলেন, এ কয়দিন তিনি রাজপ্রাসাদেই অধিষ্ঠিত হন। সম্মত হলেন না বুদ্ধদেব। বললেন—তিনি সন্ন্যাসী, প্রাসাদে তাঁর স্থান হবে না। তবে জানালেন, পরদিন ভিক্ষার্থে তিনি নগর-ভ্রমণে যাবেন এবং রাজপ্রাসাদেও গিয়ে ভিক্ষা চাইবেন। পিতার আগ্রহাতিশয্যে তিনি সেখানে মধ্যাহ্ন-আহারেও স্বীকৃত হলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলছেন, রাজপ্রাসাদে ফিবে এসে শুদ্ধোদন যখন সানন্দে এ-কথা ঘোষণা করলেন, তখন একজন পুরকামিনী আব স্থির থাকতে পারেন নি। ক্ষুব্ধকণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন—রাজপুত্র সামান্য ভিক্ষকের মত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাইবেন—এ দৃশ্য অসহ্য! তাঁর সে প্রতিবাদের কথা বুদ্ধদেবকে জানানোও হয়েছিল; কিন্তু

(১) মীচিব উত্তর হোরণের পশ্চিম দিকস্থ শুভের সর্বনিম্ন ভাস্কর্য দ্রষ্টব্য। এই কাহিনীটি দেখানে রিলিফ-কাঙ্গে খোদাই করা আছে। এই নিয়ে তিনবার শুদ্ধোদন প্রণাম করলেন বুদ্ধদেবকে।

(২) জনপদ-কল্যাণী—পালি ভাষায় এই নামের অন্ততঃ চারজন রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ যশোধরার নামান্তর, দ্বিতীয়তঃ নন্দের প্রণয়িনী, তৃতীয়তঃ আনন্দের জননী অর্থাৎ সিদ্ধার্থের পিতৃব্য-জায়া এবং একজন বারবনিতা (ভৈলপাত্ত-ভাতক)। সম্ভবতঃ জনপদ-কল্যাণী কোন নাম নয়, রূপবর্ণনাত্মক উপাধিভাষ্য।

মহাভিক্ষু নির্বিকারভাবে বলেছিলেন—আমি ভিক্ষু, পূর্বাশ্রমে কী ছিলাম সে প্রশ্ন অবাস্তব, ভিক্ষালব্ধ অর্থে ক্ষুণ্ণবৃত্তিই আমার ধর্ম !

সে-কথা শুনে রাজাস্তঃপুরে সেই রমণীর কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, শাস্ত্রকার তা আর জানান নি। বোধ করি সেই মহিলার অপরিসীম অভিমান, মর্মান্তিক অন্তর্জ্বালার সন্ধানই পান নি শাস্ত্রকার। তিনি শুধু জানিয়েছেন সেই ক্ষুদ্রা মহিলাটির পরিচয়—তিনি স্বামী-ত্যাগী সুপ্রবুদ্ধতনয়া ‘যশোধরা’ (=গোপা, ভদ্রা, বিশ্বা)। না, নামটি পর্যন্ত জানান নি, শুধুমাত্র বলেছেন—‘রাহুল-মাতা’।

পরদিন রাজপথে সত্যই দেখা গেল এক দেবদুর্লভকাস্তি মহাভিক্ষুকে। পুরবাসী ভিক্ষা দেবে কি, লজ্জায়, অনুশোচনায় তারা রুদ্ধ করে দেয় বাতায়ন - প্রাক্তন রাজপুত্রকে ভিক্ষা দেবার মত দুর্জয় সাহস কার আছে? শূণ্য ভিক্ষাপাত্র হাতে ধীরপদে এগিয়ে এলেন মহাভিক্ষু রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। দ্বারপাল শিরিত হয়ে মুখ লুকাল লজ্জায়! মুণ্ডিতমস্তক পীতবসনধারী সন্ন্যাসী অবশেষে এসে উপনীত হলেন অতি-পরিচিত একটি কক্ষের সম্মুখে। তাঁর সঙ্গে আজ তাঁর দুই প্রধান শিষ্য মহাভিক্ষু সানিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়ন। দীর্ঘদিন পূর্বে এক আষাঢ়ী পূর্ণিমায় এ গৃহ থেকে তিনি শেষবার বেরিয়ে এসেছিলেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রকার বলতে ভুলেছেন, সুপ্রবুদ্ধতনয়া সেই শূণ্য ভিক্ষাপাত্রটি পূর্ণ করে দেবার উদ্দেশ্যে দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছিলেন কি না। মহান অর্ধর্তীথকে নিয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন যখন বাস্তু, তখন সেই প্রাসাদের অপর প্রান্তে নিভৃত ভূমিশায়ায় কেউ অশ্রুর বগায় ভেসে গিয়েছিলেন কি না, শাস্ত্রকার সে-কথার উল্লেখ করতে ভুলেছেন।

কিন্তু ভোলেন নি অজ্ঞতার শিল্পী! সপ্তদশ গুহায় তিনি রঙ ও বেথায় সেই খণ্ড মুহূর্তটিকে মহাকালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শাস্বত করে রেখে গেছেন। সে-কথা যথাস্থানে।

বুদ্ধদেব রাজপ্রাসাদে সেদিন মধ্যাহ্ন আহার করেছিলেন। আহাৰাহ্নে শুদ্ধোদন তাঁর কাছে রাজবধু যশোধরার কৃচ্ছ্রসাধনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন।^১ উত্তরে মহাভিক্ষু বললেন—শুধু সেই জন্মেই নয়, পূর্ব পূর্ব জন্মেও তিনি বুদ্ধদেবের প্রতি এইরূপ একান্তপ্রণয়ী ছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, তিনি পূর্বজন্মের চন্দ্রা-কিন্নর-জাতক-কথা পুরবাসীদের শুনিয়েছিলেন। বারাগসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কী ভাবে চন্দ্রা-কিন্নরীর রূপে যুগ্ম হয়ে তার স্বামীকে হত্যা করে, তারপর কী ভাবে সন্তোবিধবার কাছে বিবাহ-প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়, এবং কী ভাবে

(১) “সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলে যশোধরা পতিব্রতা রমণীর জায় প্রাপ্তি-ভর্তৃকা ধর্ম পালন করেন। তিনি যখন মনিলেন সিদ্ধার্থ মস্তক মুগুন করিয়াছেন, তখন নিজেও মুণ্ডিতমস্তক হইলেন, যখন মনিলেন সিদ্ধার্থ চীরবসন পরিধান করিয়াছেন, তখন নিজেও উৎকৃষ্ট বসন পরিভ্যাগ করিয়া চীবধারিণী হইলেন, সিদ্ধার্থের জায় তিনিও একাহারী, ভূষণাশায়িনী হইয়াছিলেন। যুগপাত্ত ভিন্ন তিনি অল্প কোন পায়ে আহার গ্রহণ করিতেন না। এই সময়ে অনেক রাজকুমার তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু সিদ্ধার্থ ভিন্ন অল্প পুরুষের কথা তিনি কখনও শ্রদয়ে স্থান দেন নাই। বৌদ্ধরা বলেন, অতীত জন্মেও তিনি বরাবর বোধিসত্ত্বের সহধর্মিণী ছিলেন এবং এইরূপে সতীত্বের স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন।”

শত্ৰুৰ আশীবাদে স্বামী পুনৰ্জীবিৎ হলে চন্দ্ৰা বলে, চলুন প্রভু, এই ঈশ্বা ও কামের বশবর্তী
মনুষ্য-সমাজকে ত্যাগ কবে আমবা সেই চন্দ্রপৰ্বতেই ফিবে যাই, বলে :

কমলকুম্ভে স্থপোভিত কও বহে শ্রো ঈশ্বতী সেই গগনবৰে
ওকরাজি ছলি মলয় হিম্বোলে জুডায় শ্রবণ স্মধুব স্ববে,—
চল দুইজনে বিহাবি নেখানে, মাছু'র পথ কাবগা বর্জন,
যাপিব জীবন স্থখে জন্তুক্ষণ কবি পবম্পর প্রিয় সন্তাধন ॥

বাজপুত্র নন্দ গিয়েছিলেন কপিলাবন্তব অপব প্রান্তে একটি নিভৃত নিকেতনে জনপদ-
কল্যাণীর গৃহে। তাকে আসন্ন উৎসবেব সংবাদ দিতে। মিলনকামী দুটি তকণ-তকণীৰ
সে'দনটি স্বর্ণাক্ষৰে লিখে রাখবাব মত।

দিবসান্তে নন্দ ফিবে এলেন স্মাত্ৰোধানাম বিহাবে। প্রচণ্ড কৌতুহল হয়েছিল
তাব। প্রশ্ন কবে বসলেন অগ্রজকে—এই বাইজশ্বর্ষেব বিনিময়ে, যশোধবাব মতো স্ত্রী,
নাহলেব মতো পুত্রেব বিনিময়ে কী সম্পদ আপনি পেয়েছেন ?

বুদ্ধদেব বললেন—শুনতে চাও তা ? বস তাহালে ওখানে।

বৃত্তপ্রদীপ-জ্বালা সেই নিজন সন্ধায় কন্ধদাব বক্ষু দুই ভাইবে কী কথোপকথন
হয়েছিল, তা তৃতীয় ব্যক্তির কণগোচর হয় নি।

গভীর বাত্রে দ্বাব খুলে বেবিযে এলেন বুদ্ধদেব। সারিপুত্রকে ডেকে বললেন—
নন্দকে প্রব্রজ্যা দান কব। সে সন্ন্যাস নেবে।

পবদিন সংবাদ পেয়ে দুঃখ এলেন শুক্লোদন, এলেন মহাগৌতমী। কিন্তু সবনাশ
যা হবাব পূব বাত্রেই হয়ে গেছে। বাজকুমার নন্দেব মস্তক যুগিত—তাব দক্ষিণ কবে
ভিক্ষাপাত্র, অঙ্গে পাত অজিন। মুছিয়া হয়ে পড়লেন মহাগৌতমী। আব বজ্রাহত
পবত-শিখবেব মত এ ১১ম আঘাত অবিচলচিহ্নে গ্রহণ কবলেন মহাবাজ শুক্লোদন।
তিনি ক্ষত্রিয়, অশ্রব সাস্ত্রনা তাব জন্ম নয়—তাব চোখে এক ফোটা জগ নেই।

ফিবে এলেন নতমস্তকে বাজপ্রাসাদে। হাতাকাব উঠল সমস্ত নাজো। নিবিযে
দেওয়া হল উৎসব-দীপাবলী, ভেঙে ফেলা হল পুষ্পতোবণ। দীর্ঘশ্বাস পড়ে শুক্লোদনেব
—অচিবে অবসবগ্রহণ তাব ললাট-লিখন নয়। যতদিন না বালক বাছল উপযুক্ত হয়,
ততদিন তাঁব মুক্তি নেই। এ মমান্বিক দুঃস বাদে নীববে নতমস্তকে ফিবে গেল প্রজাবৃন্দ
যে যাব গ্রামে।

নাটকেব ৮১ম মুহূর্ত কিন্তু এখনও আসে নি।

কপিলাবন্তব অপব প্রান্তে নিভৃত নিকেতনে প্রসাধনদক্ষা জনপদ-কল্যাণীকে সাজিয়ে
তুলছিল বধূবেশে। আজ তাব বিবাহ এবং আজই তিনি হবেন এ বাজোব বানী।
আকৈশোবেব স্বপ্ন আজ সফল হতে বসেছে কল্যাণীৰ। সেই উৎসবমুখব নিভৃত কুঞ্জে
এসে দাঁড়াল একজন ভগ্নদত, নন্দেব অনুচর। তাব হস্তে নন্দেব প্রত্যাখ্যাত রাজমুকুট।
হতভাগ্য সংবাদ বহন কবে এনেছে—বাজকুমার নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন !

এ মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সহ্য করবার ক্ষমতা ছিল না জনপদ-কলাগীর ! মূর্তাতুরা মন্দভাগিনী লুটিয়ে পড়ল ভূমিশযায় । সে মূর্তা আর তার ভাঙে নি ।

জীবিতাবস্থায় যে মর্ষাদা তাকে দেয় নি রাজপুত্র নন্দ, তার শতগুণ মর্ষাদা তাকে দান করেছেন অজন্তার অজ্ঞাত শিল্পী—বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রের সে আজ বিষয়-বস্তু ! অজন্তার ষোড়শ গুহাব মরণাহতা রাজকন্যার আলোখো শাস্বত হয়ে আছে হতভাগিনী । সেই বিখ্যাত—The Dying Princess.

এ-ঘটনার পব সপ্তদিবস অতিক্রান্ত হয়েছে । রাজপ্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে প্রচণ্ড অন্তর্জ্বালায়, ত্বরন্ত অভিমানে দগ্ধ হচ্ছিলেন রাজল-জননী যশোধরা । আজ সেই 'সপ্তম দিবসের চিহ্নিত মূর্ত' । আজ তথাগত বুদ্ধ ত্যাগ করে যাবেন ত্রোগ্রোধারাম বিহার । আজ যেন ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন যশোধরা । স্থির করলেন, আজই তিনি হানবেন চরম আঘাত । যে মানুষটা তাঁর জীবন, তাঁর যৌবন, এ রাজ্যের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্মমভাবে দলিত, মথিত করেছে, তাব উপর প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে । বিশ্বস্ত বাজানুচর কালুদায়ীকে ডেকে আদেশ করলেন, পুত্র রাজলকে একবার ত্রোগ্রোধারাম বিহারে নিয়ে যেতে । সপ্তম-বর্ষীয় বালককে শিখিয়ে দিলেন, সে যেন ঐ নিষ্ঠুর উদাসীন মানুষটার কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করে । পুত্রকে জন্মদান করেই পিতার কর্তব্য শেষ হয় না, তাকে লালন-পালন করাও পিতার কর্তব্য । এই নিষ্করণ সংসারধামে সাবলম্বী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুত্রকে পথ-চলার পাথেয় পিতাকেই যোগাতে হয় । অভিমানক্ষুন্না রাজবধু দেখতে চান সেই নিষ্ঠুর সর্বভাগী সন্নাসী কী পিতৃধন দিয়ে পুত্রের প্রতি পিতার এই প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পাদন করেন !

অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছেন যশোধরা । আজ তাঁর বাব বার মনে পড়ে যাচ্ছে সচক্ষুত চন্দ্রা-কিন্নর-জাতক-কথা । আশ্চর্য, সে-জীবনের কথা আজ তাঁর কিছুই মনে নাই ; কিন্তু ঐ অদ্ভুত মানুষটি নাকি তপস্রাবলে পূর্বনিবাসজ্ঞান^১ লাভ করেছেন । যশোধরা ভুলে গেছেন, কিন্তু বুদ্ধদেব ভোলেন নি চন্দ্রা-কিন্নরীর সেই আকুল আবেদন :

কমলকুমুদে স্নশোভিত কত বহে স্রোতস্বতী সেই গিরিবরে
তরুরাজি ছলি মলয় হিল্লোলে জুড়ায় শ্রবণ স্তমধুর স্বরে,—
চল দুইজনে বিহারি সেখানে, মানুষের পথ করিয়া বর্জন,
খাপিব জীবন স্মৃতে অন্তর্ক্ষণ করি পরম্পর প্রিয় সম্ভাষণ ॥

অথচ কী আশ্চর্য, সব কথা ভুলেও আজ যশোধরার হৃদয়ে সেই বাণী ঝঙ্কত হয়ে উঠছে ; আর সব কথা না ভুলেও এ আত্মানে বুদ্ধদেবের মনে কোন সাড়া জাগছে না !

(১) বৌদ্ধ শাস্ত্রমতে, বুদ্ধজন্ম করার সময় বুদ্ধদেব পূর্বনিবাসজ্ঞানও (জাতিস্মরণ) লাভ করেছিলেন । পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি বোধিসত্ত্বরূপে যে সব লীলা করেছেন, তা তাঁর স্মরণে আসে । বহুবীর কথা-প্রসঙ্গে শিষ্যদের তিনি সেই সব জাতক-কথা বলে গেছেন ।

(২) ফৌসবোল-সম্পাদিত “জাতকার্থবর্ণনা” নামক মূল পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ থেকে গ্রীকশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কর্তৃক ছন্দে অনুবাদ ।

কেন এমন হয় ? অথচ সেদিন কী দরদভরেই তিনি আৰুতি করেছিলেন, 'চল দুইজনে বিহারি সেখানে, মাতুষের পথ করিয়া বর্জন, যাপিব জীবন সুখে অন্তঃকণ করি পরস্পর প্রিয় সম্ভাষণ !'

কিন্তু এত বিলম্ব হচ্ছে কেন বাহুলের প্রত্যাবর্তনে ? ক্রমে দিনান্তের ক্লান্ত সূর্য অস্তাচলগামী হলেন—ঘনায়মান হল সান্ধা অন্ধকার। আজ বুঝি অমাবস্যা ? বাতায়ন-পথে দৃষ্টি মেলে দিয়ে দেখেন বাহিরে ঘনান্ধকার। বাজোড়ানে জোনাকির আলোয়। চিস্তার উর্ণনাভ বুনে চলেন যশোধরা। তবে কি পুত্রের মুখ দেখে মন টেলেছে সেই উদাসীন সন্ন্যাসীর ? তাকে কি বুকে টেনে নিয়ে আদর কবেছেন তিনি ? তাকে কি পাশে বসিয়ে জাতকের কাহিনী শোনাচ্ছেন ? তিনি কি পুত্রের কচি-কিশলয়তুল্য নবম হাতটি ধবে স্বয়ং তাকে পৌছে দিতে আসবেন এই কক্ষে ? ঐ কি তাঁদের পদধ্বনি !

পদশব্দে ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটে আসেন যশোধরা। দ্বার উন্মোচন করতে গিয়েও হাত ওঠে না। যদি দ্বার খুলে দেখেন, ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দেবতুল্যভাষি মহাপুরুষটি !

না, পিতাপুত্র নয়—দ্বার খুলে যশোধরা দেখলেন, ফিবে এসেছেন সেই নিশ্চয় কালুদায়ী। কিন্তু এ কি ? তিনি একা কেন ? বাহুল কোথায় ?

—বাহুল কোথায় ? আতঁকঠে প্রশ্ন করেন বাহুল-জননী।

—গুণোদারাম বিহারে। আপনাব শিক্ষামত সেই অপাপাবদ্ধ বালক মহা-সন্ন্যাসীর কাছে পিতৃধন প্রার্থনা কবেছিল। মহাভিক্ষু তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান কবেছেন তাকে।

- কী সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ ?

—প্রব্রজা ! বালক বাহুল আজ সন্ন্যাসী !

বজ্রাহতার মত মুহূর্তে ভূমিশয়ায় লুটিয়ে পড়েছিলেন মূর্ছাহতা রাজবধূ যশোধরা—মন্দভাগিনী বাহুল-জননী !

না ! এ নাটকের চরম মুহূর্ত কিন্তু এখনও আসে নি ! এ তো কোন পাখিব নাট্যকারের নাটক নয়—এ যে মহাকালের স্বহস্ত-লিখিত মহা-নাটক !

সহের শেষ সীমান্ত অতিক্রান্ত হল, ক্ষাত্র রূপতি শুদ্ধোদনের ! এ সংবাদে তিনি বিক্ষোবকের মত জ্বলে উঠলেন। উন্মাদেব মত ছুটে গেলেন গুণোদারাম বিহারে। দেখলেন, পাশাপাশি বসে আছেন তিনজন ভিক্ষু পূর্বাশ্রমে যাদেব পরিচয় ছিল সিদ্ধার্থ, নন্দ ও বাহুল—ওঁব জবাগ্রস্ত বাকের তিনটি পঙ্কর !

দেবশিশুব মত ঐ সপ্তমবর্ষীয় বালকের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন মহাবাজ। কচি-কিশলয়ের উপর বালার্কসূর্যেব রক্তিমাতার মত দেখতে পেলেন সেই বালকের আননে এক স্বর্গীয় জ্যোতির আভাস। ক্ষাত্র ধর্মের অনুশাসন আর মনে রইল না শুদ্ধোদনের—ছুটি নয়নের বাঁধ ভেঙে অন্তরের নিরুদ্ধ অশ্রুর বন্যায় ভেসে যেতে ইচ্ছা হল তাঁর।

কিন্তু না! কাঁদবেন না তিনি। তিনি শাস্তি দিতে এসেছেন তাঁর ছবিবিনীত পুত্র সিদ্ধার্থকে। কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—এ বালককে কোন অধিকারে প্রব্রজ্যা দান কবেছ তুমি?

নির্বিকার বুদ্ধদেব বললেন—সে পিতৃধন প্রার্থনা করতে এসেছিল। আমি ভিক্ষু, এই একটিমাত্র সম্পদই ছিল আমার কাছে। তাই দান কবেছি ওকে।

: তুমি তো উদাসীন সন্ন্যাসী। পিতাপুত্রের সম্পর্ক কি স্বীকার কর তুমি?

: এ জগতে যিনি আমাকে এনেছেন, তাঁকে অস্বীকার করি কি করে মহাবাজ?

: কিন্তু পুত্র কি পিতৃধন গ্রহণে বাধা?

: বাধা বইকি মহাবাজ। পিতৃধন তো কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না।

ক্ষাত্র তেজে অলাতখণ্ডের মত জ্বলে উঠে মহাবাজের দুটি আয়ত চক্ষু। বজ্রকণ্ঠে বললেন—তাই যদি হবে, তবে শোন সন্ন্যাসী, আমি কপিলাবস্ত্রব শাক্য নৃপতি মহাবাজ শুদ্ধোদন। আমি জৈনিক শাক্য সিদ্ধার্থের জনক। হে উদাসীন নিষ্ঠুর সন্ন্যাসী, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও: আমার সেই পুত্র সিদ্ধার্থ কি আজ প্রস্তুত আছে তার পিতার হাত থেকে বিনা বিচারে পিতৃধন গ্রহণে?

শিহবিত হয়ে ওঠেন সার্বিপুত্র, উৎকর্ষিত হয়ে পড়েন মহামৌদ্গল্যায়ন। এ কী কথা।

আসন ত্যাগ করে যুক্তকবে উঠে দাঁড়ান বুদ্ধদেব। অবিচলিতচিত্তে বলেন: আছে বই কি মহাবাজ।

এ উত্তরের জন্ম বোধকরি প্রস্তুত ছিলেন না শুদ্ধোদন। জগদত্রাতা ভগবান বুদ্ধদেব আজ তাঁর সম্মুখে যুক্তকবে দণ্ডায়মান। পিতৃধন শোধ করতে উদ্যত তিনি নিঃসর্তে গ্রহণ করতে চান পিতৃধন। শুদ্ধোদনের মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন পূর্বকার কথা। শিশু গৌতমের কথা, বালক সিদ্ধার্থের কথা। অপবোধী পুত্রকে তিনি কতবার কত শাস্তি দিয়েছেন। আজ আবার তাকে সেই শাস্তি দিতে হবে। হ্যাঁ, কঠোরতম শাস্তি। সেই সিদ্ধার্থ আজ আবার অন্ত্রায় কবেছে। অতান্ত্র অন্ত্রায়। সে কেড়ে নিয়েছে জরা-গ্রস্ত বুদ্ধের শেষ যষ্টি। মনে পড়ে গেল, মন্দভাগিনী জনপদ-কল্যাণীর কথা। এই উদাসীন সন্ন্যাসীর নিষ্ঠুর আঘাতেই হতভাগিনী ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। মনে পড়ল, সেই হতভাগিনী মহাগৌতমীর কথা—সিদ্ধার্থকে তিনি মানুষ কনেছিলেন, নন্দকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন—আজ তিনি ভগ্নহৃদয়ে বোগশয্যায় লীন। মনে পড়ল, সবার উপরে তাঁর কল্যাণময়ী চিব্বুংখিনী পুত্রবধব কথা। তার মূর্তি এখনও ভাঙে নি। এদের সকলের হয়ে প্রতিশোধ নিতে হবে তাঁকে। কী শাস্তি দেবেন তিনি? কী আদেশ করবেন? বলবেন কি—কিভাবে দাও বাতুলকে? বলবেন কি গার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরে আসতে হবে তোমাকে?

গ্রহণের মুদ্রায় দুটি বাহু মহাবাজের সম্মুখে প্রসারিত করে জগদত্রাতা বুদ্ধদেব বললেন—আপনি আমাকে পিতৃধন দান করুন পিতা।

সারিপুত্র কি একটা কথা বলতে গেলেন, কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হল না তাঁর।

সংবিৎ ফিরে পান শুদ্ধোদন। কিন্তু নিজের কথা তখন আর তাঁর মনে পড়ল না। বললেন : হ্যাঁ, গ্রহণ কর এই পিতৃধন, এ আমার অনুরোধ নয়, আদেশ ! প্রতিজ্ঞা কব, পিতামাতার সম্মতি-বাতিরেকে কোন নাবালককে আর কখনও প্রব্রজ্যা দান কববে না তুমি !

: এ আদেশ শিরোধার্য কবলাম পিতৃদেব !

বুদ্ধত্বলাভ করার পর এই প্রথম এবং শেষবার বিশ্বত্রাতা মহামানব গৌতমবুদ্ধ কোন মরমানুষের আদেশ বিনাবিচারে নতমস্তকে শিরোধার্য কবেছিলেন।

নন্দের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের চিত্র-নাটকের প্রথম দৃশ্য হচ্ছে শক জনপদ-নায়ক কালুদায়ী অশ্বারোহণে কপিলাবস্তুরে আসছেন বুদ্ধদেবের আগমনবার্তা ঘোষণা করতে (১৬।৩-ক)। কপিলাবস্তুর নগর-তোরণ অতিক্রম করছেন তিনি। তোবণদ্বারের পরেই দেখছি একটি অশ্ব উঁধ মুখে ত্রেষাধ্বনি করছে। তাব পিঠে কোনও সওয়ার নেই। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সওয়ার যখন ঘোড়াকে ছেড়ে দেয়, তখন সে ঠিক এভাবে আরামের ত্রেষাধ্বনি করে না কি ? পাশেই স্তম্ভময় একটি মণ্ডপের নীচে বুদ্ধদেব, সম্ভবতঃ, তিনি শ্রোগ্রোধারাম বিহারে দণ্ডায়মান (১৬।৩-খ)।

পরে, একটু নীচে দেখছি, বুদ্ধদেব পুনরায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর বামহস্তে ভিক্ষা-পাত্র, দক্ষিণহস্তে তিনি আশীর্বাদ কবছেন একটি নাবী ও একটি শিশুকে। একটু সম্মুখে

নন্দের ধর্মাস্তবগ্রহণ পুনরায় সেই মহাভিক্ষুর আলোখ্য (১৬।৩-গ)। এবাব লক্ষণীয়, তাঁব সম্মুখে ও পশ্চাতে একই শিশুর চিত্র ছবাব ঝাঁকা হয়েছে। যেন

আনন্দের আতিশয্যে কপিলাবস্তুর পথে ভিক্ষারত বুদ্ধদেবকে প্রদক্ষিণ কবে নৃত্য কবছে একটি শিশু ! সম্মুখে আরও সাত-আটজন পুর্ববাসী। তাদের মুখাকৃতি দক্ষিণ ভারতীয়। সর্বনিম্নে দেখছি দণ্ডায়মান বুদ্ধদেবের পদপ্রান্তে প্রণামরত বাজকুমার নন্দ বলছেন—আপনি আমাকে প্রব্রজ্যা দান করুন !

এর নীচে কিছু পলেন্সারা খসে পড়ছে। তারও নীচের দৃশ্যটিতে (১৬।৩-ঘ) শ্রোগ্রোধারামের বিহারে নন্দের মস্তক মুগুন করা হচ্ছে। সম্মুখে সিংহাসনে উপবিষ্ট তথাগত বুদ্ধ, তাঁর পাশে অপর একজন ভিক্ষু—সম্ভবতঃ সারিপুত্র। প্রামাণিকের মুখটি নষ্ট হয়ে গেছে। পরের প্যানেলে মুণ্ডিতমস্তক নন্দ কবলগ্নকপোলে উপবিষ্ট—অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ট মর্মান্বিত মূর্তি তাঁব (১৬।৩-ঙ)। অদূরে দুজন ভিক্ষু কি যেন জল্পনা করছেন—অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নন্দকে নির্দেশ করছেন। তাব পরের প্যানেলে দেখছি, শূন্যপথে বুদ্ধদেব ও নন্দ আকাশ-পথে উড়ে যাচ্ছেন।

কাহিনীর এ অংশটুকু বলা হয় নি, তাই চিত্রগুলি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সে-টুকু বলে নিই এবাব।

জনপদ-কল্যাণীর মৃত্যু-সংবাদে একেবারে উদ্ভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিলেন নন্দ। তখন বুদ্ধদেব তাঁকে প্রশ্ন কবেন—কল্যাণীর বিরহে তুমি এভাবে ভেঙে পড়ছ কেন? ধর্মাচরণে তোমার মন নেই কেন?

নন্দ বলেন—এমন নারীর ত্রিভুবনে আর নেই, আর হবে না!

বুদ্ধদেব বলেন—ভ্রান্ত ধারণা তোমার; এস আমার সঙ্গে। আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাব। সেখানে স্বর্গের অঙ্গরাদের দেখলে বুঝতে পারবে, ত্রিভুবন সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তার চেয়েও বড়।

বিশ্বাস হয় না নন্দের। বুদ্ধদেব তখন অনুজকে নিয়ে যান স্বর্গে। নন্দ মুগ্ধ হয়ে যান সুরললনাদের দেখে! নারীর দেহে যে এত রূপ থাকতে পারে, এ তাঁর কল্পনাই ছিল না। মর্ত্যে ফিরে এলেন ওঁরা। নন্দ বলেন—আপনি যে সব অনুশাসনের কথা বলছেন, তা ঠিক ঠিক মেনে চললে আমি অস্থিমে ঐ রকম একটি নারীর পাব?

বুদ্ধদেব মৃদু হেসে সংক্ষেপে বললেন—তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

ক্ষুব্ধ হয় বৌদ্ধ ভিক্ষুব দল। ওরা বাঙ্গ-বিদ্রূপ করে। এমন কি ওদের একজন বলে—রাজকুমার নন্দ উন্মাদ হতে পারেন, কিন্তু প্রভু কি করে ঐ রকম প্রতিশ্রুতি দিলেন?

শুনে জ্ঞানবুদ্ধ সারিপুত্র তাকে ধিক্কার দিয়ে বলেন—তোমরা কি প্রভুরও বিচার করতে চাও?

লজ্জিত হয় সেই বৌদ্ধ শ্রমণ; প্রায়শ্চিত্ত করতে বসে সে।

পুনরায় যেদিন নন্দ একই প্রশ্ন করলেন তাঁকে, তখন তিনি বললেন—নন্দ, এতদিন তুমি জনপদ-কল্যাণীর রূপে অন্ধ ছিলে। আজ স্বর্গের অঙ্গরাদের দেখে তাকে ভুলেছ! সত্য কি না?

নন্দ লজ্জিত হয়ে স্বীকার করেন সে-কথা।

বুদ্ধদেব বলেন—কিন্তু এ-ও তোমার ভ্রান্তি নন্দ; এব চেয়েও মহৎ সম্পদেব সন্ধান যখন পাবে, তখন দেখবে স্বর্গের অঙ্গরাদের কথাও ভুলে গেছ তুমি!

মর্মান্তিক লজ্জিত হলেন নন্দ। এর পব থেকে কায়মনোবাক্যে ধর্মাচরণে মন দিলেন তিনি। বস্তুতঃ, সেইদিনই তিনি হলেন প্রকৃত অর্হৎ!

আকাশপথে উড্ডীয়মান ঐ মূর্তি দুটি এবং বিমর্ষ নন্দের দিকে নির্দেশবত বৌদ্ধ ভিক্ষু, এ-দুটি এই কাহিনী অবলম্বনে অঙ্কিত।

এর পরে বলতে হয় মরণাহতা রাজকন্যার চিত্রকথা (১৬৩-৮) :

অজস্কার এই অগ্ন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রটি দেখে গ্রীফিথ বলেছিলেন—“The Florentines could have put better drawing, and the Venetians better colour, but neither could have thrown greater expression into it.....”

চিত্রে (চিত্র—৫৯) সর্ববামে দেখছি দুটি পুরুষচিত্র। একজনের হাতে নন্দের রাজ-মুকুট, অপরজন জনপদ-কল্যাণীকে কিছু বলতে চায়। কল্যাণী একটি শয্যায় অর্ধ-শায়িতা—

মূর্তীতুরা মর্তি তাব। রাজমুকুটের দিকে বেচারী তাকাতে পারছে না। পতনোন্মুখ কলাগীকে পিছনে থেকে একজন ধরে আছে। সম্মুখে আর একজন সেবিকা তার

নাড়ির গতি লক্ষ্য করছে। তৃতীয় দণ্ডায়মানা একজন ব্যঙ্গনিকা

মবণাহতা রাজকন্যা

তাকে বাতাস দিচ্ছে। প্রত্যেকের মুখেই উদ্বেগ ও হতাশার ছায়া। স্তম্ভের যতি-চিহ্নেব ওপাশে আব একটি খণ্ডদৃশ্য। মণ্ডপের বাহিরে একজন কিশ্করী (সম্ভবতঃ নিগ্রো) একজন মহিলা চিকিৎসকেব নিকট পরামর্শ চাইতে এসেছে। চিকিৎসকেব বামহস্তে ঔষধ-ভৃঙ্গাব, দক্ষিণহস্তেব কবাস্কুলি দুই-সংখ্যাকে স্মৃতিত করেছে। তিনি হয় বলছেন - আব দুই দণ্ডেব ভিতর রোগিনীৰ যন্ত্রণাব চির উপশম হবে; অথবা বলছেন ঔষধ দুইবার সেবা।



চিত্র—৫৯

মবণাহতা রাজকন্যা (জনপদ-কলাগী)

অবস্থান—১৬।৩-৮

চিত্রটির বর্ণনাশেষে গ্রীকিথ বলেছেন—“For pathos and sentiment and the unmistakable way of telling its story, this picture, I consider, cannot be surpassed in the history of art.”

বোধ করি এ-চিত্রের সমালোচনায় ঐটিই শেষ কথা !

সম্মুখেব প্রাচীরে হস্তি-জাতকের একটি কাহিনী ছিল (১৬।৪) ; বর্তমানে কিছুই বোঝা যায় না। পাশের প্রাচীরে আর একটি জাতক-কাহিনী (১৬।৫)। চিত্রগুলি

অক্ষত ; কিন্তু এটিকে সনাক্ত করা যায় নি। দেখছি, একজন অস্বারোহী...একটি বাজক চারজন লোককে কি বলছে...নীচে দুটি লোক এক শিশুকে ধরে আছে। একজন ধরেছে দুটি হাত, অপরজন দুটি পা।...তৃতীয় জন তরবারি উত্তোলন করেছে শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে। গাইড হয়তো বলবে—এ সেই কাজীর বিচারের গল্প। সেই দুটি নারী একটি শিশুকে নিজের সম্মান বলে দাবি করে এবং কাজী এই বিবাদের মীমাংসা করতে চান শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করে। অন্ততঃ আমাকে গাইড তাই বলেছিল। কিন্তু কাহিনীটি তা নয়—যে দুজন শিশুটিকে ধরে আছে তাব একজন রমণী, অপরজন পুরুষ !

নন্দের কাহিনীর পবে কয়েকটি মানুষী-বুদ্ধের চিত্র (১৬৬)। তারপর প্রাচীরের প্রান্তে দুটি ছোট্ট চৌখুপিতে দুটি অপূব শিল্প-নিদর্শন। একটি পুরুষ (১৬৭-ক) ও অপরটি নারীচিত্র (১৬৭-খ)। মীর্জা ইস্মাইল বলেন, তিনি এদের নামকরণ করেছেন যুগনয়ন ও মীননয়না।

ও-পাশে বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচারের একটি চিত্র (১৬৮) নষ্ট হয়ে গেছে। তাব পাশে, গ্রীফিথ সাহেব বলছেন, তাব আমলে ছিল একটি হস্তি-শোভাযাত্রার দৃশ্য। অজাতশত্রু হস্তিপৃষ্ঠে বুদ্ধদেবের দর্শনমানসে চলেছেন (১৬৯)। বর্তমানে কিছুই নেই। অপর প্রান্তে বুদ্ধদেবের আর একটি চিত্রও কালের করাল গ্রাসে অবলুপ্ত (১৬১০)।

বেরিয়ে এলাম ষোড়শ গুহা-মন্দির থেকে। পথে নেমে ইস্মাইল-সাহেবকে প্রশ্ন কবি -আপনি তো কলা-রসিক। বলুন তো অজন্তায় কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে সুন্দর ?

উনি আড়চোখে আমাকে একবার দেখে নিয়ে বলেন—নন্দের উপাখ্যানটা মন দিয়ে শোনেন নি দেখছি।

অবাক হয়ে বলি—কেন ? এ-কথা কেন বলছেন ?

—শুনলেন না, মানুষের সৌন্দর্যবোধ আপেক্ষিক। স্বর্গের অঙ্গরা না দেখা পর্যন্ত নন্দ মনে করতেন, জনপদ-কল্যাণীই ত্রিভুবনে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা !

আমি বলি -কিন্তু আপনি তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আছেন এখানে। অজন্তার-ত্রিভুবনে দেখতে তো আর কিছু বাকি নেই আপনার। আপনার ব্যক্তিগত মতে কোন নারীচিত্রটি সবচেয়ে সৌন্দর্যের ছোতক ?

এক টুকরো হাসি খেলে গেল ইস্মাইলের বলিরেখাঙ্কিত মুখে। বলেন—শুনতে চান আমার অভিমত ? বেশ বলছি, কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রতিপ্রশ্নের জবাব দেবেন ?

বুঝতে পারি ওঁর প্রতিপ্রশ্নটা কি। উনি নিশ্চয় জানতে চাইবেন, আমার চোখে কোন্ নারীচিত্রটি সবচেয়ে ভালো লেগেছে। আমি কোন্টিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলব। মনে মনে উপযুক্ত উত্তরটি প্রস্তুত করছিলাম, কিন্তু ওঁর প্রশ্ন শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বলেন—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেছেন ওদের কথায় ?

অবাক হয়ে বলি--কাদের কথা ?

—ঐ দারোয়ান, গেট-কীপার, কিংবা টিকিটবাবুর কথা ?

আমতা আমতা করে বলি— কি কথা বলুন তো ?

—যে বুড়ো মীর্জা ইস্‌মাইল একটি ছবির প্রেমে পাগলা মেহেরালি হয়ে গেছে ?

লজ্জায় মাথাটা আর তুলতে পারি না।

উনি হেসে বলেন—আপনি লজ্জা পেয়েছেন বাবুজি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওরা বোকার মত ভুল বলে। ই্যা স্বীকার করছি, এখানকার একটি বিশেষ চিত্রকে আমার বিশেষভাবে ভালো লাগে। মাঝে মাঝে একেবারে একা হয়ে পড়লে, ওখানে গিয়ে আমি দাঁড়াই। কিন্তু কেন জানেন ? তার কারণ, এ অজন্তা গুহায় ঐ একটিমাত্র চিত্র আমি আজও ভালো করে দেখি নি ! দেখবার সুযোগ পাই নি। ওর সামনে দিয়ে যখনই যাই, দেখি দারোয়ানগুলো আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে, গা টেপা-টেপি করছে, হাসছে ! ওদের উৎপাতে, বিশ্বাস করুন, আজ ছয় মাসের মধ্যে সেই চিত্রটির দিকে একবারও মুখ তুলে তাকাই নি !

মরমে মরে গেলুম আমি !

কিন্তু এর পরের প্রশ্নটিতে আবার সন্দেহ হল—ভদ্রলোক কি সম্পূর্ণ সুস্থ-মস্তিষ্ক ? হঠাৎ দাঁড়িয়ে গড়ে উনি বলেন—আপনি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন ?

জবাব দিতে আমার বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক।

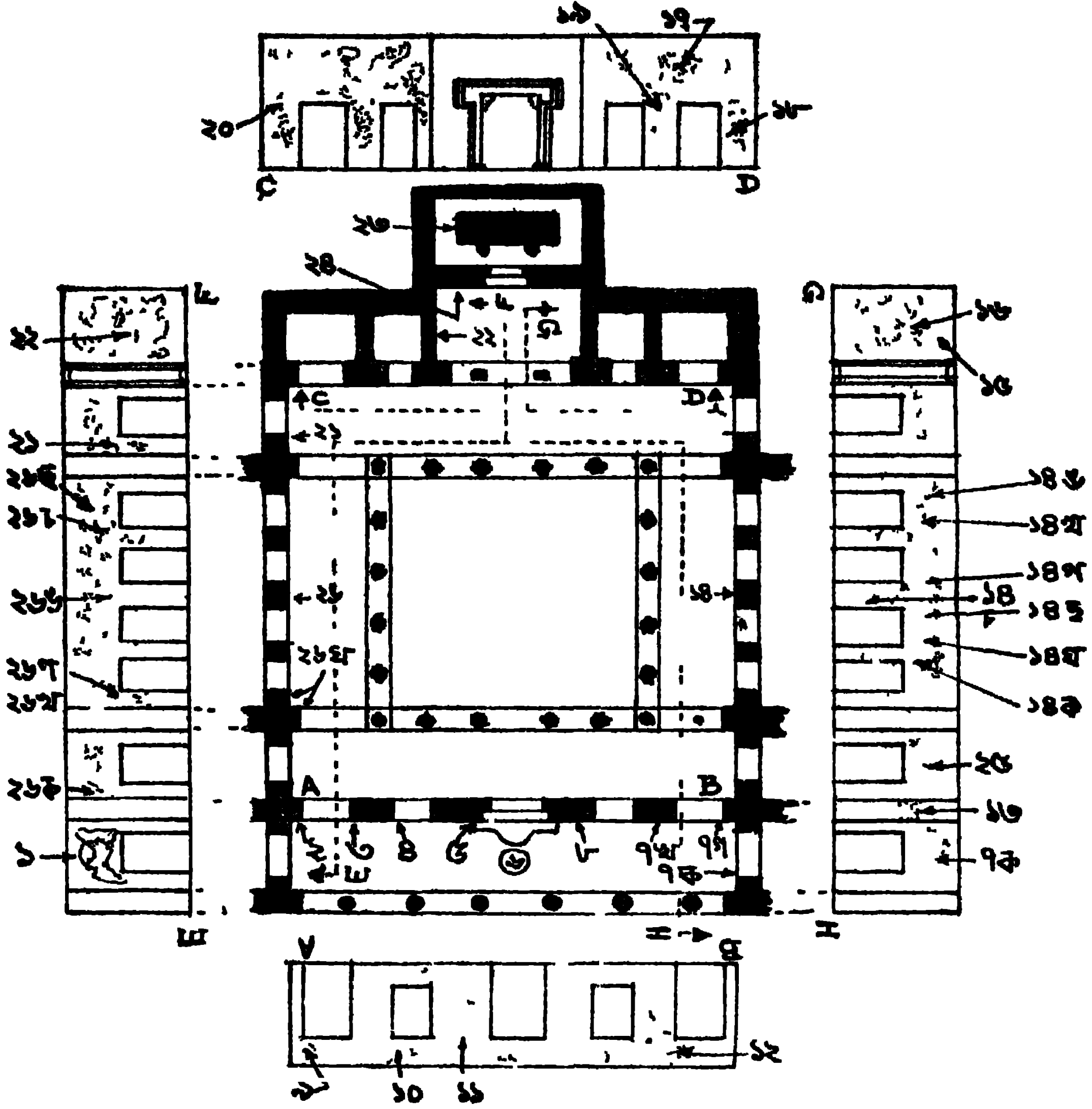
কিন্তু আমার জবাবের অপেক্ষা না কবেই উনি বলতে থাকেন—কিন্তু কেন ? তার কারণ, তাঁর সঙ্গে আপনার জীবন অচ্ছেদ্য-বন্ধনে আবদ্ধ। তাঁকে আপনি নিত্য দেখেন, তাঁর সঙ্গে আপনার অন্তরের ভাব-বিনিময় হয়। এই চিত্রগুলির সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও তাই। এখানে যখন প্রথম আসি, তখন আমার বয়স বাইশ-তেইশ। সংসারে আমার কেউ নেই, চিত্রগুলিই আমার খেলার সাথী ! দীর্ঘদিন ওদের মাঝে থাকতে থাকতে ওদের ভালবেসে ফেলা কি আমার অপরাধ, না সেটা অসম্ভব কিছু ?

আমি বলি—আমি তো তা বলি নি।

আমার কথা ওঁর কানে যায় না। কেমন যেন একটা ভাবাবেগে বিহ্বল হয়ে পড়েন রক্ত। দূর-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে অশ্রুমনস্কের মত আমার হাতটি তুলে নিয়ে বলেন—বাবুজি ! আমি বাঙলা ভাষা জানি না—কিন্তু ইংরাজীতে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ গল্পটি আমি পড়েছি। আচ্ছা, আপনি বিশ্বাস করেন অমন ঘটনা বাস্তবে ঘটতে পারে ?

আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে !

ঠিক সেই সময়েই কলরব-মুখরিত কলেজের একদল ছেলেমেয়ে হৈ হৈ করতে করতে এসে হাজির হল বিপরীত দিক থেকে। বোধ হয় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল ওঁর।



চিত্র - ৬০

সপ্তদশ গুহা-মন্দিরের প্ল্যান

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| ১ সংসার-চক্র | ১৩ প্রসাধনরতা রাজকন্যা | ২১ স্নাতসোম-জাতক |
| ২ দানেব দৃশ্য | (চিত্র - ৬৩) | ২২ সার্বিপুত্রের পদীক্ষা |
| ৩ মূর্ত্যুরা মাদ্রী ও বিশ্বাস্তব | ১৪ সিংহল অবদান জাতক | (চিত্র - ৬৬) |
| ৪ শত্রুের মর্ত্যে আগমন | ক বাণিজ্যতবী জলমগ্ন | ২৩ গর্তমন্দিবে যুগদাবেব বুদ্ধমূর্তি |
| (চিত্র - ৬১) | খ বাঙ্গসীদেব হত্যা-উৎসব | ২৪ গোপা, বাহুল ও বুদ্ধদেব |
| ৫ আটজন মানুষী-বুদ্ধ | গ বোধিসত্ত্ব অশ্বরাজ | (চিত্র - ৬৭ ও চিত্র - ৬৮) |
| ৬ ছয়জন নর্তকী (সিলিঙে) | ঘ সিংহ-কেশবী বদরবার | ২৫ শিবী জাতক (চিত্র - ৬৯) |
| ৭ নলগিবি দমন | ঙ সিংহ-কেশরী হত্যা | ২৬ বিশ্বাস্তব জাতক |
| ক বেত্তবনে ধর্মপ্রচাৰক বুদ্ধদেব | চ বিজয়সিংহেব যাত্রা | ক তরবারি দান |
| খ নলগিরির সন্দমন্ত আক্রমণ | ছ অভিষেক (চিত্র - ৬৫) | খ কলিঙ্গবাসীর ভিক্ষা প্রার্থনা |
| গ নলগিবি বুদ্ধকে প্রণামরত | ১৫ কতিপয় বুদ্ধ চিত্র | গ পৃথবীর নিকট বিদায় যাত্রা |
| ৮ কৃষ্ণ-অঙ্গর (চিত্র - ৬২) | ১৬ মহিষ-জাতক | ঘ মাদ্রীর নিকট বিদায় যাত্রা |
| ৯ হস্তিজাতক (অবলুপ্ত) | ১৭ শরভ-জাতক | ঙ রাজপথে রথাকট বিশ্বাস্তব |
| ১০ মহাকপি-জাতক | ১৮ শ্রাম-জাতক | চ রথীন্দ্র দান |
| ১১ বড়দন্ত-জাতক | ১৯ মাতৃ-পোষক জাতক | ছ সঞ্জয় সম্মুখে জুজুক |
| ১২ যুগ-জাতক | ২০ স্নাতসোম-জাতক | (চিত্র - ৭০) |

যেন সংবিৎ ফিবে এল ফের। আমাব হাতটি ছেড়ে দিয়ে বলেন - লেট্‌স্ নাউ গো টু কেভ নাহ্যার সেভেনটিন—তু ট্রেসাব-হাউস অব অজন্তা ফ্রেস্কোস্।

মীর্জা ইসমাইল কিছু অত্যাঙ্কি কবেন নি। সপ্তদশ গুহা-বিহাৰটি অজন্তা-চিত্ৰেৰ স্বৰ্ণভাণ্ডাৰ। অসংখ্য জাতক-কাহিনী থবে থবে সাজানো - যেন আৰ্ট গ্যালারি।

দাক্ষিণাত্যেৰ বাজা ঋষিক তাঁৰ কনিষ্ঠ ভ্ৰাতাৰ স্মৃতিৰক্ষার্থে নাকি এই বৌদ্ধ বিহাৰটি খনন কবান এবং নানান্ চিত্ৰ-সম্ভাৰে এটিকে সাজিয়ে তোলাৰ ব্যবস্থা কবেন। ষোড়শ বিহাৰে দেখেছিলাম গৌতমবুদ্ধেৰ জীৱনেৰ নানান্ কাহিনী অবলম্বনে চিত্ৰ-সম্ভাৰ

সাজিয়ে তোলা হযেছে। সপ্তদশ বিহাৰে জাতক-কাহিনীৰ প্ৰাবল্য
সপ্তদশ বিহাৰ
লক্ষ্য হল। কেন্দ্ৰস্থ হল-কামবাটি একটি পূৰ্ণ চতুষ্কোণ। ৬৪ ফুট

দীৰ্ঘ ও প্ৰস্থ। কুড়িটি স্তম্ভে এই কেন্দ্ৰস্থ হল-কামবাটি স্তম্ভোভিত। সম্মুখেৰ অলিন্দে দাঁড়িয়ে প্ৰথমেই নজবে পড়ে সূৰহং সংসাৰ-চক্ৰটিকে (১৭১১)। আট-দশ ফুট ব'স বিশিষ্ট একটি বৃত্ত, অনেকটা প্ৰকাণ্ড ঘড়িৰ মত। নীচেৰ দিকটা নষ্ট হযে গেছে। চক্ৰেৰ বিভিন্ন খোপে গ্ৰামীণ ও নগৰজীৱনেৰ ছোট ছোট খণ্ডচিত্ৰ বিধৃত। বিষয়-বস্তু কী কী ছিল আজ আর তা বোঝা যায় না^১, মনে হয়, একটি খোপে বলদ দিয়ে চাষ কবানো হছে, আৰ একটি খোপে নবনাৰীৰ মিথুন-মৃতি। চিত্ৰেৰ বিষয়-বস্তু সম্পূৰ্ণ বুঝতে না পাবলেও অনুভব কৰা যায়। এ সংসাৰ-চক্ৰেৰ পাবে পাকে তোমাকে আমাকেও ঘূৰতে হছে। এই প্ৰবৰ্তিত চক্ৰেৰ অনুবৰ্তন যে কৰে না - বোধ কৰি 'মোঘং পাৰ্থ স জীবতি'। উপৰে দেখতে পাচ্ছি দুটি সবুজ বঙেৰ কবাজুলিৰ আভাস। অনেকক্ষণ ভাল কৰে নজৰ কবলে তা দেখতে পাওযা যায়। শিল্পীৰ বক্তব্য যিনি এ চক্ৰেৰ চক্ৰধাৰী, যন্ত্ৰেৰ যন্ত্ৰী, তাঁকে প্ৰত্যক্ষ কৰা যায় না, শুধু অনুভব কৰা যায় তাৰ কবাজুলিৰ স্পৰ্শ। তাৰ পাশেই একজন বাজা দান কৰছেন। খুব সম্ভবতঃ এটি বিশ্বাস্তৰ জাতক-কাহিনীৰ অংশ (১৭১২)। দেখছি, বাজাৰ পাশে চাবজন অমাত্য ভিক্ষুকেৰ দল দান গ্ৰহণ কৰছে।

একজন অন্ধ ভিক্ষুক শিশুক্ৰোড়ে জননী রাজা একটি তোৰণদ্বাৰ অতিক্ৰম কৰেছেন। একটি সভামণ্ডপে বাজা ও মূৰ্ছাতুৰা তাঁৰ বানী (১৭১৩) এ চিত্ৰগুলি বিশ্বাস্তৰ-জাতকেৰ অংশ, সেই জাতক-কাহিনীটি যখন বলব, তখন এ চিত্ৰগুলি নিয়ে আলোচনা কৰা যাবে। চিত্ৰেৰ মিছিল চলেছে একটানা স্বৰ্গ থেকে সপাৰ্শদ শক্ৰ (ইন্দ্ৰ) নেমে আসছেন পৃথিবীতে, বিশ্বাস্তৰকে পৰীক্ষা কৰতে (১৭১৪)... গতিবেগে উডছে তাঁৰ উত্তরীয়, তাঁৰ কণ্ঠেৰ শতনবী।

(১) ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্ৰকাশিত একটি গ্ৰন্থ সাৰ জেমস্ ফাণ্ড মন বলেছিলেন

'১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ব্ৰেক এই সংসাৰচক্ৰে সবসময়ত ৭৩টি ফিগাৰ দেখেছিলেন। সেগুলি ছিল পাঁচ ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি মাপের। চক্ৰেৰ দুই-তৃতীয়াংশ তখন দেখা যেত। পৰ অনুমান কৰা হয়, ডঃ বার্ড এখান থেকে ছুৰি দিয়ে চেকে ছবি চুৰি কৰাৰ চেষ্টা কৰেন—এখন এ চক্ৰটিৰ অতি সামান্যই পৰিদৃশ্যমান।' (বৰ্তমানে এক-দশমাংশও অবশিষ্ট নেই।)

—Cave Temples of India by Fergusson & Burgess, London, 1880

এই চিত্রটির প্রসঙ্গে একটি সাহিত্য আলোচনা করতে ইচ্ছা করছে। চিত্রে দেখছি, ঘন নীল আকাশের পশ্চাৎপটে আষাঢ়সঘন জলদ-স্তবক, একেবারে ধরে ধরে সাজানো। .. মেঘ চলেছে ভেসে.. আর মেঘের সম্মুখে নভচারী সিদ্ধাচার্য গন্ধর্বেব দল তাঁদের বীণা, বংশী, বাজ্যযন্ত্রাদি নিয়ে দ্রুতগতি ভেসে চলেছেন মেঘের আগে আগে (চিত্র—৬১)।



চিত্র—৬১

সপার্বদ ইন্দ্রের মর্ত্যে আগমন

অবস্থান—১৭ ৪

এ খণ্ডদৃশ্যটি ইন্দ্রের স্বর্গ থেকে নেমে আসার দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত - ফলে, মূল বিষয়-বস্তুর সঙ্গে বেমানান একটুও নয়। ইন্দ্র আকাশপথে নেমে আসছেন, তাঁর সঙ্গে বাজ্যযন্ত্র-ধারী গন্ধর্বেব দলও আসবেন বইকি তা যেন হল, কিন্তু এই খণ্ডদৃশ্যটি দেখে আমার মনে পড়ে গেল কালিদাসের মেঘদূতের একটি বিখ্যাত চরণ।—‘সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াবীর্ণিভি-মুক্তিমার্গঃ’। অর্থাৎ, দলে দলে মেঘ ধেয়ে আসছে দেখে সিদ্ধদম্পতি বীণা হাতে ছুটে পালাচ্ছে, তাদের ভয় হয়েছে জলকণায় তাদের বাজ্যযন্ত্র ভিজে নষ্ট হয়ে যাবে।

এই খণ্ডচিত্রটি দেখে আমার কেমন জানি মনে হল, অজ্ঞতা-শিল্পীর মনে মেঘদূতের ঐ বর্ণনাটি নিশ্চয়ই জাগরুক ছিল এ-পরিকল্পনার সময়। কিন্তু তা কি সম্ভব?

এই সপ্তদশ বিহারটির নির্মাণকাল ৪৭০—৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাসের কাল নিয়ে

পণ্ডিতরা একমত হতে পারেন নি—কিন্তু মান্দাসোবের সূর্যমন্দিরে বৎসভট্টি-লিখিত একটি লিপি পাওয়া গেছে, যার সময় হল ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। তার মধ্যে একটি শ্লোকে কালিদাসের “বিদ্যাস্বতঃ ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিভ্রাঃ..” শ্লোকের প্রভাব অত্যন্ত স্কুলভাবে পড়েছে। তাই দেখে ইতিহাস-বেত্তা বেরীডেল কীথ বলেছেন, “স্বতরাং কালিদাস জীবিত ছিলেন খ্রীষ্টীয় ৪৭২ অব্দের পূর্বে, কাজেই তাঁর কাল খ্রীষ্টীয়-পঞ্চম শতাব্দীতে নির্দিষ্ট করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।”

ফলে, এই খণ্ডচিত্রটিতে আমি যদি মেঘদূতের প্রভাব লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে আমার যুক্তিকেও উড়িয়ে দেওয়া চলবে না। মান্দাসোরে-উৎকীর্ণ ঐ শ্লোক আর অজন্তাব এই গুহা একই শতাব্দীর, একই দশকের সম্পদ। আর এই সময়কালের প্রায় সম্ভব-আশি বৎসর পূর্বে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য স্বীয় কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বাকাতক-নৃপতি বৃদ্ধসেনের বিবাহ দিয়েছিলেন। অজন্তার ঐ যুগের শিল্পীরা বাকাতকী রাজাদের অনুগ্রহভাজন ছিলেন এ-কথা মনে করা স্বাভাবিক, আর প্রভাবতী দেবীর সঙ্গে গুপ্তসম্রাটের রাজসভার কয়েকজন বিশিষ্ট সভাসদ সে বাকাতক রাজসভায় এসেছিলেন, তারও ঐতিহাসিক নজির আছে।

প্রবেশপথে তোরণের উপর আটজন মানুষী-বুদ্ধের (১৭১৫) আলেখ্য। তার নীচে আটটি ছোট ছোট চৌখুপিতে আট জোড়া মিথুন-চিত্র। প্রবেশপথের দুপাশে দুটি মর্মমূর্তি—শালভণ্ড্রুকা নারীমূর্তি। অলিন্দের সিলিঙে কেন্দ্রস্থলে ছয়জন নর্তকী (১৭১৬) হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। লক্ষণীয়, তাদের ছয়জনের সর্বসমেত ছয়টি হাত আছে—বারোটি নয়।

দ্বারের দুই প্রান্তে বুদ্ধদেবের জীবনের একটি স্ববর্ণীয় অলৌকিক ঘটনা—নলগিরি-দমন (১৭১৭)। কিন্তু তার পূর্বে বলতে হয়, এই প্রাচীরেই আছে অজন্তাব অন্যতম শ্রেষ্ঠ নারীচিত্র—বিখ্যাত কৃষ্ণা-অঙ্গরা (১৭১৮)। এই কৃষ্ণা-অঙ্গরাও বায়ুভরে ভেসে চলেছে আকাশপথে—গতির জন্ম তাব কণ্ঠের ইন্দ্রকান্তমণিখচিত শতনরী একদিকে বেকে গেছে। মাথায় টায়রা ও মুকুটে মুক্তার ঝালরগুলিও সব একদিকে হেলে আছে। কিন্তু এ চিত্রের আসল আবেদন কৃষ্ণা-অঙ্গরার ভাবস্তুমিত মদবিহ্বল অর্ধ-নিমীলিত দুটি নয়নের দৃষ্টিতে (চিত্র—৬১)।

নলগিরি-দমন কাহিনীর ঘটনা বাজগৃহের। বিশ্বিসাবেব পব অজাতশত্রু তখন মগধের সিংহাসনে। পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে মুছে ফেলে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর।

নলগিরি-দমন

পূর্বপ্রান্তরের প্রাচীরে দেখছি বেগুবন বিহারে তথাগত বুদ্ধ সঙ্ঘর্মের মর্মকথা শোনাচ্ছেন (১৭১৭ ক)। এদিকে দেখছি, রাজসভায় অজাতশত্রুর কাছে স্বিকার্ত্তের অনুজ দেবদত্ত সদন্তে ঘোষণা করছেন—বেদ, ব্রাহ্মণ আর রাজাকে যে ধর্ম একমাত্র পূজ্য বলে স্বীকার কবে না, সেই ধর্মের মূলোচ্ছেদ করবেন তিনি। অজাতশত্রু আর দেবদত্ত গোপনে জল্পনা করলেন বেগুবনের ধর্মসভায় চালিত

কবে দেওয়া হবে একটি মদমত্ত হস্তীকে। শিল্পী এই বাজসভার পাশেই ঐকেছেন বাজাস্তম্ভপুৰেৰ একটি খণ্ডদৃশ্য। সেখানে দেখছি, দুটি পুৰকামিনী এ সংবাদে সজ্জস্তা। যদি মনে কৰি, ঐ দুটি মেয়েৰ নাম শ্ৰীমতী ও মালতী, তাহলে মহাবানী লোকেশ্বৰীৰ এ অস্তম্ভপুৰে ওবা কি বলাবলি কৰছে তা সহজেই অনুমান কৰতে পাবব। পৰেৰ দৃশ্যে দেখছি, মদমত্ত একটি বাজহস্তীকে ধৰ্মসভাৰ দিকে চালিত কৰে দেওয়া হয়েছে (১৭৭ খ) দেখছি, নলগিৰি নামে সেই ক্ষিপ্ত গজবাজ উন্মত্ত পদক্ষেপে ছুটে চলেছে বাজপথ দিয়ে অগনি। নীত নবনাৰী প্ৰাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে একজন সাত্ত্বী হাত তুলে সাবধানবাণী উচ্চাৰণ



চিত্র—৬২

কৃষ্ণ-অপ্সৰা

অৱস্থান ১৭৮

কৰছে বাজপথেৰ তুধাবে সাৰি সাৰি দিতল-বাডী। একতলায় দোকান-ঘৰগুলিতে সকলে প্ৰাণভয়ে পালাচ্ছে। দ্বিতলে অলিন্দে ও বাতায়নে ভয়ভ্ৰস্তা পুৰকামিনীদেৱ আলেখ্য। এই বিৰাট প্যানেলটিৰ একেবাবে শেষপ্ৰান্তে দেখছি, বিপৰীতে দিক থেকে অগ্নিসৰ হয়ে আসছেন নির্ভীক এক সন্ন্যাসী, প্ৰশান্ত তাৰ মূৰ্তি। দেখছি, প্ৰমত্ত নলগিৰি সেই পৰমপুৰুষ গৌতমবুদ্ধেৰ সন্মুখে নতজান্ত হয়ে বসে পড়েছে, বুদ্ধদেৱ ওৰ গজবুৰ্জ সন্মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন (১৭৭ গ)।

এই চিত্র-কাহিনীৰ প্ৰতিটি চৰিত্ৰ প্ৰাণবন্ত ও ভাব-ব্যঞ্জনাৰ বাহ্যিক। উদ্ভূত জলপ্ৰপাত যেমন বিশাল হ্ৰদেব বৃকে প্ৰচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবাবে হাৰিয়ে ফেলে নিজেকে, তবলা-লহৰাব তেহাই যেমন হঠাৎ এসে থামে সমেৰ মাথায়, ঠিক তেমনি এই প্ৰভঞ্জনগতি চিত্ৰ-নাটকেৰ যবনিকা পতন হল নলগিৰি-দমনে। চিত্ৰটিৰ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, একই চিত্ৰে শিল্পী সবকয়টি বসেৰ পৰিবেশন কৰেছেন। বাজাস্তম্ভপূৰ্বে মিথুন-মূৰ্তিতে আদিবাসেৰ ইজিত, ক্ৰোধাধ্বিত অজাতশত্ৰুৰ বৌদ্ৰবস, পলায়নপৰ নবনাবীৰ ভয়ানকবস, হস্তিপদ-দলিত মৃতদেহেৰ বীভৎসবস, আৰ্ত্তত্ৰাণেৰ প্ৰচেষ্টায় সাত্ত্বীৰ বীৰবসেৰ ভূমিকা, মৃত অশ্বীয়েৰ সন্মুখে ক্ৰন্দনবতাব ককণবসেৰ অভিযুক্ত -সবই আছে, এবং সবাব উপৰে পড়েছে শেষ দৃশ্যে শৃঙ্গাব-বীৰ-বৌদ্ৰ-ভয়ানক-বসেৰ বিপবীতধৰ্মী শান্তবসেৰ ককণাধাৰা। একই চিত্ৰেৰ পৰিসৰে নববসেৰ এমন খেলা আৰ কোথাও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।

অলিন্দ অতিক্ৰম কৰে মণ্ডপেৰ ভিতৰে আসি। এবাবে প্ৰবেশদ্বাৰেৰ দিকে মুগ কৰে A B-চিহ্নিত প্ৰাচীৰেৰ ফ্ৰেস্কোগুলি একে একে দেখতে থাকি। বামপ্ৰান্তে হস্তি-জাতকেৰ কাহিনীটিকে উদ্ধাৰ কৰা গেল না (১৭১৯), কিন্তু তাৰ পাশে মহাকপি-জাতকেৰ প্ৰথম কাহিনীটি আছে অক্ষত (১৭১০)।

পূবজন্মে বোধিসত্ত্ব বাবাণসীৰ উপকণ্ঠে এক মহাকপিকপে জন্মগ্ৰহণ কৰেন। ক্ৰমে তিনি হন সেই অঞ্চলেৰ বানববাজ্যেৰ প্ৰধান। তাৰ অধীনে তখন ছিল আশি সহস্ৰ বানব। বাবাণসীৰ দক্ষিণে গঙ্গাতীৰে ছিল একটি অতি বিশাল আশ্ৰমবৃক্ষ। সে বৃক্ষে ফল হত যেমন অস্বাভাবিক বৰমেৰ বড়, তাৰ স্বাদও ছিল তেমনি অতুলনীয়। গঙ্গাতীৰে এক বিজন অবণ্যেৰ একান্তে এই ফলবান বৃক্ষটিৰ সন্ধান পায় নি নিকটস্থ গ্ৰামেৰ মানুহ, তাই কপিৰাজ এই নিৰ্জন আশ্ৰমবৃক্ষটিতে সপাৰ্শদ বসবাস কৰতেন শান্তিপ্ৰিয় কপিৰাজ

মহাকপি জাতক এভাবেই মানব-সমাজকে এডিয়ে নিকপজৰে বানবকুলকে প্ৰতিপালন কৰতেন -তিনি বাবে বাবে অনুচৰদেৰ বলতেন, যেন এই গোপন

সংবাদটি নিকটস্থ গ্ৰামে জানাজানি না হয়ে যায়। যেকসালেমেৰ মহামানবেৰ দ্বাদশ শিষ্যেৰ মধ্যে যেমন আশ্ৰম-গোপন কৰে ছিল যুদাস, বানববাজ্যেৰ অনুচৰদলে তেমনি লুকিয়ে ছিল এক বিশ্বাসঘাতক। শুধু তফাৎ এই যে, যুদাস একবাবই বিশ্বাসঘাতকতা কৰবাব সুযোগ পেয়েছিল, আৰ এই বিশ্বাসহস্তা প্ৰতি জন্মে বোধিসত্ত্বেৰ সঙ্গে জন্মগ্ৰহণ কৰেছে এই ধৰাধামে, আৰ প্ৰতিবাৰেই উপকাৰেৰ বিনিময়ে বোধিসত্ত্বেৰ সৰ্বনাশ কৰবাব চেষ্টা কৰেছে এবং প্ৰতি জন্মেই বোধিসত্ত্ব তাকে ক্ষমা কৰেছেন। শেষজন্মে বোধিসত্ত্ব যখন আবিৰ্ভূত হলেন শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধকপে, তখন সে-ও জন্মগ্ৰহণ কৰেছিল ঐ কপিলাবস্ত্ৰব বাজপ্ৰাসাদেই—সিদ্ধাৰ্থেৰ অনুজ^১ দেবদত্তকপে। কপিৰাজেৰ ভয় ছিল, সেই দেবদত্তেৰ মাধ্যমে যেন না জানাজানি হয়ে যায় এই আশ্ৰমবৃক্ষেৰ অস্তিত্বেৰ কথা।

(১) মতান্তরে, দেবদত্ত ছিলেন যশোধৰাৰ ভ্ৰাতৃ।

ঘটনাচক্রে কোন একটি বানরের হস্তচ্যুত একটি আম গজাজলে পড়ে যায়, এবং সকলের অলক্ষ্যে সেটি শ্রোতের টানে ভেসে যায় উত্তর দিকে—বারাণসীর দিকে। কোন একটি ধীবরের জালে সেই ফলটি আটকে যায়। ধীবর সেই দুর্লভদর্শন ফলটি নিয়ে যায় কাশীরাজের দরবারে—সসম্মানে উপহার দেয় বারাণসীরাজকে। মহারাজ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি অনুচরদের ডেকে বললেন, এই ফলবান বৃক্ষটির অবস্থার খুঁজে বার করতেই হবে। সসৈন্য কাশীরাজ গজাতীর ধরে দক্ষিণাভিমুখে চলতে থাকেন; গজাশ্রোতে যখন ভেসে এসেছে এ ফল, তখন নিশ্চয়ই গজাতীরে আছে এই বৃক্ষটি। অবশেষে সত্যিই তিনি একসময় আবিষ্কার করে ফেলেন সেই রসাল বৃক্ষটিকে। বানর-সমাকীর্ণ সেই বৃক্ষটিকে দেখে মহারাজের দ্রুত ক্রোধ হল, তিনি তীরন্দাজ বাহিনীকে আদেশ করলেন, কপিকুলের হাত থেকে বৃক্ষটি মুক্ত করতে। অসংখ্য সৈন্য মুহূর্তমধ্যে গাছটি ঘিরে ফেলে; সপাষন্দ্ কপিবাঙ বৃক্ষে বন্দী হয়ে পড়েন; গাছ থেকে নেমে যে পালাবেন, তারও পথ রইল না।

বানর-দেবদত্ত দেখে এই সুযোগ; সে অগ্ৰাণু বানরদের বলে—বানবরাজের জগুই এ বিপদ। এস, আমরা আমাদের রাজাকে বন্দী করে কাশীরাজের কাছে সমর্পণ করি। তাহলে তিনি আমাদের ছেড়ে দিতে পারেন।

কিন্তু বোধিসত্ত্বের প্রতি বিশ্বস্ত অগ্ৰাণু বানব প্রত্যাখ্যান করে এ ঘৃণিত প্রস্তাব। বোধিসত্ত্ব বানররাজ তখন মিরুপায় হয়ে নিজ অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিতে বাধ্য হলেন। নিজ দেহ বিস্তারিত করে তিনি গজার অপর তীরের একটি বৃক্ষকে হাত দিয়ে ধরেন—তার বিশাল দেহ এ-ভাবে লছ'মণঝুলার সেতুর মত গজাব দুই প্রান্তে যোগসূত্র রচনা করল। বোধিসত্ত্ব বলেন আমাব এই দেহ-সেতুর উপর দিয়ে তোমরা গজার অপর পারে পলায়ন কর। আদেশমাত্র দলে দলে বানরকুল ঐ পথে গজার পরপারে পলায়ন করতে থাকে। বিস্মিত কাশীরাজ তীরন্দাজদের নিরস্ত করেন—বৃক্ষটিকে বানরশৃঙ্খল করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; তাছাড়া, তিনি এই অদ্ভুত ও অলৌকিক কাণ্ডের শেষ দেখতে কৌতূহলী হয়ে পড়েন।

একে একে আশি সহস্র বানর বিপন্নুক্ত হবার পর সর্বশেষে এগিয়ে আসে দেবদত্ত। সে-ও নিরাপদে ওপারে অতিক্রান্ত হয়; কিন্তু দেহ-সেতু থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে উল্লঙ্ঘনের সময় সেই বিশ্বাসঘাতক প্রবল পদাঘাতে বোধিসত্ত্বের মেরুদণ্ডের অস্থি স্থানচ্যুত করে দিয়ে যায়।

আশি সহস্র বানরের দেহভাবে ক্রান্ততনু বোধিসত্ত্ব এ পদাঘাত সহ্য করতে পাবলেন না—সশব্দে পতিত হলেন গজাগর্ভে। কাশীরাজ এতক্ষণ সমস্ত নাটকটি দেখছিলেন। তাঁর আদেশে রাজানুচরবা গজাগর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনে বোধিসত্ত্বের মৃদু দেহটি।

মহারাজ এতক্ষণে অনুধাবন করেন, এ সামান্য বানর নন—এ কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা। সসম্মানে তিনি বলেন—আপনি যখন এত অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তখন আমাব সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধদান করলেন না কেন?

বোধিসত্ত্ব বলেন—প্রাণি-হত্যার জন্তু এ ক্ষমতা প্রয়োগ করি না আমি—আর্তের ত্রাণেব জন্তুই শুধু অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবহার করি।

—কিন্তু আপনি যাদের উপকার করলেন, তাদেরই একজন তো আপনাকে বধের উদ্দেশ্যে পদাঘাত কবে গেল।

বানবরাজ স্মিতহাস্যে বলেন—তাই তো এ দুনিয়ার নিয়ম কাশীশ্বর। আমার এ আশি সহস্র অনুচর নিয়ে যদি নিত্য বাবাগমীধামে আহাৰ্য সংগ্রহে যেতাম, তাহলে উপদ্রুত হত সেই শাস্ত্র জনপদ। তাই নিজনে এদের ক্ষুন্নিবৃত্তির আয়োজন কবেছিলাম আমি। আমার সে উপকারের প্রতিদানে মহাধার্মিক স্বয়ং কাশীবাজ কি আমাকে বধ করতে উদ্যত হন ন? দেবদত্ত তো সামান্য বানব।

লজ্জায় অধোবদন হলেন কাশীবাজ জোড়হস্তে বলেন—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন—আপনাকে সম্মানে আমার রাজসভায় অধিষ্ঠিত করতে চাই।

বানবরাজ বলেন—তা যে হবার নয় কাশীবাজ। আমার ভবলীলা শেষ হয়েচে লগ্ন মেবদণ্ড নিয়ে আমি জীবিত থাকতে চাই না। বিদায় দিন আমাকে।

সাঞ্চলোচনে কাশীবাজ বললেন—আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি শাপভ্রষ্ট কোন দেবতা আপনি নিশ্চয়ই কোন সন্ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন এ ধবাধামে। অন্তঃপ্রবৃত্তি কবে আমাকে সেই সন্ধর্মের মমকথা বলে যান, যাতে আপনার আবদ্ধ কাজ আমি কিছুটা অগ্রসর কবে দিতে পারি।

বোধিসত্ত্ব বলেন—এ অতি শুভ প্রস্তাব। আপনি অবধান করুন ধর্মের মূলকথা আপনাকে জ্ঞাপন কবে আমি দেহত্যাগ করব।

অতঃপর অহিংসা-ধর্মের মূলকথা বর্ণনাস্থে বানবরাজ বোধিসত্ত্ব তাঁর মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন।

জাতকের এই কাহিনীটিকে অজন্তার শিল্পী রূপায়িত করেছেন এই প্রাচীরে (১৭।১০)। দেখছি, কাশীবাজ সসৈন্যে আত্মবৃক্ষের সন্ধানে নিগত হয়েছেন গঙ্গাতীরে, সেন্যদলের হাতে তীব, বনুক, তববারি, ভল্ল প্রভৃতি আয়ুধ একেবারে উপরে দেখছি, গঙ্গার দুই তীরে দুটি বৃক্ষ যথাক্রমে হাত ও পা দিয়ে আকড়ে ধবে বানবরাজ দেহ-সেতু বচনা কবেছেন—ভীতব্রন্ত বানরকুল অতিক্রম কবে যাচ্ছে সেই সেতু। দেখছি, পরের প্যানেলে আহত বানবরাজের দেহ চারজন বাহক নিয়ে অসেছে রাজসকাশে। শেষ প্যানেলে দেখা যাচ্ছে, বানবরাজ ধমচক্রমুদ্রায় কাশীরাজকে উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি, সাঁচির পশ্চিম তোবণের দক্ষিণ-স্তম্ভের শীর্ষপীঠ বা আবাকসের ঠিক নীচেই এই জাতক-কাহিনী অবলম্বনে একটি ভাস্কর্য আছে। অজন্তার চিত্রের সঙ্গে সেই ভাস্কর্য-নিদর্শনের পারিকল্পনাগত সাদৃশ্য লক্ষণীয়। সাঁচির ভাস্কর্যই বয়সে প্রাচীনতর। মনে হয়, অজন্তার শিল্পী সাঁচি দর্শন কবে এসে এই প্যানেলটি রূপায়িত করেন।

এই প্রাচীরের অপর অংশে ষড়দন্ত-জাতকের একটি কাহিনী-চিত্র আছে। চিত্রের

নীচের অংশ অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে, উর্বাংশের খানিকটা আজও দেখতে পাওয়া যায় (১৬।১১)। ষড়দন্ত-জাতক কাহিনীটি দশম গুহার অবলুপ্ত চিত্রাবলী বর্ণনা করার সময়েই বলেছি (পৃষ্ঠা ১০০)। এখানে চিত্রে দেখছি নীচে একটি পদ্মবনের আভাস। এ অংশটি

প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্ত—হুঁ একটি পদ্মফুল ও পদ্মপাতা দেখতে পাওয়া
ষড়দন্ত-জাতক

যাচ্ছে। গজরাজের উৎকৃষ্ট গুণের প্রান্তভাগও দেখা যাচ্ছে। উপরে দক্ষিণাংশে দেখছি, কাশীরাজের যুগয়াধিপতি শরসন্ধান করছে...দেখছি, বিশালকায় শ্বেতবর্ণের গজরাজ নিজ গুণে আলিঙ্গন করে গজদন্ত বিচূর্ণ করছেন। যুগয়াধিপতিকে পর পর চারবার আঁকা হয়েছে। প্রথমবার সে শরসন্ধানরত, দ্বিতীয়বার সে গজদন্ত-কাঁধে ফিরে যাচ্ছে—কিন্তু তার দৃষ্টি গমনপথের বিপরীত দিকে, সে যেন ফিরে ফিরে দেখছে। তৃতীয়বার দেখছি, যুগয়াধিপতি ফিরে এসে গজরাজের চরণপ্রান্তে প্রণাম করছে; চতুর্থ চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে, সে এসে উপস্থিত হয়েছে স্তম্ভশোভিত এক মণ্ডপের সম্মুখে। অর্থাৎ এই চতুর্থ আলেখা আমরা দৃশ্যান্তরে এসে পড়ছি। দুই দৃশ্যের মাঝখানে রয়েছে মণ্ডপের একটি শোভাস্তম্ভের যতি-চিহ্ন। মণ্ডপের ভিতরে দৃশ্যান্তরে দেখছি, অনুচর একটি স্বর্ণ-খালিকায় গজদন্ত নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে রাজা-রানীর সম্মুখে।

কাশীবাজ ও রানী বসে আছেন একটি অনুচ্চ পালঙ্কে। রাজার পিছনে নকশা-কাটা উপাধান। চিত্র দেখা যাচ্ছে, গজদন্ত দেখে রানীর পূর্ব-অভিজ্ঞান ফিরে এসেছে—তিনি মূর্ছাতুরা। কাশীরাজ পতনোন্মুখ রানীর দেহবল্লরীকে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছেন। মণ্ডপে আরও আটজন নরনাবীর আলেখা—সকলেই ভীত চকিত সন্ত্রস্ত।

এই খণ্ডদৃশ্যটির সঙ্গে দশম গুহার অঙ্কিত অধুনা অবলুপ্ত চিত্রটির (চিত্র—৪০) বিষয়-বস্তু অভিন্ন—কিন্তু দুটি চিত্রের পরিকল্পনায় যথেষ্ট প্রভেদ আছে। সেখানে রানী উপবিষ্টা—তিনি মর্গাহতা মাত্র, তখনও তিনি মূর্ছাহতা হন নি। এখানে দেখছি, তাঁর দেহভার রক্ষা করছেন কাশীরাজ—বানী পতনোন্মুখ। বনং এই চিত্রটির সঙ্গে পরিকল্পনার দিক থেকে অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় ষোড়শ বিহারে অঙ্কিত জনপদ-কলাগীর মৃত্যুদৃশ্যের সঙ্গে (চিত্র—৫৯)। এছাড়া, এই বিহারেরই অলিন্দে বিশ্বাস্তর ও মাদ্রীর যে যুগলচিত্রটি আছে (১৭।৩), তাব সঙ্গে রাজা-রানীর বসবার ভঙ্গি, পরিষদের ভীতচকিত দৃষ্টি এবং মণ্ডপের বহিরঙ্গের পরিকল্পনায় আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রস্থিত দ্বারের অপর পার্শ্বে ছিল যুগ-জাতকের একটি কাহিনী (১৭।১১)। এটিও প্রায় নষ্ট হয়ে এসেছে—আভাসমাত্র দেখা যায়। একটি যুগয়ার দৃশ্য—রাজা বোধিসত্ত্ব যুগকে বন্দী করেছেন। পূর্বদিকের প্রাচীর-গাত্রে একটি অধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টারে (১৭।১৩) দেখছি প্রসাধনরতা রাজকন্যার আলেখা (চিত্র—৬৩)। এক পার্শ্বে চামরবাদিনী অপর পার্শ্বে একজন কিঙ্করী প্রসাধন সামগ্রী নিয়ে প্রতীক্ষা করছে। ‘প্রসাধনরতা রাজকন্যা’ নামে এ চিত্রটি বিখ্যাত এবং ইতিপূর্বে ‘সাদৃশ্য’ প্রসঙ্গে এই রাজকন্যার দক্ষিণচরণের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

রাজকন্যার বামহস্তে দর্পণ এবং দক্ষিণকবে কোন প্রসাধন সামগ্রী। গাইডকে বলবেন, বাতি চিত্রের নীচে ধবে দেখিয়ে দেবে রাজকন্যার শতনরীর মুক্তাদানা কেমন অদ্ভুতভাবে চিত্রের সমতল থেকে উঁচু হয়ে আছে। অনাদৃত এ পর্বতগুহায় ঐ ছোট্ট বড়ের বিন্দুগুণী কেমন করে যে আজও টিকে আছে, ঝবে পড়ে নি, ভাবলে অবাক হতে হয়।



চিত্র- ৬৩

প্রসাধনবতা বাজকন্যা

অবস্থান- ১৭।১৩

এর পবেব প্যানেলটি বৃহদাযতন—সিংহল-অবদান জাতক (১৭।১৩)। কাহিনীও দীর্ঘ তার রূপায়ণও বিস্তৃত অংশ জুড়ে। কেন্দ্রস্থ মণ্ডপের সম্পূর্ণ পূর্বপ্রাচীর জুড়ে ছবিব পরে ছবি। এই চিত্র-নাটকের বস আহবণেও সেই দুটি বাধা, প্রথমতঃ, জাতক-বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে দর্শকের অপবিচয়, আব দ্বিতীয়তঃ, চিত্র-কাহিনীর বিস্তার কোন সুসংবদ্ধ

আইন মেনে চলে নি। অথবা মেনে চললেও আমরা সে-বিষয়ে অবহিত নই। তাই কয়েকশ' চরিত্রের ভীড়ে আমরা বারে বারে চিত্র-কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলি। সর্ব-প্রথমেই তাই কাহিনীটি জেনে নেবার চেষ্টা করা যাক :

জম্বুদ্বীপে সিংহকল্প মহাজনপদে মহারাজ সিংহকেশরীর রাজত্বে রাস করতেন একজন ধনী বণিক সিংহক। তাঁর একটি পুত্রসন্তান হল; সিংহক নবজাতকের নাম রাখলেন সিংহল। শিশু সিংহল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, নানা বিদ্যায় সে অচিরে পারদর্শী হয়ে উঠল। পুত্রের বিবাহ দিতে চাইলেন পিতা—কিন্তু সিংহলের ইচ্ছা, সে প্রথমে বাণিজ্য-

যাত্রায় যাবে। বণিকপুত্র অন্ততঃ একবার সমুদ্রযাত্রা না করে সিংহল-অবদান জাতক কি ঘর-সংসারে মন দিতে পারে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিংহককে অনুমতি দিতে হল। নানা পণ্যে বাণিজ্যাতবী সাজিয়ে সিংহল মধুকব ডিঙায় রওনা হয়ে পড়ল—দূর দেশের সন্ধানে, সমুদ্রপথে।

নানা দেশে বাণিজ্যেব লেন-দেন কবে লাভবান হল বণিক। দেশ-বিদেশের বাণিজ্যসম্পদে পূর্ণ হল পণ্যপোত। স্বদেশে পত্ন্যাবর্তনের পথে একটি অ-পূর্বজাত দ্বীপে অবতরণ কবল বণিক সম্প্রদায়। দ্বীপটির নাম তাম্রদ্বীপ—ইতিপূর্বে জম্বুদ্বীপের বণিক কখনও আসে নি এ দ্বীপে। নারিকেল-ছাওয়া সমুদ্রমেখলা এই দ্বীপে কোন পুরুষ-মানুষ নেই। বণিকদল সবিস্ময়ে লক্ষ্য কবে দেখে—এ এক প্রমীলারাজা! অপূর্ব-সুন্দর নারীর দল স্বাগত সম্ভাষণ জানাল ওদের সুস্থিত বিস্মিত বণিকের দল সে নারী-রাজ্যে আতিথ্য গ্রহণ করল। এক-একজন গৃহস্থামিনীর ভবনে স্থান লাভ করল এক-একজন বণিক। শুধু সুখাচ্ছ ও সুপেয়ই নয়, দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্ত এই নাবিকদের শয্যা-সজ্জিনী হতেও বাধা নেই তাদের—এ-ও যে আতিথ্য ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায় জম্বুদ্বীপের বণিকদল।

শুধু কি জানি, কোন অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সচেতন হয়ে ওঠে সিংহল। কিসের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে যেন অস্থিতি অনুভব করতে থাকে ক্রমাগত। দলপতি সিংহলকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিজ প্রাসাদে নিয়ে এসেছিল তাম্রদ্বীপের অনিন্দ্যকান্তি রাজকুমারী স্বয়ং। মণি-দীপিত প্রমোদ-কক্ষে আহার-পানীয়-বাসনে আয়োজনের কোন ত্রুটি নেই; লাস্ত্রময়ী নর্তকীর দল, বাজ্যন্তরীর দল বণিক-পুত্রের আনন্দদানে কার্পণ্য করে না—স্বয়ং রাজকুমারী তার যৌবনোদ্ধত রূপের পসরা সাজিয়ে ইঙ্গিত করে বারে বারে; কিন্তু বণিক-পুত্রের হৃদয়ে কেমন যেন সাড়া জাগে না। তার কেবলই মনে হয়—এ কেমন রাজ্য? পুরুষমানুষ এখানে একেবারেই নেই কেন? কেমন করে তাহলে এরা প্রজননের পথে জনসংখ্যা বজায় রাখে? রাজ্যে একটিও অনুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ল না কেন? সমস্ত আয়োজন এত কৃত্রিম মনে হচ্ছে কেন? জম্বুদ্বীপের এতাবৎ কালের বণিককুল এই লোভনীয় দ্বীপটিকে সমুদ্রে এড়িয়ে গেছেন কেন? কেন-কেন-কেন? রাজকুমারীর মদন-

মন্দিরে পূজারতির সমস্ত আয়োজনের উপরে ক্রমাগত প্রশ্নবোধক চিহ্নের বৃষ্টিতে বণিক-পুত্র মুগ্ধ হল যতটা, সতর্ক হল তার চতুর্গুণ।

আর এই সর্কর্তাই রক্ষা করল তাকে—একমাত্র তাকেই। পাঁচশ, অনুচরকে হারিয়ে রিক্ত বণিক একেবারে একাই ফিরে আসতে পেরেছিল সেই তাম্রদ্বীপ থেকে।

তাম্রদ্বীপের অধিবাসিনীরা বস্তুতঃ বান্ধবী—মোহময়ী নারীর রূপ ধরে তারা বণিকদের নিয়ে যেত স্বর্গহে। রাত্রে তাদের হত্যা কবে নরমাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি করত। তাম্রদ্বীপ-বাসিনী রাজকুমারীকে ত্যাগ করে কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এল সিংহল নিজদেশে। কুহকময়ী রাজকুমারী কিন্তু তবু তার আশা ছাড়ে না। সন্তোষবিবাহিতা এক নারীর রূপ ধরে পথে-পাওয়া একটি শিশুপুত্র-ক্রোড়ে সে এসে উপনীত হল সিংহকল্প মহাজনপদে। সিংহলের পিতার কাছে সে আবেদন জানায় যে, সিংহল তাকে বিবাহ করেছে, তার পুত্রসন্তানও হয়েছে; কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পথে ঝড় হওয়ায়, অমঙ্গলময়ী-জ্ঞানে তাকে ত্যাগ করে এসেছে। এই অসহায়া নারীর করুণ আবেদনে সিংহক পুত্রকে ডেকে আদেশ করলেন তাকে গ্রহণ করতে; কিন্তু সিংহল যখন সমস্ত গোপন কথা বাক্ত কবে দিল, তখন ঐ ছদ্মবেশী বান্ধবীকে তিনি গৃহ থেকে দূর কবে দিলেন। সর্বোদনে বান্ধবী এসে আবেদন করল রাজদরবারে। এখানেও মহাবাজ সিংহকেশবী মুগ্ধ হলেন তার করুণ কাহিনী শুনে; ডেকে পাঠালেন বণিক-তনয়কে। এবাবও সিংহল বাক্ত কবল তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা, কিন্তু মহাবাজ সিংহকেশবী বিশ্বাস কবলেন না তার কথা। প্রত্যাখ্যাতা ছদ্মবেশিনী সুন্দরীকে স্থান দিলেন নিজ রাজ-অন্তঃপুবে।

সেই রাত্রে বান্ধবী হত্যা করল রাজাকে। আব সেই বাত্রেই আকাশপথে তাম্রদ্বীপ থেকে উড়ে এসেছিল বান্ধবী রাজকুমারীর শত সহচরী। দুর্গদ্বার খুলে দিল দুর্গান্তর-বাসিনী রাজকন্যা; সমস্ত রাত্রিব্যাপী হত্যার উৎসব চলল রাজ-অন্তঃপুবে।

পরদিন সকালে সংবাদ পেয়ে সিংহল আক্রমণ করল সে দুর্গ। যুদ্ধ হল সিংহলের অনুচরদলের সঙ্গে বান্ধবীদের। শেষ পর্যন্ত পরাজিত বান্ধবীদের আকাশপথে পলায়ন করল তাম্রদ্বীপে।

শোকসন্তপ্ত সিংহকল্প অধিবাসীরা তখন সিংহলকেই তাদের অধিপতি কবতে চাইল। বণিক-পুত্র সিংহল বললে—সে শাসনদণ্ড গ্রহণ করতে অসম্মত নয়, কিন্তু একটি শর্ত আছে। সিংহকল্প অধিবাসীরা সানন্দে জানায় তাবা সিংহলের আরোপিত সকল শর্তই মেনে নিতে রাজী। তখন সিংহল বলে—তাম্রদ্বীপবাসিনী বান্ধবীদের উপর প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে সিংহাসনে বসতে রাজী নয়। যদি সিংহকল্প অধিবাসীরা তার সঙ্গে তাম্রদ্বীপে যুদ্ধযাত্রা করতে সম্মত হয়, তবেই সে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সম্মত।

তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল ওরা। বিরাতাকার অর্ধবপোতে সৈন্যদলকে সাজানো হল। সিংহল স্বয়ং নেতৃত্ব গ্রহণ করে সে অভিযানে। সন্ধ্যাবেলা সিংহল এল তাম্রদ্বীপে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হল দুই পক্ষে; কিন্তু অমিতবিক্রম সিংহলের শৌর্যবীর্যের কাছে নিঃশেষে

পরাজিত হল রাক্ষসীকুল। সিংহল হলেন ‘বিজয়-সিংহল’। রাক্ষসীদের বিতাড়িত করে তাম্রদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করল আর্য জম্বুদ্বীপবাসীরা। দ্বীপের নূতন নামকরণ করা হল ‘সিংহল’। মহা আড়ম্বরে অভিষেক-উৎসব উৎযাপিত হল বিজয়-সিংহলের।

বিস্তৃত পূর্বপ্রাচীর জুড়ে এই কাহিনীটিকে রূপায়িত করেছেন শিল্পী। প্রথমেই দেখাছি সিংহলের প্রথম সমুদ্রযাত্রায় বাণিজ্যতরী জলমগ্ন হচ্ছে (১৭।১৪-ক)। বিষয়-বস্তু ও কম্পোজিশনের দিক থেকে এই খণ্ডচিত্রটি পূর্ণ-অবদান জাতকের নৌকাডুবি দৃশ্যের সঙ্গে তুলনীয়। আমার তো মনে হল, পূর্ণ-অবদান দৃশ্যটিতেই উন্নততর শিল্পশৈলী বিদ্যমান। সেই শ্রেণীগত ছান্দ্যাসিক কম্পোজিশনে চৈনিক প্রভাব লক্ষ্য করেছিলাম—এখানে নৌকাডুবির চিত্রটি আরও বাস্তব, কিন্তু এতে যেন বীভৎসবসেব বাহুল্য। বোধ করি সম্পূর্ণ কাহিনীটির বীভৎস ও রুদ্র রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়েই শিল্পী এভাবে রূপায়িত করেছেন এই দৃশ্যটি। দেখাছি, অনেক নাবিক জলে পড়ে গেছে, অনেক মৃত্যু-ভয়াতুর। এখানে বড় খুব ফিকে হয়ে গেছে... পরের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, তাম্রদ্বীপের প্রমীলারাজে নাবিকবা আতিথ্য গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি তিনটি অলিন্দে মিথুন-মূর্তি। একটি নাবিককে চষকপূর্ণ সুরা এগিয়ে দিচ্ছে একটি আল্লেশশয়না নারী, আর একটিতে একটি যুবতী সঙ্গীত পবিত্রবেশন করছে। একটি তাবু-জাতীয় কক্ষে পুনরায় দুটি মিথুন-চিত্র। প্রত্যেকটি দৃশ্যেই রাক্ষসীদের আঁকা হয়েছে লাস্ত্রময়ী সুন্দরী নারীর বেশে। পিছনে কিন্তু এই মিলনমধুর দৃশ্যগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য। সেখানে দেখাছি, রাক্ষসীরা নাবিকদের হত্যা করে নরমাংস ভক্ষণ করছে, রক্ত পান করছে। সেখানে শিল্পী তাদের ঐক্যেছেন ভয়ঙ্করী রাক্ষসীর বেশে (১৭।১৪-খ)।

এখানে একটি শ্বেতবর্ণের অশ্বকে দেখা যাচ্ছে। বস্তুতঃ, জাতকমতে, সিংহলেব উদ্ধারের মূলে ছিলেন একজন শ্বেতবর্ণের পাক্ষরাজ অশ্ব—তিনি বোধিসত্ত্ব। চিত্র দেখাছি, অশ্বরাজের পিঠে সিংহল ফিরে এসেছে সিংহকল্প জনপদে। অশ্ব থেকে অবতরণ করে সে উপকারী অশ্বরাজকে নতজানু হয়ে প্রণাম করছে (১৭।১৪-গ)।

এই দৃশ্যের দক্ষিণে দেখা যাচ্ছে, রাজা সিংহকেশবীর দরবার-দৃশ্য (১৭।২৪-ঘ)। এই অবলুপ্তপ্রায় চিত্রটির একটি প্রতিলিপি ডাঃ ইয়াজদানোব গ্রন্থেব তৃতীয় খণ্ডে আছে।

চিত্রকর সেখানে অবলুপ্তপ্রায় চিত্রটির সত্যসমাপ্ত অবস্থায় কী রূপ ছিল, তাই কল্পনায় অনুমান করে ঐক্যেছেন। সেটি একটি অপূর্ব চিত্র। রাজার সম্মুখে বুদ্ধ মন্ত্রী যষ্টিতে ভব দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি চিন্তামগ্ন। রাজার বামে একটি অলিন্দ, তারপর সোপান-শ্রেণীর নীচে দাঁড়িয়ে আছে সিংহল। তাব দৃষ্টি ত্রুটিকুটিল। সে বলছে এই রমণী তাব স্ত্রী নয়—এ রাক্ষসী। সিংহলের বামে রাজকন্যা একটি শিশুকে হাত ধরে নিয়ে এসেছে। রাজকন্যার চিত্রটি অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ঐক্যেছেন শিল্পী—যেন বিম্বাদের লক্ষ্মীপ্রতিমা। অলিন্দে পাঁচটি পুরকামিনী—রাজাদেশে তারা নানাজাতীয় গন্ধদ্রব্য নবাগত অস্ত্রপুর্-চারিণীকে বরণ করতে এগিয়ে আসছে। দেখাছি, একটি বামন প্রসাধন দ্রব্য মাথায় কবে

চলেছে। রাজার পশ্চাতে বাতায়নবর্তিনী দুটি নারী-চিত্র। দুটিই অপূর্ব সুন্দরী—কিন্তু তারা যেন এই নবাগতাকে খুশিমনে বরণ করতে ইচ্ছুক নয়। বোধ করি, ওরা সিংহ কেশরীর অপরা মহিষী। বাস্তবে এ চিত্রটি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

এই রাজসভার দৃশ্যের ঠিক বামে, অর্থাৎ ১৪-গ ও ১৪-ঘ'র অন্তর্বর্তী স্থানে দেখছি নবাগতা রাজকন্যাকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে অভিষেক-স্নান করানো হচ্ছে। রাজকন্যা একটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের উপর দণ্ডায়মানা, একজন কিস্কবী তার মাথায় গন্ধবারি ঢালছে। আরও কয়েকজন নানান গন্ধ ও প্রসাধন দ্রব্য নিয়ে এসেছে। এখানে একটি শিল্প-চাতুর্ঘ লক্ষণীয়। বাজবুমারীর এই বমণী-রূপটি ছদ্মবেশ, এ তার বাস্তব আকৃতি নয়—তাই শিল্পী যেন এই নারীমূর্তিটিকে ভাবহীন করে এঁকেছেন—যেন সে বক্তৃতা-মাংসের ওজন-সম্পন্ন নারী নয়—অপাখিব এক মোহময়ী সত্তা। তাই অনায়াসে সে দাঁড়িয়ে আছে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর—পদ্ম পদদলিত হচ্ছে না তার দেহভারে। ইটালিয়ান চিত্রশিল্পী বন্ডিচেল্লি যদি আরও হাজারখানেক বছর আগে জন্মাতেন, তাহলে মনে করা যেত যে, অজস্রাশিল্পী বন্ডিচেল্লি-অনুকরণে এ চিত্রটি এঁকেছেন!

কাহিনীর পাবম্পর্ষ অনুসারে এব পর্ববর্তী দৃশ্যটি অনেকটা দূবে ঝাঁকা (১৭।১৪-৬)। এ ঘটনা সেইদিন রাত্রেব। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, দুটি নগর-তোরণের মাঝখানে দুর্গের প্রবেশ-পথ। বামদিকে ত্রিতলে মহাবাজ সিংহকেশবীকে হত্যা করেছে তাম্রদ্বীপবাসিনী রাক্ষসী। এখানকার চিত্রগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু দ্বিতলে যে ধ্বংসলীলা চলেছে, তা এখনও স্পষ্ট দেখা যায়। পাশাপাশি তিনটি গবাক্ষ। প্রত্যেকটিতেই একটি করে রাক্ষসী ও তিন-চাবটি জম্বুদ্বীপবাসী। মহানন্দে রাজান্তঃপুরবাসী নরনারীকে হত্যা করে রাক্ষসীরা আহাব কবছে। শিল্পী এই বক্তৃক্ষয়ী দৃশ্যে পশ্চাৎপটের আকাশকে এঁকেছেন গাঢ় লাল বঙে। অজস্রার অন্য কোথাও এত গাঢ় লাল বঙের পশ্চাৎপট দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

...নীচে দেখা যাচ্ছে রাত্রি প্রভাতেব দৃশ্য। কন্ধদ্বার দুর্গের তোরণে মই লাগিয়ে উঠে আসছে সিংহল...দেখছি, একতলাব ছাদে মুক্ত রূপাণহাতে সে আক্রমণ করেছে রাক্ষসীদের...রাক্ষসীরা শূন্যে উঠে গেছে, তাদের হাতে নরমাংসের টুকরো।...তোরণের উপরে একটি শকুন...দুর্গ-চত্বরের মাঝখানেও একটি মাংসভুক পাখী মহানন্দে আহার করছে।...অল্প কয়েকটি কালো রঙের বেখার টানে শিল্পী যেভাবে কয়েকটি উড়ন্ত কাকের চিত্র এঁকেছেন, তা দেখে মনে পড়ে জয়মূল আবেদীন অথবা গোপাল ঘোষের ঝাঁকা ছবি।

...নীচে দেখা যাচ্ছে শূন্য সিংহাসন।

পরবর্তী ঘটনার জন্ম আবার চলে যেতে হবে ও-প্রান্তে; চিত্র গ-ঘ-এর নিম্নাংশে। দুটি গর্ভগৃহের অভ্যন্তরস্থ বৃহৎ প্যানেলে সিংহলের দ্বিতীয়বারের সমুদ্রযাত্রা ও সিংহল-বিজয়-কাহিনী (১৭।১৪-৮)।

চিত্রটির পাঁচটি অংশ। প্রথম, সিংহকল্প রাজপ্রাসাদ থেকে বিজয়সিংহলের সদলবলে স্থলপথে যাত্রা। দ্বিতীয়, সিংহলদ্বীপে নৌকাযোগে অবতরণ। তৃতীয়, যুদ্ধদৃশ্য। চতুর্থ,

রাক্ষসীদের পরাজয় ও আত্ম-সমর্পণ, এবং পঞ্চম বিজয়ী বিজয়সিংহলের অভিষেক। এই পাঁচটি দৃশ্যের স্থান-কাল বিভিন্ন—কিন্তু শিল্পী কোন যতি-চিহ্নের ব্যবহারে দৃশ্যগুলি বিচ্ছিন্ন করেন নি। এই পঞ্চ দৃশ্যের শেষ অঙ্কটির কম্পোজিসন একটি মালার আকারে গড়েছেন তিনি। যেন শেষ অঙ্কের একটি মালা তিনি পরিয়ে দিতে চান বিজয়ী সিংহলের কণ্ঠে। মেঘে মেঘে যেমন মিলে যায়, স্বপ্নে স্বপ্নে যেমন মিলে যায়, অথবা আধুনিক চলচ্চিত্রে ডিজল্ড-প্রয়োগ-পদ্ধতিতে যেমন এক দৃশ্য অপব দৃশ্যে নিঃশেষে মিশে যায়, এখানেও শিল্পী সেইভাবে এই পাঁচটি দৃশ্যকে মিশিয়ে দিয়েছেন মালার আকারে।

প্রথমে উপরে দেখছি (চিত্র—৬৫) একটি তোরণদ্বার অতিক্রম করে হস্তিপৃষ্ঠে বিজয়-অভিযানে যাত্রা করছে সিংহল। লক্ষণীয়, এবার প্রথম তার মাথায় মুকুট দেখছি। ছপাশে দুজন সমর-সচিব, কিন্তু তাদের হাতে রয়েছে চামর অর্থাৎ সিংহলের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে তারা। সিংহলের মাথার উপর রাজছত্র—তার দৃষ্টি কিন্তু ত্রিযক্ভঙ্গি—পূর্ববর্তী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম-দৃশ্যের কথা যেন সে ভুলতে পারছে না। সিংহলের শ্বেতহস্তী পার্শ্ববর্তী ধূসর বর্ণের হস্তীর শুঁড় নিজ শুণ্ডে আলিঙ্গনবদ্ধ করেছে—যেন তারাও আসন্ন সংগ্রামের পূর্বে প্রীতিসন্তোষণ বিনিময় করেছে...সঙ্গে চলেছে একদল পদাতিক সৈন্য, তাদের হাতে যুদ্ধ কুপাণ, ভল্ল ও দীর্ঘাকার ঢালিকা। পূর্বদৃশ্যের সঙ্গে এ দৃশ্যের বিভিন্নতা বোঝাতে প্রথমেই আঁকা হয়েছে নগর-তোরণদ্বার। এই সমরভিযান দৃশ্যের সঙ্গে বিধুরপণ্ডিত-জাতকের একটি দৃশ্যের (বিধুর ও পুণ্যকের ইন্দ্রপ্রস্থ ভাগ) সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় দৃশ্য এর নীচে—সৈন্যদল তাম্রদ্বীপে অবতরণ করছে। যদিও প্রচ্ছন্ন কোন যতি-চিহ্ন নেই, তবু পূর্বদৃশ্যের ফিগরগুলি থেকে একটু ফাঁক দিয়ে এ দৃশ্যের বিষয়-বস্তু আঁকা হয়েছে, যেন শূন্য স্থানটুকুই সেই যতি-চিহ্ন। দেখছি, তিনটি নৌকা। সম্মুখভাগে সেই তিনটি রণহস্তী, পিছনে অশ্বাবোহী ও পদাতিক বাহিনী। হস্তীর তুলনায় নৌকাগুলি ছোট সন্দেহ নেই।

তৃতীয় দৃশ্যে দেখছি, ছপাশে ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেছে। এ ঘটনা অবতরণের পর; কারণ, রাক্ষসীরা ও জম্বুদ্বীপবাসীরা তখন হাতাহাতি যুদ্ধ করছে।

কালানুক্রমিকভাবে চতুর্থ দৃশ্য একেবারে নীচে। সেখানে দেখছি রাক্ষসীরা যুদ্ধকরে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছে অথবা অস্ত্রত্যাগ করে দুই হাত ভূমিতে রেখেছে।

পঞ্চম ও শেষ দৃশ্য মালার আকারে সাজানো। কম্পোজিসনটির একেবারে অপব পারে। এ দৃশ্যটির পরিকল্পনার সময় শিল্পী একটি যতি-চিহ্নের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে উপলব্ধি করেছেন। কারণ, শুধু স্থান-কাল নয়, রুদ্র ও বীভৎস রস থেকে এবার অন্য রসের পরিবেশন করতে হবে তাঁকে। তাই রাক্ষসীপুরীর একসার তাঁবুর (অভিযানকারী সৈন্যদলের আগমন-সংবাদে যা সমুদ্রতীরে নির্মাণ করিয়েছিল রাক্ষসীরা) যতি-চিহ্ন এঁকে তার ওপারে চিত্রিত কবেছেন বিজয়সিংহলের অভিষেক দৃশ্যটি। সিংহল সিংহাসনে উপবিষ্ট।

পুৰবাসীরা গান গাইছে, বাজাচ্ছে, পুনকামিনীরা অভিষেক-বারিতে স্নান কবাচ্ছে বিজয়সিংহলকে (১৭।১৪-ছ)।

এব পৰ কয়েকটি বুদ্ধমৰ্ত্তিৰ আলোখ্য (১৭।১৫) এব তাবপৰ মহিষ-জাতকেৰ একটি ক্ষুদ্র কাহিনী (১৭।১৬)। বোধিসত্ত্ব সেৱাৰ এক ভীমকান্তি মহিষেৰ কাপে অবতীৰ্ণ। কিন্তু ককণাৰ অবতাৰ তিনি। যে অবণো তিনি বাস মহিষ জাতক কবতেন, সেখানেই থাকত একটি অৰাচীন বানৰ। সময়ে-অসময়ে সে বোধিসত্ত্ব-মহিষেৰ পিঠে চড়ে বসত—নানাভাবে উত্ৰাক্ত কবত তাঁকে। দয়াৰ অবতাৰ মহিষ কোন প্রতিবাদ কবতেন না। এইভাবে অত্যাচাবে বানৰটি এতই অভ্যস্ত হয়েছিল যে তাকেই দেখলে সে ছুটে আসত। একদিন বোধিসত্ত্বেৰ বদলে অন্য একটি আবণাক ম'শ্ব সেই অবণো বিচৰণ কৰছিল। অৰাচীন বানৰটি লক্ষ্য কৰে নি পৰিবৰ্তনটুকু— সে যথাবীতি মহিষেৰ পিঠেৰ উপৰ চড়ে বসে আঁচড়াতে থাকে।

বন্য মহিষ তৎক্ষণাৎ তাকে পিঠ থেকে ফেলে দেয় এব শিঙ দিয়ে তাৰ উদৰ ভেদ কৰো হত্যা কৰে বানৰটিকে। ছুটি চিত্ৰে এই ক্ষুদ্র কাহিনীটি এঁকেছেন অজ্ঞপ্তাৰ শিল্পী। নীচে দেখছি, দয়াৰ অবতাৰ বোধিসত্ত্ব-মহিষেৰ পিঠেৰ উপৰ উঠে বসেছে বানৰ, ছুহাতে মহিষেৰ দুই চোখ টিপে ধৰেছে। আৰ তাৰ উপৰেৰ দৃশ্যে দেখছি, বন্য মহিষ পদদলিত কবতে যাচ্ছে বানৰটিকে। জাতককাৰ তথা শিল্পীৰ বক্তব্য এই দুই দৃশ্যেৰ নাটকে সোচ্চাৰ। আহ সাৰ মন্ত্ৰে দীক্ষিত এই নিজন গুহাবাসী বৌদ্ধ শ্রমণদেৰ উপৰ কোনভাবে অত্যাচাৰ কৰলে তাৰা হয়তো প্রতিশোধ নেবেন না—কিন্তু যাঁৰ বিধানে চন্দ্র-সূৰ্য উঠছে, যাৰ অঙ্গুলিহেলনে এ গুহা-বিহাবেৰ সম্মুখস্থ স সাৰ-চক্ৰ ঘূৰে চলে অবাৰত গতিতে—তাৰ বিচাৰেৰ হাত থেকে উদ্ধাৰ পাবাৰ উপায় নেই।

একটা কথা ভেবে দেখাত হবে—এই মহিষ-জাতক কাহিনীৰ স্থান-নিৰ্বাচন। এটি সিংহল-অবদান জাতকেৰ ঠিক পৰেই আঁকা। সিংহল-অবদানেৰ বিশালায়তন প্যানেলটি শেষ কৰে কি বৌদ্ধ শিল্পীৰ মনে হয়েছিল, বেবী নিৰ্যাতনেৰ এ কাহিনীটি বৌদ্ধ ধৰ্মেৰ মূলকথা তো কই ব্যক্ত কৰছে না? মৃত্যুৰ বদলে মৃত্যু, হত্যাৰ বদলে হত্যা—এই কি বুদ্ধদেবেৰ বাণী? বুদ্ধদেব তো তা বলেন নি, বলেছেন—যে তোমাকে ভালবাসবে তাকে ভালবেস—যে তোমাৰ প্রতি শত্রুতা সাধন কৰবে তাকেও ভালবেস। তাই কি শিল্পী ঐ সিংহল-অবদান জাতকেৰ পৰে এই ক্ষুদ্র চিত্ৰটি এঁকে মনেৰ ভাব লাঘব কবতে চান?

উত্তৰ প্ৰাচীৰেৰ পূবপ্ৰান্তেও দুটি জাতক-কাহিনী। উপৰে শবভ-জাতক (১৭।১৭) এবং নীচে শ্যাম-জাতক (১৭।১৮)। শবভ জাতকেৰ চিত্ৰগুলি নষ্ট হয়ে গেছে—সে কাহিনী ফলে অবাস্তব। শ্যাম-জাতকেৰ কাহিনীটি সংক্ষেপে এইঃ কিশোৰ শ্যামেৰ পিতা ও মাতা দুজনেই অন্ধ। বনচাবী এই সঁসাবটিৰ সমস্ত দায়িত্ব ছিল কিশোৰ শ্যামেৰ

উপর। বনাস্তুর থেকে ফল সংগ্রহ করে আনা, পানীয় সংগ্রহ করে আনা --সব কাজই করতে হত শ্যামকে। একদিন কাশীরাজ ব্রহ্মদত্ত শিকার করতে এসে তাকে শরাহত কবেন। রাজা দশরথ শব্দভেদী নাগে অন্ধমুনির পুত্রকে বধ করেছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মদত্তের অপরাধ ততোধিক। রাজা দেখতে পেয়েছিলেন শ্যামকে --ভেবেছিলেন, এ নিশ্চয়ই দেবশিশু, এ অমর। সেই কোতূহল চরিতার্থ করতেই শরনিষ্ক্ষেপ করেছিলেন তিনি। যাই হোক, ফল সেই একই। শ্যাম মারা গেল। রাজা শ্যামকে নিয়ে এলেন অন্ধমুনির কাছে। এব পরের অংশটিতেও পার্থক্য আছে রামায়ণের কাহিনীর সঙ্গে। অযোধ্যা-বাজ দশরথকে শাপগ্রস্ত হতে হয়েছিল --কিন্তু কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে কোন শাপ দেন নি জাতক-বর্ণিত অন্ধমুনি। পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন মুনিবর। আরও একটি প্রভেদ আছে দুটি কাহিনীতে। রামায়ণকারের কাহিনীটিতে অজ্ঞান-কৃত পাপে দশরথ শাপগ্রস্ত, মুনিপুত্রও হত। কাহিনীটি ছিল পরিপূর্ণ বিয়োগান্তক। জাতক-বর্ণিত শ্যামের কাহিনীতে দেখছি, সজ্ঞান-কৃত পাপ-সত্ত্বেও ব্রহ্মদত্তকে ক্ষমা করা হয়েছে। আর দেখছি, কাহিনীব শেষে বোধিসত্ত্বের কৃপায় শ্যাম পুনর্জীবিত। এই কাহিনী অবলম্বনে সাঁচির পশ্চিম তোরণের উত্তর স্তম্ভে একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন আছে।

শ্যাম জাতকের নীচের অংশে আছে আবেকটি জাতক-কাহিনী। এটি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় আছে। এটির নাম মাতৃপোষক-জাতক (১৭।১৯)।

বোধিসত্ত্ব সেবার এক শ্বেতবর্ণের মহাগজরূপে হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁর পিতা ও মাতা উভয়েই অন্ধ। কিশোর শ্যামের মতোই তিনি অন্ধ পিতামাতার জন্ত বন-বনাস্তুর থেকে আহাৰ্য সংগ্রহ করে আনেন। পিতামাতার আহাৰ্য্যে ক্ষুধিবৃত্তি করেন। একদিন বোধিসত্ত্ব গজরাজ দেখতে পেলেন, একটি কাঠুরিয়া সেই গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। করুণার অবতার বোধিসত্ত্ব সেই কাঠুরিয়াকে পিঠে করে বনপ্রান্ত পর্যন্ত পৌছে দিয়ে এলেন। কাঠুরিয়া বারাগসীতে

উপস্থিত হয়ে শুনতে পেল যে, কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজহস্তীটি পূর্বরাতে মারা গেছে। সে বাজসকাশে উপনীত হয়ে বলল, অরণ্যে অভাস্তুরের অধিবাসী এক মহাকায় গজের সন্ধান সে দিতে পারে। বাজনির্দেশে সেই কৃতঘ্ন কাঠুরিয়া শিকারীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেই গভীর অরণ্যে। স্নকৌশলে শিকারীর দল শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে ফেলে বোধিসত্ত্ব গজরাজকে। করুণার অবতার বোধিসত্ত্ব কোন বাধা দিলেন না। গজরাজকে নিয়ে আসা হল রাজার হাতিশালে। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই হস্তিশালার রক্ষক এসে কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের কাছে নিবেদন করে, ধৃত হস্তী রাজবাটীতে আসার পর থেকে জলগ্রহণ করে নি--উপবাসে সে প্রাণ দিতে উচ্ছত। কাশীরাজ কোতূহলী হয়ে স্বয়ং এলেন হাতিশালে। সত্যই থরে থরে আহাৰ্য্য সাজানো আছে অথচ কণামাত্র গ্রহণ করছে না সেই অনিন্দ্যকাস্তি শ্বেতহস্তী। মহারাজের মনে হল, এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। তিনি অনুচরদের আদেশ দিলেন হস্তীর শৃঙ্খল

মোচন কৰে দিতে—এবং বন্ধনমুক্ত হস্তী কোথায় যায়, কি কৰে তাৰ সন্ধান বাখাৰ জন্তু দ্ৰুতগামী অশ্বাবোহীদেব নিযুক্ত কৰলেন। মুক্তিপ্ৰাপ্তিমাত্ৰ গজবাজ ফিৰে গেলেন নিজেৰ নিভৃত অবগ্যবাসে। সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন তাঁৰ অন্ধ পিতামাতা সাতদিন উপবাসে মৰণোন্মুখ। গজবাজ তৎক্ষণাৎ শুণ্ডে কৰে জল নিয়ে এসে তাঁদেৰ গজকুন্তে সিঞ্চন কৰলেন—আহার্য-পানীয়ে তাঁদেৰ সুস্থ কৰে তোলেন।

সংবাদ পোষ কাশীবাজ স্বয়ং এলেন মাতৃভক্ত বোধিসত্ত্বেৰ কাছে। বোধিসত্ত্বেৰ সঙ্গে তাঁৰ বন্ধুত্ব হল। মাতৃপোষক বোধিসত্ত্বেৰ কাছে অভিধৰ্মেৰ অনেক অনুশাসন শুনলেন বাজা।

এই কাহিনী অবলম্বনে যে চিত্ৰ-কাহিনী এখানে আঁকা হৈছে, তা সম্পূৰ্ণ অক্ষত ভাৱস্থায় নথি আছে আজও। চিত্ৰে দেখছি, শৃঙ্খলাবদ্ধ গজবাজকে নিয়ে যাওয়া হৈছে কাশীবাজেৰ কাছে। দেখছি, বাজাৰ হস্তিশালাে বজ্জ্ববদ্ধ উপবাসী গজবাজক, তাঁৰ চতুৰ্দ্দিকে ইক্ষুদণ্ড, বদলীকাণ্ড, চাৰা-লাগানো তুলি-জাতীয় শকাট কৰে আনা হৈছে নানান আহাৰ্য, গথচ গজবাজ উপবাসী। সম্মুখে বিস্ময়াবিষ্ট হস্তিশালাৰ বন্ধক। পৰবৰ্তী প্যানেলে দেখছি, কাশীবাজেৰ দৰবাৰে হস্তিশালাৰ বন্ধক যুক্তকৰে তাৰ অদ্ভুত অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰছে। বাজা ব্রহ্মদত্ত সি হাসনে উপবিষ্ট। দেখছি, হাতীক শৃঙ্খলমুক্ত কৰে দেওয়া হৈছে, কন্ধাশ্বাস গজবাজ ছুটে চলেছেন অবগ্য-অভিমুখ গজবাজেৰ এই দ্ৰুতগতি গমনশক্তিটি অপূৰ, তাঁৰ পিছনেই অশ্বপৃষ্ঠে দুজন বাজানুচৰ, তাৰা এৰুটি নগৰ-তোৰণ আতিক্রম কৰছে। বন্ধনমুক্ত হস্তীৰ সম্মুখেও দুজন বল্লমধাৰী পদাতিক অনুচৰ। শেষ দৃশ্যে দাছি মাতাপুত্ৰেৰ মিলন-দৃশ্য। এই খণ্ডচিত্ৰটিৰ মাধুৰ্যবস বৰ্ণনা কৰা অসম্ভব। মানুষ নয়, কোন জানোয়াৰেৰ চিত্ৰ এ-জাতীয় ভাবব্যঞ্জনা অণু কোথাও দেখছি বলে মনে পড়ে না। গজবাজ দাডিয়ে আছেন, আবেশে দুটি চক্ষু বুজে এসেছে তাঁৰ। শুণ্ডে কৰে জল নিয়ে তিনি আবগতৰে ঢালছেন অন্ধ পিতাৰ গজকুন্তে। তাঁৰ সম্মুখে অন্ধ পিতা শুণ্ড উত্তোলিত কৰে আত্মাণ কৰছেন পুত্ৰেৰ দেহ-সৌগন্ধ। মাতা তাঁৰ শুণ্ড বুলিয়ে দিচ্ছেন পুত্ৰেৰ অঙ্গে। শিল্পী অন্ধ পিতামাতাৰ চোখ আঁকেন নি—কিন্তু অন্ধ মানুষ যেভাবে দৃষ্টিহীনতাৰ পৰিপূৰক হিসাবে প্ৰিয়জনেৰ গায়ে হাত বুলিয়ে স্নেহ-ভালবাসা জ্ঞাপন কৰে এক্ষেত্ৰে শিল্পী সেই কৌশল প্ৰয়োগ কৰে ওঁৰ পিতামাতাৰ মনোভাৱ সুন্দৰভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্যাম জাতকে যে কথা বলেছি, এবাৰও তাই বলতে ইচ্ছা হৈছে। এখানেও কৃতন্ত্ৰ কাঠবিয়াকে ক্ষমা কৰেছিলেন বোধিসত্ত্ব—দৈবনির্দেশে মুক্ত হৈছিলোঁ তিনি। সিংহল-অবদান জাতকেৰ রক্তক্ষয়ী বৈবী নিৰ্যাতনেৰ চিত্ৰটি আঁকাৰ পৰ শিল্পী যেন অন্ততপ্ত ক্লান্ত হৈয়েই এই সব অহিংসা, ক্ষমা, মহানুভবতাৰ জাতক কাহিনীগুলি দিয়ে ভৰিয়ে তুলেছেন এ গুহা-বিহাৰেৰ পাৰ্শ্ববৰ্তী প্যানেলগুলি।

অন্তরালেৰ অপৰ পাৰ্শ্বে স্নাতসোম জাতকেৰ একটি দীৰ্ঘ কাহিনী। দুৰ্ভাগ্যক্রমে

এব অনেকগুলি চিত্রই ঝাপসা হয়ে এসেছে। তবু কাহিনীটি জানা থাকলে এবং বিভিন্ন দৃশ্যের অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা থাকলে, ধৈর্যশীল দর্শক এটির আংশিক বসান্বাদন করতে পারবেন মনে করে এটিকেও লিপিবদ্ধ করলুম। চিত্রের কিছুটা আছে অন্তবাল প্রাচীরের বামপার্শ্বে, কিছুটা হল-কামবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে (১৭১২০ ও ১৭১২১)।

প্রথমেই দেখছি, বাবাণসীবাজ সুদাস যুগয়ায় চলেছেন একটি শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে। দেখছি, অগ্ন্যাগ্ন সৈন্যদলকে পিছনে ফেলে বাজা একাই এগিয়ে চলেছেন—তাঁর সম্মুখে হরিণ, বন্য শূকর, তাঁর পশ্চাতে শিকারী কুকুর। এর উপরে দেখছি, যুগয়া-ক্লান্ত রাজা ভূমিশযায় নিদ্রিত, একটি সিংহী বাজার পদলেহন করছে, রাজার হুতসোম জাতক শ্বেত অশ্বের ভীত উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি লক্ষ্য করার মতো। তার উপরের পানোলে দেখছি, বাজা উঠে বসেছেন, সিংহী পিছন ফিরে আছে বটে, তবে ঘাড় ঝাঁকিয়ে বাজাকে দেখছে। বস্তুতঃ, জাতক-কাহিনী অনুসারে, অমিতবিক্রম কাশীবাজকে দেখে সিংহীর মনে অনুবাগ সঞ্চারিত হয়েছিল, বাজা তাকে সেই বিজন অবগো গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন এবং তাঁর একটি পুত্রসন্তান হয়।

পরের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, বাজাবের মাঝখান দিয়ে শিশুকে পিঠে তুলে নিয়ে সেই সিংহী বাজার প্রাসাদের দিকে চলেছে। পথের উপর ফুল ছড়ানো, ছুধাবে নিশান—অর্থাৎ, বাজা তাঁর নববিবাহিতা সিংহী মহিষীকে সমস্মানে রাজপুতীতে আনবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু দেখছি, বাজাবের লোকেরা ভীত, সন্ত্রস্ত শিশুকোড়ে জননী, বালক, বৃদ্ধ সকলেই বিষয়াবিষ্ট। ওবা সকলে সার দিয়ে বসে আছে পথের ছুধাবের বাড়ীর ছাদে। ছ'একটি গাছের পাতা ইঙ্গিত করছে সন্ত্রস্ত দর্শকবৃন্দ রাজপথের সমতলে নেই—আছে দ্বিতলে।

এ দৃশ্যের শেষ প্রান্তে একটি তোবণ-দ্বার। সেই যত্র-চিহ্নের ওপারে রাজসভার দৃশ্য বাজা শিশুকোড়ে সিংহাসনে পদতলে সিংহী পাশে মন্ত্রী, সভাস্থ সকলেই সন্ত্রস্ত। এ চিত্রটি প্রায় অবলুপ্তই বলা চলে।

কিন্তু লক্ষ্য করলে এর পাশের চিত্রটি বোঝা যায়। সেটিতে রাজকুমারকে শস্ত্র-বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। একটি কদলীবাগে লক্ষ্য স্থির করে রাজপুত্র বল্লম ছুঁড়ছেন। তার পরের দৃশ্যটি রাজকুমারের পাঠশালায়, এই চিত্রটি নষ্ট হয়ে গেছে।

সুদাসের পুত্র সৌদাস। যুববাজ ক্রমে ক্রমে বয়স প্রাপ্ত হলেন। বাজা সুদাসের স্বর্গাবোহণের পর তিনিই হলেন কাশীবাজ। পববর্তী চিত্রটি তাঁর অভিষেকের। সব অভিষেক দৃশ্যের মতোই (মহাজনক, সিংহল-অবদান প্রভৃতি) সেই একই পবিকল্পনা।

কিন্তু সৌদাস হচ্ছে সিংহী'র পুত্র। প্রতিদিন তার মাংস চাই। একদিন পাচক দেখল, বাজার আহাৰ্য মাংস কুকুরে খেয়ে গেছে। ভীতব্রত পাচক এ-কথা গোপন করে একটি মৃত ব্যক্তির জজ্বা থেকে মাংস নিয়ে নবমাংস বাগ্না করে সৌদাসকে খেতে দিল। অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে আহাৰ্য করে সৌদাস পুবস্কার দিল পাচককে এবং জানতে চাইল

সৌদাস কৌতুকবোধ করে। বলে—তাই নাকি? মন্ত্রগুলি শুনে আঁব মৃত্যুসময়ে কাঁদবে না তুমি?

সুতসোম বলেন—না!

বস্তুতঃ, বান্ধসেব ক্ষুণ্ণবৃত্তির জন্য আত্মদানে তাঁর আপত্তি নেই; কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি ঐ অশ্রুতপূর্ব মন্ত্রচতুষ্টয় শুনে যেতে পারলেন না বলেই ক্ষুব্ধ। সৌদাসকে তিনি অনুবোধ কবলেন, তাকে সাময়িক মুক্তি দেবার জন্য। প্রতিশ্রুতি দিলেন, মন্ত্রচতুষ্টয় শ্রবণ করে তিনি আবার ফিরে আসবেন সৌদাসেব আবণ্যক আবাসে, তার ক্ষুণ্ণবৃত্তির জন্য।

হা-হা করে হেসে ওঠে সৌদাস। বলে, একবার পালাবার সুযোগ পেলে কি কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে আবার ফিরে আসে?

সুতসোম অবাক হয়ে বলেন—কী বলছ তুমি? সামান্য প্রাণের চেয়ে মৃত্যুর কথা বড় নয়?

সৌদাস বলে—নিশ্চয় নয়! মানুষকে চিনতে বাকি নেই আমার।

সুতসোম গম্ভীরকণ্ঠে বলেন—নবমাংসভোজী বলে তেঁমাকে আমি ঘৃণা করি নি সিংহীতনয় সৌদাস; কারণ, আমি জানি সেজন্ম দায়ী তোমার জন্ম-ইতিহাস। হিংস্র আণ্যক পাণীর বক্তৃতা তোমার বমনীতে বইছে বলেই তোমার চরিত্রের এই বিকার—তোমার ও-বাবজার সিংহীপুত্রের উপযুক্ত ব্যবহার, কিন্তু হে কাশীবাজতনয় সৌদাস, এইমাত্র তুমি যে কথা বললে—সত্যের চেয়ে মানুষের প্রাণ বড়, এ তো তোমার কাশীরাজ-তনয়ের মতো কথা হল না। মানুষের প্রকৃত পবিচয় তো তুমি আজও পাও নি তাহলে।

কেমন যেন খটকা লাগে সৌদাসেব। নবমাংসে তার আসক্তির কথা জানতে পেরে সমগ্র কাশীবাসী প্রজাবৃন্দ তার বিকল্পে অঙ্গধারণ করেছিল—তাকে সিংহাসনচ্যুত করেছে। গোটা মনুষ্য-সমাজের বিকল্পেই প্রচণ্ড অভিমান তার, অবণ্যচাষী নবমাংসভোজীকপে সে এইজন্মই পতিশোধ নিতে উদ্যত। কিন্তু এ-লোকটি যে আজ নূতন কথা শোনালে। এ বলছে সেজন্ম সৌদাসকে সে ঘৃণা করে না। প্রচণ্ড কৌতূহল হল সৌদাসেব। বললে—বেশ, মানুষের প্রকৃত পবিচয় পাওয়ার জন্য না হয় একটু মূর্খামিই করা যাক। যাও, মুক্ত তুমি!

সুতসোম চলে গেলেন ভিক্ষু নন্দের এটিবে। মহানন্দে ইন্দ্রপ্রস্থবাজকে আশ্রমে স্থান দিলেন ভিক্ষু নন্দ। তাকে শোনালেন বুদ্ধ-কণ্ঠ্যের সেই অশ্রুতপূর্ব মন্ত্রচতুষ্টয়। পবন তৃপ্তি পালেন সুতসোম, মৃত্যুর জন্য আঁব খেদ বউল না তার। পবদিন একাকী ফিরে এলেন সৌদাসেব অবণ্য-আবাসে। তাকে এভাবে ফিরে আসতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল সৌদাস; বললে—আশ্চর্য! তুমি প্রাণ দিতে ফিরে এসেছ?

মহাধার্মিক সুতসোম হেসে বললেন—আশা করি, এতদিনে মানুষের প্রকৃত পবিচয়টা বুঝতে পেরেছ তুমি, সিংহীতনয় সৌদাস। নবমাংস ভক্ষণ যদি সিংহীপুত্রের জন্মগত সংস্কার হয়, তবে সত্যধর্ম বক্ষার্থে প্রাণদানে মানুষীতনয়েরও আছে জন্মগত অধিকার।

ইন্দ্রপ্রস্থবাজের মহানুভবতায় বিম্বল হয়ে পড়ে সৌদাস। সে-ও বাজার পুত্র, সে-ও একদিন বসত সিংহাসনে, মাথায় পবিত্র বাজমুকুট। স্মৃতসোমের হাত দুটি ধরে বললে—ইন্দ্রপ্রস্থ-অধিপতি। জীবমাত্রেরই মহত্বে অধিকার আছে। মহত্বেই পবিচয় হয়তো আমিও দেখাতে পারতাম একদিন, কিন্তু তোমরা আমার জন্মের ইতিহাসটা যে ভুলতে পারলে না—শুধু ঘুণাই কবলে আমাকে। তাই আমি আজ নবমাংসভুক্ত বান্ধব।

স্মৃতসোম বলেন—জন্মের জন্তু কেউ দায়ী নয়। কর্মেই তার অধিকার। তুমি ক্ষুণ্ণবৃত্তি কব সিংহীতনয়, আমি প্রস্তুত।

সৌদাস বলে—মানুষীতনয় ইন্দ্রপ্রস্থবাজ, তুমিও এতদিন জানতে না সিংহীশিশুব প্রকৃত পবিচয়। আশা কবি, তুমিও এবার সিংহীতনয়ের প্রকৃত পবিচয়টা পাবে। গোমাকে হত্যা কব না আমি। তার প্রতিদানে আমাকে শুধু জানিয়ে দাও বুদ্ধ-কণ্ঠ্যের কী বাণী শুনে এসে মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করেছ তুমি।

সেই বাণী শ্রবণ করে সৌদাস সন্ধর্মের অনুসারী হয়ে পড়ে।

শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বাজারি স্মৃতসোমের।

অস্তবালের পশ্চিম প্রাচীরে আছে বৃহদায়তন একটি সমাপিকাচিত্র (চিত্র-৬৬)। ঠিক সমাপিকাচিত্র অবশ্য একে বলা উচিত নয়, কাবণ, এতেও আছে তিনটি অংশ। অথবা তিনটি স্তর। এ চিত্রটি কয়েকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, অজন্তায় অতি অল্পসংখ্যক চিত্রই অবশিষ্ট আছে, যাতে রঙ ও বেখা বয়েছে অটুট। এটি তার একটি। সহস্র বছর পরেও প্রায় প্রত্যেকটি বেখা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, যদিও বড়ো ঝুঁজলা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। তবু রেখার কাবিগবী, যাকে বলে ‘পেনসিলিং’-তার চরম ঔৎকর্ষ এখানে দেখাতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, এই চিত্রটিতে শিল্পী বৃহত্তর ভাবভাব, বস্তুতঃ এ প্রাচ্যখণ্ডের, বিভিন্ন জাতির চিত্র একেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম যে সমস্ত প্রাচ্যজগতের সম্পদ, সে সত্য এ-চিত্রে সোচ্চার। ‘দিয়ে আর নিবে মিলাবে মিলিবে’-র বৃহত্তর মহামানবের সাগবতীবেব তবজোচ্ছ্বাস এ আলেখ্যে কান পাতলে শুনতে পারেন। তৃতীয়তঃ, ইটালির একটি মনাস্টারির নীচু স্নাতসৈতে দেওয়ালে আকা লেওনার্দো-র বিখ্যাত চিত্র ‘লাস-সাপার’-এর কল্যাণে যেমন যীশুখ্রীষ্টের সবকয়টি শিষ্যসমেত প্রভুকে দেখতে পায় খ্রীষ্টান-জগৎ এ চিত্রটিতে তেমনি বুদ্ধদেবের যাবতীয় প্রিয় শিষ্যসমেত তথাগত বুদ্ধকে দেখতে পান বৌদ্ধবা।

বুদ্ধদেবের জীবনীতে আমরা জেনেছি যে, তিনি যখন তার অভিধর্মের প্রচাবে ভূ-ভারত প্রদক্ষিণ কবছেন, তখন স্বর্গবাসিনী তার গভধাবিনী জননী মায়াদেবীর মনে ছুঁখ হয়েছিল তিনি পুত্রের মুখ-নিঃসৃত বাণী শুনে যেতে পারেন নি বলে। বুদ্ধ-জননীর এই মনোবেদনার কথা জানতে পেরে স্বর্গ থেকে দেববাজ শত্রু (ইন্দ্র), ব্রহ্মা প্রভৃতি মর্তো নেমে আসেন বুদ্ধদেবকে স্বর্গে আমন্ত্রণ জানাতে। গৌতমবুদ্ধ সশরীরে স্বর্গে গিয়ে

অভিধৰ্মেৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰতে সন্মত হলেন। সেখানে তিনি যাবতীয় দেবদেবীৰ উপস্থিতিতে জননীকে সদ্ধৰ্মেৰ মূলকথা শুনিযে আসেন।

স্বৰ্গ থেকে অববোহণ কৰে বুদ্ধদেব দেখতে পেলেন, যাবতীয় পাৰ্থিব নৃপতি এবং বৌদ্ধপ্ৰধানবা সমবেত হায়েছেন তাঁকে সম্বৰ্ধনা জানাতে। সেই সভায় মহাভিক্ষু সাবিপুত্ৰকে লোকচক্ষুৰ সন্মুখে মহাঅৰ্হৎকাপে সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰতে তিনি কয়েকটি প্ৰশ্ন কৰেন। তিনি জানতেন, মহাজ্ঞানী সাবিপুত্ৰ এ প্ৰশ্নগুলিৰ উত্তৰ দিতে পাববেন। তাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটি ছিল -বস্তুৰ সংজ্ঞা কি? সাবিপুত্ৰ নিভূৰ্ণ উত্তৰ দিলেন। তখন আৰও কঠিন প্ৰশ্ন কৰতে থাকেন বুদ্ধদেব। একে একে সকল প্ৰশ্নেৰ নিভূৰ্ণ উত্তৰ দান কৰে এই দিনই সাবিপুত্ৰ মহাঅৰ্হৎকাপে বৌদ্ধ ধৰ্মে স্বীকৃতি পান।

শিল্পী এই ঘটনাটি অবলম্বনে এখানে একটি বৃহৎ চিত্ৰ এঁকেছেন। আগেই বলেছি, তাৰ তিনিটি স্তৰ। উপৰে স্বৰ্গে বুদ্ধদেব ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰছেন। দ্বিতীয় স্তৰে তিনি স্বৰ্গ থেকে নাম আসাইন। তৃতীয় ও শেষ স্তৰে তিনি সাবিপুত্ৰকে পৰীক্ষা কৰছেন (১৭১-২)।

এখানে চিত্ৰে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেব একটি সিংহাসনে আসীন। তাঁৰ বামদিকে বসে আছেন দেবগণ এবং স্বৰ্গগত মহাত্মা পুণ্যাশ্ৰাব দল। তাঁৰ দক্ষিণে মাযাদেবী-সমেত দেবীবা বসেছেন। এখানে স্বৰ্গত পুণ্যাশ্ৰাদেব মধ্য একটি বিশেষ মূৰ্তি দেখতে না পেয়ে আমি কিন্তু হতাশ হয়েছিলুম। আমার খুব আশা ছিল, শিল্পী শ্মশ্ৰু-সমন্বিত একটি

বুদ্ধদেব মণ্ডিত এখানে এঁকে দেবেন, ষোড়শ গুহাৰ ১৬১-ক সাবিপুত্ৰৰ পৰীক্ষা।

এটি স্মরণ কৰে। না, স্বৰ্গত ঋষি অসিত্ৰেৰ আকৃতি আমি খুঁজে পাই নি বুদ্ধদেবৰ বামে (চিত্ৰ ৬৬-এ এই অংশটি আঁকা হয় নি)।

মাকথানে দেখছি, হুঁষিত স্বৰ্গ থেকে নেমে আসছেন বুদ্ধদেব। তাঁৰ সঙ্গে বয়েছেন আৰও কয়েকজন স্বৰ্গীয় সহচৰ। বোধ কৰি, স্বৰ্গ থেকে বিদায়েৰ মুহূৰ্তে ওঁ'বা এসে শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন কৰছেন। এখানে লক্ষণীয়, সবকয়টি ফিগৰ-ই যেন ভাবহীন

যেন এ তাঁদেৰ স্কুল শৰীৰ নয়, যেন বাতাসে ভাসছেন তাঁ'বা। পঞ্চদশ শতাব্দীৰ ইটালীয় চিত্ৰকৰ পেকজীনো-ৰ বিখ্যাত চিত্ৰ 'খ্রীষ্টেৰ শিশুচতুষ্টয়'-এ যেমন মনে হয়, ফিগৰগুলি মনুষ্যাকৃতি হওয়া সত্ত্বেও কেমন যেন অপাৰ্থিব, ভাবহীন এখানেও বুদ্ধদেব ও তাঁৰ সহচৰদেব তেমনই মনে হয়। স্বৰ্গ থেকে বুদ্ধদেবৰ অবতরণেৰ এই বিষয়-বস্তুটি নিয়ে সাঁচিৰ উত্তৰ-তৌবণপথেৰ পশ্চিম দিকস্থ স্তম্ভেৰ সৰ্বোচ্চ প্যানেলে একটি ভাস্কৰ্য আছে। সেখানে শিল্পী ত্ৰিশটি ধাপ এঁকেছিলেন এখানে দেখেছি মাত্ৰ পাঁচটি ধাপ দেখিয়েই ইঙ্গিতে সোপানেৰ অস্তিত্ব বোঝানো হয়েছে। লক্ষণীয়, পাঁচটি ধাপেৰ মধ্য একমাত্ৰ যেটিতে বুদ্ধদেব পদাৰ্পণ কৰে আছেন, সেটিতেই নকশা-কাটা আছে। কিন্তু তা তো হয় না। সিঁড়িৰ সব ধাপেই তো একই অলঙ্কৰণ থাকাব কথা। বোধ হয় এভাবে শিল্পী বলতে চান, কোন ধাপেই নকশা নেই—প্ৰভুৰ চৰণপদ্মপাতে ঐ বিশেষ ধাপটি

রোমাঙ্কিত হয়েছে মাত্র। তিনি যখন পববর্তী ধাপে পদার্পণ করবেন, তখন সেটিই আবার রোমাঙ্কিততন্ত্র হয়ে উঠবে। বুদ্ধদেবের ছপাশে ত্তজনের হাতে আছে চামর — পিছনে একজনের মাথায় অদ্ভুতদর্শন বাজমকট। বুদ্ধদেবের মাথার উপর সম্মানছত্র।

এবার নীচের অংশটি দেখি। সোপান-শ্রেণী ও হাতীব পিঠে হাওদাব নকশা অর্ধ-চন্দ্রাকারে একটি যতি-চিহ্ন-বেখাকপে এই নীচের অংশটিকে স্বর্গাবতরণ খণ্ডচিত্র থেকে পৃথক করেছে। নীচে দেখছি, একটি বহু-সিংহাসনে বুদ্ধদেব আসীন। প্রলম্বিতপদ ধর্মচক্র মুদ্রায়। সামনের জমি পুষ্পাকীর্ণ বুদ্ধদেবের পিছনে একটি জ্যোতিঃপ্রভা। প্রভার ছপাশে দুটি গন্ধর্বশিশু- তাদের পিছনে ছোট ছোট মেঘস্বপ গন্ধর্বশিশু দুটি যেন উড় আসছে। বুদ্ধদেবের ছপাশে দুই বোধিসত্ত্ব। বামে বজ্রপাণি, দক্ষিণে পদ্মপাণি। তাঁর দক্ষিণে বাজেন্দ্রবৃন্দ ও বামে শিষ্যদল। এ অংশে পঞ্চাশটির বেশী মূর্তি আছে, তিনটি হস্তী ও ছয়টি অশ্ব (চিত্র ৬৬-তে সম্পূর্ণ মূল চিত্রটি আঁকা হয় নি, ফলে, পাঁচটি অশ্ব) আছে। লেওনার্দো-র “শেষ সাযসাশ” (‘L'ultima’, চেনা উলতিমা) চিত্রটিও এমনি প্রতिसাম্যমূলক। কেন্দ্রস্থলে যীশুখ্রীষ্ট, তাঁর এক এক দিকে ছয়জন শিষ্য। খ্রীষ্ট ধর্মের গ্রন্থ আলোচনা করে এই দ্বাদশজন শিষ্যকেই নিশ্চিতভাবে সনাক্ত করেছেন বিশাবদেব দল। বুদ্ধদেবের অন্যান্য চৌত্রিশজন প্রধান শিষ্যের নাম পাওয়া যায়, এ চিত্রে বুদ্ধদেবের বামে আঠাবজন শিষ্যকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাঁর ভিতর মাত্র দুটিকে সনাক্ত করতে পেরেছেন বিশেষজ্ঞরা। বস্তুতঃ, এ চিত্রের পঞ্চাশাধ্বর্ চবিত্তের ভিতর মাত্র সাতজনকে সনাক্ত করতে পেরেছেন অজন্তা-বিশাবদ ডাঃ গোলাম ইয়াজদানী। বুদ্ধদেব, পদ্মপাণি ও বজ্রপাণির কথা আগেই বলেছি। বাকি চাবজন হচ্ছেন ঐরাঃ বুদ্ধদেবের দক্ষিণপদের সমীপবর্তী ভূতলে উপবিষ্ট যুক্তকর বাজা হচ্ছেন মগধ সম্রাট বিম্বিসার, তাঁর অতি সন্নিকটে কিশোর বাজকুমারটি হচ্ছেন তাঁর যুবরাজ অজাতশত্রু। বুদ্ধদেবের বামে শিষ্যদলের মধ্যে প্রথম সাবিত্তে দ্বিতীয় মূর্তিটি হচ্ছে জ্ঞানবুদ্ধ সাবিপুত্রের। তাঁর পিছনেই যুক্তকর (গৌর-ওয়ালা) মূর্তিটি মহামৌদগল্লায়নের। বাস, এছাড়া আর কাউকে চেনা যায় না।

ডাঃ ইয়াজদানীর একটা অনুবিধা ছিল, যা আমার বা আপনার নাই। তিনি বিশেষজ্ঞ—তিনি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আপনি-আমি বসপিপাস্ত্র দর্শক—এসেছি অজন্তা দেখে মনপ্রাণ ভরে নিয়ে যেতে। আমরা যদি কল্পনার রাশ একটু আলুগা করে দিই—এবং ভাববাজ্যে যদি একটু বেশী আনন্দবস আহরণ করতে পারি ‘তাহে কিবা কার ক্ষতি?’ আশুন, আমরা পরামর্শ করে আরও কয়েকটি চবিত্তকে সনাক্ত করি। যাতে বিশেষজ্ঞের দল নেহাৎ হাঁ-হাঁ করে প্রতিবাদ করতে ছুটে না আসেন, তার কিছুটা যুক্তিও দেখাব আমরা।

প্রথমতঃ বলব, বাজা বিম্বিসারের বামে মুকুটধারী নৃপতি হচ্ছেন কোশলবাজ প্রাসেনজিত। যুক্তি? ডাঃ ইয়াজদানী বিম্বিসারকে সনাক্ত করেছেন কোন যুক্তিতে?

চিহ্নে এই অজানা x-নৃপতিটিকে সর্বপ্রধান স্থান দেওয়া হয়েছে—বুদ্ধদেবের নিকট যে সব মহাজনপদ-নৃপতি অভিধমে দীক্ষা নিয়েছিলেন, বিশ্বিসাব তাঁদের মধ্যে প্রধান। এই দুটি সহ-সমীকরণের সমাধান করে ইয়াজদানী বলেছেন, x—বিশ্বিসাব। অনুকপভাবে আমবা বলব—বিশ্বিসাবেব পাশে এই অজানা y-নৃপতির অবস্থান প্রাধান্যের দিক থেকে দ্বিতীয় এবং প্রসেনজিতের স্থান প্রথম যুগের বৌদ্ধ-নৃপতিদের মধ্যে বিশ্বিসাবেব পবেই। এতএব, $y = \text{প্রসেনজিত}$ ।

এবার বুদ্ধদেবের বামচরণ-প্রান্তের সর্বনিকটতম মূর্তিটি। শিল্পী একে সার্বিপুত্রের চেয়েও বুদ্ধদেবের নিকটতর করে ঠেকেছেন। এব মুখে দেখছি ঠুটিয়েছেন এক বিচিত্র হাস্যবেখা, বয়সে তঁর তরুণ। তবু কেন যে একে ইয়াজদানী সনাত্ত করেন নি, আমি জানি না। আমার মতামত ব্যক্ত করার আগে বুদ্ধদেবের জীবনের একটা ঘটনার কথা বলি :

মহাপাণ্ডুঃ সার্বিপুত্র একবার বলেছিলেনঃ আমার দট বিশ্বাস, এই ধবাধামে তথাগত বুদ্ধদেবের মত মহাজ্ঞানী উত্থাপনে এখনও জন্মগ্রহণ করেন নি, আজও নেই, এবং ভবিষ্যতেও কখনও অবতীর্ণ হবেন না।

বুদ্ধদেব সে-কথা শুনেও পে.এ. বলেছিলেনঃ তোমার বাণী অত্যন্ত শ্রুতিমধুর, কিন্তু হে পণ্ডিতাগণগণ্য সার্বিপুত্র, তুমি এ-কথা বলার পূর্বে এতাবৎকাল যে সব মহাপুরুষ এই ধবাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁদের জীবনী ও বাণী নিশ্চয়ই জ্ঞানে নিয়েছ।

সার্বিপুত্র সলজ্জে বলেনঃ কাল অনাদি দর অন্তঃতর সর্বলের সকল কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

তা বটে। অনন্ততঃ ভবিষ্যতে এ ধবাধামে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁদের কথা নিশ্চয়ই তুমি দিব্যদৃষ্টিতে জানতে পাবেছ।

আনন্ড লজ্জা পেয়ে সার্বিপুত্র বলেনঃ আচ্ছ না। বান ওর অনাদি নয়, সে যে অনন্ততঃ। স্তব্ধ ভবিষ্যতের কথা আমি কেমন করে জানব প্রভু?

ঃ তাও তো ঠিক। তাহলে অনন্ততঃ আজ এই ধবাধানের বিভিন্ন প্রত্যন্তদেশে যত মহাপুরুষ মবদেহ বাণী করে বিচরণ করছেন, তাঁদের সম্বন্ধ তোমার সম্যক ধারণা হয়েছে নিশ্চয়।

মবমে মবে গিয়ে সার্বিপুত্র বলেন—কাল যেমন অনাদি-অনন্ত, পৃথিবীও তেমন বিপুল। এই বিপুল পৃথিবীর সকল প্রত্যন্তদেশের সংবাদ আমি কেমন করে জানব প্রভু?

বুদ্ধদেব শুধু বললেনঃ তাও তো বটে। এ তো খুব ভাবনার কথা দেখি।

তখন বুদ্ধদেবের চরণে সঁপ্টাজে প্রণিপাত করে সার্বিপুত্র বললেনঃ আমার ভুল আমি বুঝতে পাবেছি প্রভু।

বুদ্ধদেব তখন শিষ্যদের বলেছিলেনঃ জ্ঞানমাগে সার্বিপুত্র সবাগ্রগণ্য, কিন্তু সে আমাকে এত ভক্তি করে যে, বর্ষণ-উন্মুখ ভক্তির মেঘে তার জ্ঞানস্বর্গ কখনও কখনও

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। জ্ঞান ও ভক্তি দু-নোকায় পা দিয়ে সারিপুত্র অগ্রসর হতে বাধা পায়। অথচ তোমরা আনন্দকে দেখ, সে শুধু সেবার মাধ্যমেই এগিয়ে চলেছে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির এলোমেলো হাওয়ায় তাব নোকা একটুও দোলে না।

আনন্দ ছিলেন সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র। বোধ কবি সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য ছিলেন তিনি। মহানির্বাণের সময় বুদ্ধদেব তাঁরই হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ভিক্ষাপাত্রটি। এই সব কথা যখন ভাবি, তখন বুদ্ধদেবের বামচরণবতী বিচিত্র হস্তবেথায় সমুজ্জল ঐ তরুণটিকে স্নানান্ত বসতে তামান কো বই বাধে না। বুদ্ধদেবের কঠিন ও কুট প্রশ্নে ব° সারিপুত্রের জ্ঞানগত পড়াশুনে সনাই যখন আঁতুত, তখন মনে মনে বলছে। 'নির্মাণের দু-নোকায় আমার কি প্রয়োজন। আমি আছি তোমার চরণসেবা করতে - ওই বসেছি তোমার চরণমূলে। আমার নিবাণ চেকায় কে? যেন এ-কথা ভেবেই ওখ মথ ফুটে উঠেছে বৈ মোনা'লসা-মাকা বিচিত্র হাসিটি।

প্রাচীরের নিখুঁত শিল্পী হতে সম্পদন হস্তায় অব। এক বসন্তে চণ্ডি রাজধানী অগ্ন্যতন শ্রেষ্ঠ চিত্র তো বটেই, বোধ কবি বিশেষ অগ্ন্যতন শ্রেষ্ঠ বৈদ্য।

বুদ্ধদেবের বামপার্শ্বে আছে একটিমাত্র হস্তী। তাঁর পিঠে একজন মহিলা, সঙ্গে সহচরীও দল। 'নির্মালী' চিত্র তাঁর হস্তে মণ্ডিত। হস্তীটি হাতের বে। আত্মপালীর ঘটনা পুনবতী করে, বুদ্ধদেবের 'নির্মালী' মণ্ডিত। 'নির্মালী' হস্তীটি হস্তে একেবারে শেষ পযায়ে। আমি তো মনে বসেছি, বৈ মণ্ডিতটি হস্তে কালীর বণিকশ্রমত যশের সহধর্মিণী। সাবনাথ মৃগদানে প্রথম পটভূমি পুনবতনের অন্তর্ভুক্ত। 'নির্মালী' কালীধামের শ্রেষ্ঠ বন্য বণিকপ্রাণ। বোধের সম্মুখ ও সমান্তা বুদ্ধদেবের কাছে দাঁড়ানিয়েছিলেন। যশ-জায়াই হস্তে গোত্রমণ্ডনের প্রথম শিষ্য। আমার বামপা। হস্তপুটে ঐ মহিলাটি যশোদেব-জায়া। একটিমাত্র সঙ্গীও তবু আছে শিষ্যী এর মাথায় মুকুট পরিবেছেন। বাজা ও বানী ছাড়া অজ্ঞতা-শিল্পী মুকুট ব্যবহার করতে চান না সচরাচর।

পাঠক যাতে অন্যান্য চণ্ডিগুলির স্নাত্তবধনে নিজেই সচেষ্টি হতে পাবেন, তাই বুদ্ধদেব যে ক্রমপযায়ে দাঁড়া দিয়েছিলেন, সেইভাবে তাব প্রধান ও প্রত্যক্ষ শিষ্যদেব কয়েকজনের নাম এখানে দিলাম।

(১) যে বসন্ত বুদ্ধদেবের নিরাপত্তিয়ার হয়, এক বসন্তে কুশানগর নামের পল্লী বাল্য নগর উপকণ্ঠে আত্মপালার সঙ্গে বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ হয়।

(২) 'অপকৃপা অজ্ঞতা' প্রথম সংস্করণ পড়ে হাতের তথ্যাপক পরম শঙ্কানন্দ মুন তিব্বতের চণ্ডিপাধ্যায় এই অংশটির সঙ্গে আমাকে বোঝালেন 'তুমি যখন বচনায় ব° আলুগা করে দিতেও রাও আছে, তখন ঐ মহিলাটিকে যশোদেব-জায়া মনে না করে মহাগৌতম ও তো মনে করতে পার। তার পিছনেই বিক্ষিপ্তনয়ন। মহিলাটিকে সেক্ষেত্রে যশোধরা এবং গজকুন্ডব উপবে যুক্তকর শিশুমুতিটিকে রাহুলব বলে মনে করা চলবে।'

বোধ শাস্ত্রকার বোধন, গৌতমের নামের মহাগৌতম। যশোধরা ভিক্ষুণী হবার অনুমতিপ্রার্থিনী হিসাবে বুদ্ধদেবের অনুসরণ করেছিলেন পর্যকাল। একবারে শেষ পর্যায়ে এন অনুমতি দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এ-চিন্তে বুদ্ধদেবের বামদিকে একমাত্র হস্তীও পুষ্ঠে শাক্যপুরকামিনীদেরই হয়তো একেছেন অজ্ঞতা-শিল্পী। বসন্তগুলির ব্যঙ্গনার সেক্ষেত্রে বোধ। যার আমি অজ্ঞাধিনস্ত্রিতে তাঁর এ-মত মনে নিয়েছি।

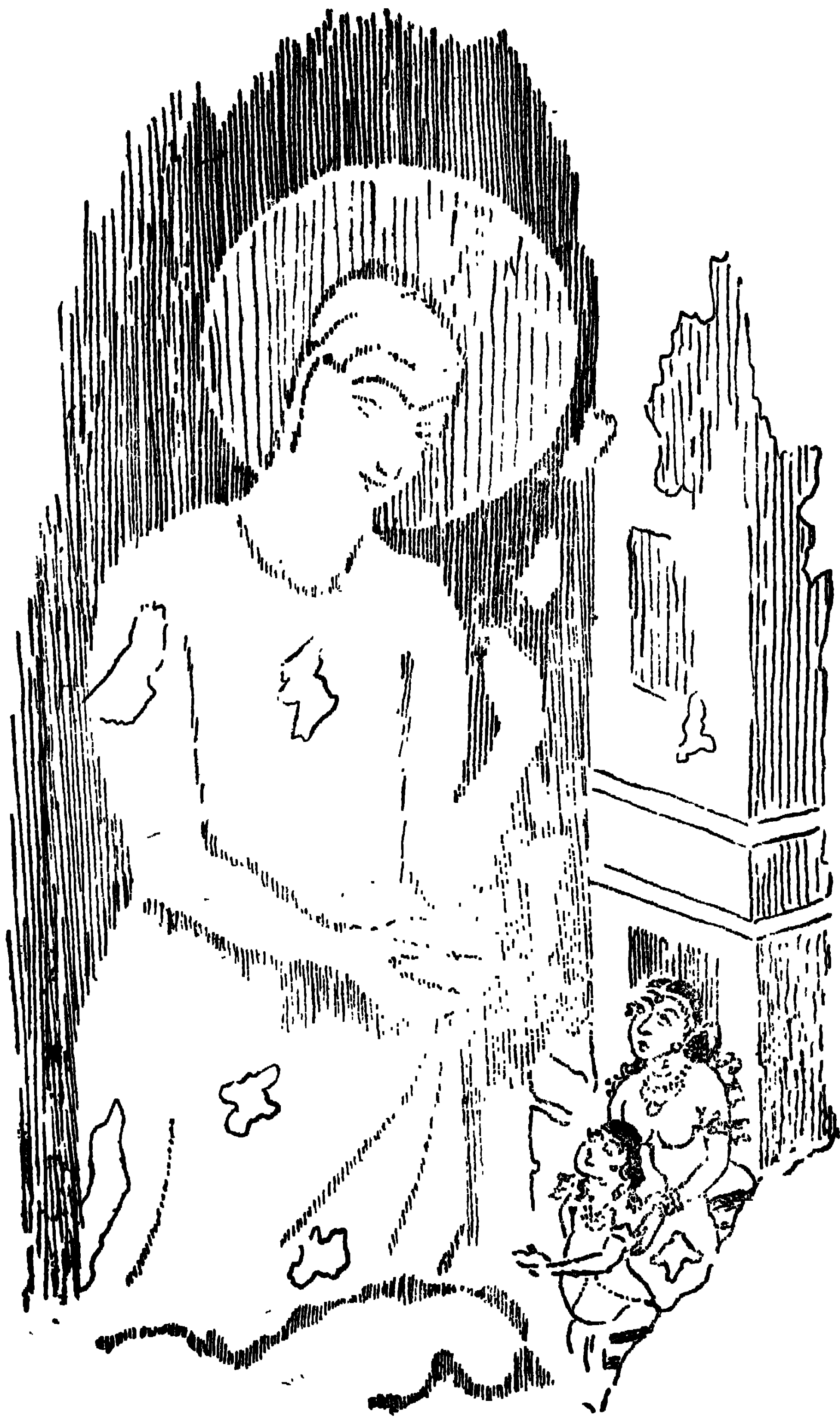
ধ্যান-কোণ্ডিয়া, অশ্বজিত, ভাম্প, মহানাম, ভদ্রিক, যশোদেব (স্ত্রী ও মাতা), বিমল, সুবহু, পূর্ণ, উরুবেলা-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ, গয়া-কাশ্যপ, সারিপুত্র, মহামৌদগল্যায়ন, চন্দ, অনিরুদ্ধ, নন্দিন, সূভূতি, রেবত, অমোঘরাজ, মহাপারনিক, ভকুল, নন্দ, রাহুল, স্বাগত ও আনন্দ।

মূল গর্ভ-মন্দিরে মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তনরত বুদ্ধদেবের বিরাটায়তন মর্মরমূর্তি (১৭।২৩)। ধ্যানস্তিমিত ধর্মচক্র মুদ্রা। প্রলম্বিতপদ—অর্থাৎ পূর্ব-বর্ণিত চিত্রে যা দেখেছি। পদতলে মৃগদাবের প্রতীক দুটি হরিণ-শিশু। মূল গর্ভ-মন্দিরের প্রবেশপথে বামদিকে অন্তরালের উত্তর প্রাচীরে সপ্তদশ গুহার সেই সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রটি। সেই গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব (১৭।২৪)।

চলচ্চিত্র দেখতে দেখতে দর্শককে কঁাদতে দেখেছি। উপস্থাপন পড়তে পড়তে পাঠকের চোখের পাতা ভিজে উঠতে দেখেছি। কিন্তু কোন একটি স্থিরচিত্র দেখতে দেখতেও যে দর্শকের চোখ অশ্রু-সজ্জল হয়ে উঠতে পারে, এই চিত্রটি দেখবার গোপা-রাহুল ও বুদ্ধদেব আগে তা জানা ছিল না। একক চিত্র তো নয়, এর ভিতরেই যে দেখতে পাচ্ছি মন্দভাগিনী যশোধরার সমস্ত জীবনটাকে। এর চোখের তারায়, এর দুটি হাতের মুদ্রায় যে অনেক কথা ও বলছে—নির্ধাক্ত চিত্র তো এ নয়।

দেখছি, অতি বিশালায়তন বুদ্ধদেবের সম্মুখে দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী (চিত্র—৬৭)। বুদ্ধদেবের পরিধানে পীত অজিন, তাঁর মাথান পিছনে জ্যোতিঃপ্রভা : তাঁর হাতে ভিক্ষাপাত্র। বিশাল করে আঁকলেও শিল্পী কিন্তু বুদ্ধদেবকে স্পষ্ট করে আঁকেন নি। পশ্চাদ্ভাগের উপর তাঁর দেহাবয়বকে সুস্পষ্ট দেখায় চিত্রিত করেন নি। যেন যেন হয়, এ কোন রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—এ যেন এক পিত্তাভ অপাখির সত্তা। তিনি অতি বিশাল, তিনি মহিমময়, কিন্তু তিনি রক্ত ও বেথার বন্ধনে বন্দী দিতে নারাজ। অপরূপে, গোপা ও রাহুল আয়তনে ছোট হতে পারে, কিন্তু তাদের দেহের প্রতিটি রেখা, অঙ্গদ্বার, পরিধেয়ের প্রতিটি পরিচয় সুস্পষ্ট।

যশোধরার পিছনে একটি তোরণদ্বার—মহামানবের পিছনে রেখাচীন রঙহীন কালো আকাশ। যশোধরার পরিধেয় শুভ্র, বুদ্ধদেবের পশ্চাদ্ভাগট রক্তবর্ণ। শিল্পী কি জানতেন এ বৈজ্ঞানিক সত্তা—যে সত্যটা বড় যেখানে ঘন হয়ে আসে সেখানে দেখা দেয় শুভ্রতা, তার সব রঙ ঘাঁকে ত্যাগ করে যায়, তাকেই অভিব্যক্ত করে রক্তবর্ণ। জানি, এই বৃহৎ তোরণদ্বারটি তারসামোর খাতির আঁকা। বিশালায়তন বুদ্ধদেবের তুলনায় নারী ও শিশু দুটির আকার বা ‘ম্যাস্’ ঘাটতি হয়ে যাচ্ছে বলে এই তোরণদ্বারটি আঁকতে বাধ্য হয়েছেন তিনি; কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে সেজন্য নয়—শিল্পী যেন বলতে চান যশোধরার পশ্চাদ্ভাগে জীবনের তোরণদ্বার গাঢ় রক্ত, আর তুলনার মহামানবের পশ্চাদ্ভাগে শুধুই মহাশূন্য।



চিত্র—৬৭ : বুদ্ধদেব, গোপা ও রাহুল

অবস্থান—১৭২৪

এই চিত্রটির প্রসঙ্গে এসে প্রাচ্য-শিল্প-বিশারদ লরেন্স বিনিয়ন বলেছেন :^১

মহিমময় বুদ্ধদেবের সুষ্মথে ভিক্ষাদানরত নারী ও শিশুপুত্রের চিত্রটি অবিস্মরণীয়। ...মিঃ গ্রিফিথের গ্রন্থে এবং ইতিয়া সোসাইটি প্রকাশিত এ্যালবামে শুধু নারী ও শিশুকেই আঁকা হয়েছে—আশ্চর্যের কথা,

(১) *Introduction by Lawrence Binyon to "My Pilgrimages to Ajanta & Bagh"*—by Mr Mukul Dey, London 1925.

কেউই তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের চিত্রটি আঁকেন নি। কলে, মাতাপুত্রের ঐ বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকার যিনি মূল উৎস, তাঁকে পাঠক অনুমান করতে বাধ্য হন।

কিন্তু আর একটা কথা। তিনটি চবিত্রকে ক্ষুদ্র গ্রন্থের পৃষ্ঠায় একসঙ্গে দেখাতে গেলে, মাতাপুত্রের দেহাবয়ব এত ক্ষুদ্র হয়ে যায় যে, তার সূক্ষ্ম কাজ দেখানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মাতাপুত্রকে কিছু বড় করে আবার ঐকে দেখাতে হল (চিত্র—৬৮)। এবার চেয়ে দেখুন বাহুল্যের দিকে, কী অপার বিস্তার, কী অপূর্ব আবেদন ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী ও শিশু-মুখে! দেখুন মন্দভাগিনী যশোধবাকেও। লক্ষ্য করুন ওঁর কবাসুলিও মুদ্রা!

গ্রিকিথ বলেছেন :^১

Hands are put in with a pretty manner, grace and truth of expression which, to those acquainted with Indian life, is full of suggestiveness. It is precisely this that, to this day, supple wrists, palms, and fingers beseech, explain, deprecate and caress.

যশোধবাব দুটি হাতের কবাসুলি যেন তার হয়ে কথা বলছে। .ক বলে এ ছবি নির্দোষ? একটু কান পাতলেই গুনতে পারবন, ওর বামহস্ত বলছে : জাখোনা পাগলা। ঐ তোমার বাপ। যা ওর কাছে, ও তোকে পৃথিবীর রাজা করে দিতে পারে। এই বেলা চেয়ে নে তোম পিতৃধন।

কিন্তু এই তো যশোধবাব শেষ কথা নয়। সে যে তার জীবন দিয়ে চিনে নিয়েছে ঐ দযাব অবতার^২ নিষ্ঠুর উদাসীন মানুষটিকে। তাই ওর অবচেতন মনে আছে শঙ্খ। তাই বা-হাতে ছেলেকে ঠেলে দিয়ে ও ডান হাতে আবার তাকে আগলে রাখছে মন্দভাগিনী! তাই ওর ডান হাতের কবাসুলি বলছে : যাসনে বে, যাসনে। ও বড় নিষ্ঠুর! ও কেড়ে নিয়েছে আমার স্বামীকে—স্বয়োগ পোলে ও কেড়ে নেবে আমার সম্মানকেও! ও যে দযাব অবতার।

বিনিয়ন বলেছেন :

আমার শিল্পক্ষেত্রের জীবনে এবং চেয়ে মহিমময়, এবং এমন নকণায় আপ্ত মগ্নমগ্নী সোন চিত্র দেখেছি বলে তো মনে কবতে পারছি না।

এ-চিত্র প্রসঙ্গে এইটিই শেষ কথা নয় কি?

এবার আমবা দেখব আর একটি সুদীর্ঘ জাতক-কাহিনী বিশ্বাস্তব-জাতক। কিন্তু চালচিত্র ছাড়া যেমন প্রতিমার স্বরূপ ফোটে না, পশ্চাদপট ছাড়া যেমন কোন ছবি খোলে না, তেমনি বিশ্বাস্তব-জাতকের প্রকৃত গলায়নের জন্ত বোধিসত্ত্ব বিশ্বাস্তবের বংশ-পরিচয়টি জানা থাকা দরকার। বিশ্বাস্তবের পিতামহ হচ্ছেন স্বনামধন্য মহাবাজ শিবি। মহাভাবতে^৩

(১) *Guide to Ajanta Frescoes*, Dept of Archaeology, H E H. the Nizam's Govt, Hyderabad, 1935.

(২) কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে বনপর্বে (১১ম অধ্যায়) ও অজুগাশন পর্বে (১০ অধ্যায়) শিবিরাজার কাহিনী উল্লেখ। সেখানে শিবিরাজা পরমার্থ কবচের জন্ত নিজ দেহের মাংস দান করেছিলেন।

সত্যনিষ্ঠ শিবিরাজার উপাখ্যান আমবা পড়েছি, সে কাহিনী প্রথম গুহায় ঝাঁকা আছে, তা-ও দেখে এসেছি আমবা (১৩)। জাতকমতে শিবিরাজাব কাহিনীটি অশ্রবকম।

বিশ্ব মন জাতক

একজন অন্ধ ভিখারী তাঁর কাছে একটি চক্ষু ভিক্ষা করেছিল, দানগীল শিবিরাজা তাকে প্রার্থনার অতিবিক্ত নিজের দুটি চক্ষুই দান করেন। মহাভারত-বর্ণিত কাহিনীর মত এখানেও দেবরাজ শত্রু শিবিরাজকে দুটি চক্ষুই প্রদর্শন করেন। সেই কাহিনী অবলম্বনে অজ্ঞা-শিল্পী এই সপ্তদশ গুহাতে একটি



চিত্র- ৬৮

গোপা ও বাহুল

বঙ্গাল ১৭২৪

অনবদ্য চিত্র ঐকে বেগে গেছেন। সেই শিবিরাজাব পুত্র হাচ্চন মহামতি সঞ্জয় এবং তাঁর পুত্রবধু হচ্ছেন মহাবানী পৃথবী। যবরাজ বিশ্বাস্যর এদেবই সম্মান। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল পিতামহের বাণী :

অতি প্রিয় ভাব য'রে যাহা তব অতি আদর্শ
তাহাও চাহিলে দিবে তুখিবারে মন যাচকের ॥১

বিশ্বাস্তবেব জন্মের পূবেই রাজমহিষাব কবাকোষ্ঠী বিচার করে গ্রহাচার বলেছিলেন, জাতক হবেন ভুবন-বিখ্যাত দানবীর এব একে বাইজেশ্বরের মতো আদর করে রাখা যাবে না, ইনি যৌবনেই বনবাসী হবেন।

এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে মহারাজ সঞ্জয় এব মহাবানী প্রতিজ্ঞা কবলেন, এ অঘটন কিছুতেই ঘটতে দেবেন না ওঁরা।

অনুমাত্র জাতক মারক বলেছিল মা, আমি কিছু দান করলে চাই যাবে কিছু আছে ?

শিশুদাল থাকে বিশ্বাস্তব ৩ মা, আমায় সব কিছুকেই সে দান করে দেয় গাহাম, বন, অলঙ্কার সব দান।

সঞ্জয় তাঁর পুনরাবৃত্তি করেন নন্দন। না কি মনের গাও বাবা দেন না তাবা। পিতামহের দানশীলতা পোষে মরো স এ ১১০ ও ২৫০।

অষ্টমবর্ষ বয়সকালে বালক হারেন নন্দন - আমি এমন কিছু দান করতে চাই, যা হবে মহাদান। না হলে ভুগ হবে না আমার অন্যান্য হৃদয়।

জ্ঞানী বলল বিদ্যে করতে চান কুনি

--আমি বদন্তি বানাই। না স, চান তখন হৃদয়

পিতামহের দানশীলতার অতিক্রম করতে চান কুনি।

বালক বলে পিতামহের কাছে শুধু একটি চান প্রার্থনা করছি। মিনে হবে দুটি চক্ষুই দান করেছিলেন। তার হাতের বরো বেনন নন্দন না আমার মন দুটি বহু চক্ষু নন্দন।

ভাবিতা হলে জননী, দাসচর্য্যাস্ত হানন মহানন্দন বিদ্যুত, কিছুতেই তাবা যুবরাজকে বনবাসী হতে দেবেন না। মহারাজ সঞ্জয় বাগ্মী আশ্বিন করে এক অপকৃপা সুন্দরীকে নিয়ে এলেন পুত্রবৎ করে। বিশ্বাস্তব-জ্ঞানী সজ্জাবিশিষ্ট পুত্রবৎকে জনাঙ্ককে নিয়ে এসে বলেন গ্রহাচার ভবিষ্যদ্বাণী কবোছেন, তোমার স্ত্রী যৌবনকালে তোমাকে ত্যাগ করে বনবাসী হবে। সে ললাট-লিখন ব্যর্থ করতে হবে তোমারে। কেন, পাবে ?

নববয়সে গ্রীবাভঙ্গি করে জানায় স পাণ্ডবে

বিশ্বাস্তব-জায়া মাদ্রী বিদ্বা ছিল না মহাঅনু-পণ্ডী সীবলী নও, কিন্তু তাব সংসার-জ্ঞান ছিল প্রথব। সীবলীর মত সে রূপে ভোলাবার চেষ্টা করে নি, ভালবাসা দিয়েও নয়—সে ঠিকই চিনতে পেরেছিল বাজপুত্রকে। সে জানত, কীরোগেব কী ঔষধ।

বিবাহ-উৎসবশেষে পুষ্পসুবক-সজ্জিত পালকে নববিবাহিত দম্পতীর বাসবশয়ায় মাদ্রীকে হাত ধবে পৌঁছে দিয়ে গেল নর্মসহচরীৰ দল। সঙ্গীত, কোতুক, হাস্য-পরিহাস শেষ হলে অর্গলবদ্ধ ঘবে নবদম্পতীকে বেখে বিদায় নিল তারা। মাদ্রী তখন বিশ্বাস্তুরের পদপ্রান্তে নামিয়ে বাখে একটি সলজ্জ প্রণাম। বাজমূল ধবে বিশ্বাস্তুর ওকে তুলে ধবেন। পদ্ম-কোবকতুল্য দুটি হাত জোড় করে মাদ্রী বলে—প্রভু, এই আনন্দের দিনে একটি ভিক্ষা আছে।

উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন বিশ্বাস্তুর। দান করতে পাবলে আর কিছু চান না তিনি। বলেন বল সূচবিহীন, কী দান পেলে সুখী হবে তুমি ?

প্রতিশ্রুতি দিন, আমাকে ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা নিয়ে কোনদিন বনবাসী হবেন না ?

বিশ্বাস্তুরের প্রস্তাবে ফুটে ওঠে ক্ষীণ হাস্যবেখা, বলেন কঠিন প্রতিশ্রুতি শালায় করে নিলে তুমি কিন্তু প্রার্থীকে আমি কখনও বিমুখ করি না। দিলাম প্রতিশ্রুতি, শুচিস্মিৎ।

মিলন-রাত্রিশেষে দ্বার খুলে বাহিরে এসে মাদ্রী দেখে, অলিন্দেব একান্ত প্রভাতের প্রতীক্ষায় জাগে এসে আছেন বিশ্বাস্তুর-জননী। পুত্রবধকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে বলেন মনে আছে ?

সলজ্জ মাদ্রী বলে—আছে মা, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমাকে ত্যাগ করে সন্ন্যাস নেবেন না।

স্বাস্তুর নিশ্বাস পড়ে সঞ্জয়-জায়াব।

স সারবে আবদ্ধ হয়ে পড়েন ক্রমে বিশ্বাস্তুর। দুটি সন্তান হয়েচে তাব। দেবশিশুর মত দিব্যকাণ্ড দুটি নিষ্পাপ শিশু ওরপক্ষেব চন্দ্রকলাব মত দিন দিন বাজপাসাদবে উজ্জল ওব বনে গেলে। মাদ্রীব দুটি নয়নের মণি যেন পুত্র জালী তার কণ্ঠা কৃষ্ণাজিন। মহাবাজ সঞ্জয় আশ্রয় হন, পৃষতী নিশ্চিন্ত হন গ্রহাচাষেব ভবিষ্যদ্বাণী তাবা বাথ কবনে পেবেছেন।

এদিকে দানবাব বিশ্বাস্তুরেব জীবনযাত্রায় কোনও পরিবর্তন নেই। ক্রমাগত দু'হাতে দান করে চলেছেন তিনি—তাব বৈভব, তাব সম্পদ, বাজপুত্রের ব্যক্তিগত যা-কিছু—অলঙ্কার, পরিবেশ, আহাব, তৈজসপত্র। বাজা-বারী ক্রক্ষেপ করেন না—অতুল বাজ-সম্পদের কতটুকু ক্ষতি-বৃদ্ধি হচ্ছে এতে ?

প্রমাদের সূত্রপাত প্রথম দেখা দিল, যেদিন যুববাজ একজন প্রার্থীকে দান করে বসলেন নিজ তববারি। অসন্তুষ্ট হলেন অমাত্যবর্গ, আহত হলেন মহামন্ত্রী, ক্ষুব্ধ হলেন প্রধান সেনাপতি। এ কী অনাচার। ক্ষত্রিয় বাজপুত্র যদি আত্মবক্ষার অঙ্গ পর্যন্ত নিদ্বিধায় দান করে বসেন, তবে প্রজাবৃন্দ কোন্ ভবসায় তাঁব হাতে তুলে দেবে শাসনদণ্ড ?

মহাবাজ সঞ্জয়-ও মমাহত হয়েছিলেন, কিন্তু পুত্রের দানকার্যে তিনি কখনও বাধা দিতেন না, তাই স্বীকার করে নিলেন যুবরাজের এই অক্ষত্রিয় আচার।

কিন্তু সেখানেই তো শেষ নয়। এব কিছুদিন পবে কলিঙ্গ দেশে দেখা দিল অনাবৃষ্টি-জনিত দুর্ভিক্ষ। নিবন প্রজাব দল ভিক্ষার্থে এস বাজপ্রাসাদে, কিন্তু তারা বাজদববাবে না গিয়ে এসে দাঁড়াল যুববাজের গৃহে। এদের দুর্দশাব বিগলিত হয়ে গেলেন বিশ্বাস্তব —ওদের দান কবে দিলেন বাজহস্তীটিকে।

এই বাজহস্তীটি ছিল বাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বাজহস্তীটিকে কবে সে নিমেষে আকাশে আঘাট-সঘন জলদ সঞ্চাব করতে পারত। উৎফুল্ল কলিঙ্গবাসীরা বাজহস্তী নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাভর্তন কবে, কিন্তু এদিকে সঞ্জয়ব বাজো ঘনীভূত হয়ে গেল প্রচণ্ড অসন্তোষ। বাজপুত্রব কোন অবিকার নেই বাজসম্পদ এভাবে পনবাজো বিলিয়ে দেবাব। অসন্তোষ প্রজাবন্দ প্রকাশে অভিযোগ আনল বাজদববাবে ওরা বাজপুত্রব বিচার চাব।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন মহাবাজ।

মহামন্ত্রী তার বর্ণমলে নিবেদন কবেন, প্রজাবন্দ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে অবিলম্বে বনবাজকে স্থানান্তরে প্রেরণ কন। নচেৎ ৩০০ জন বন্য প্রাণীতক নিযুক্ত কবে বসবে।

মহাবানী বলেন কিছুদিনের জন্য একে নাড়ুগালনে প্রেরণ কন মহাবাজ।

মহাবাজ সঞ্জয়ব মুখে ঘূটে গেল বিচিন্তিত হাশ্মবেশ। তার সেই গম্ভীরবিক প্রতি দেখে নিহত হালেন বানী। মহাবাজ বলেন, মন্ত্রীমহোদয়েব পনামর্শও শুনেছি, মহাবানীব স্মৃতিও শুনলাম কিন্তু তোমবা একটা কথা ভুলে গেছ, তা হচ্ছে এই যে, আমি যে সিংহাসনে বসে আছি, সেও সিংহাসনেই একদিন উপবেশন কবাতন সত্যনিষ্ঠ মহাবাজ শিবি।

মন্ত্রী বলেন সে-কথা কেন কবতেন মহাবাজ ?

দৃঢ়বক্তা সঞ্জয় বলেন, হায়েব বিচারে সিংহাসন সম্পদ নেই। বাজা-শাসনেব বিধানে বাজসম্পত্তিব সাতসাবন কন। একদিনেই শাস্তি নির্দিষ্ট আছে। তাই দিতে হবে আমাকে।

আতঙ্কিত পৃষতী বলেন কী সেই বাজদণ্ড

সঞ্জয় বলেন তুমি অন্তঃপুরে যাও বানী, এ দুনিয়া সহ্য কবতে পারবে না। আমি ক্ষত্রিয় নৃপতি, আমাকে সব সহ্য কবতে হয়। যে দুর্দৈবকে এতদিন প্রতিবোধ কবে এসেছি সর্বপ্রকারে, সেই দণ্ডাদেশই দিতে হবে আমাকে।

শিহবিত মন্ত্রী বলেন— মহাবাজ ?

হ্যাঁ, তাই পুত্রকে নিবাসন দণ্ড দিলাম।

সে দণ্ডাদেশ শুনে মুছিত হয়ে পড়েন বিশ্বাস্তব-চরনী বিপ্ত অপবানী স্বয় নিবিকার। দণ্ডাদেশ শুনে তিনি বলেন— বাজাদেশ শিবাবার্থ, তবে, আমি একটি দিনের জন্য সময় চাইছি মহাবাজ ! আগামীকাল আমি একলঙ্গে বনবাসে যাব।

উদগত অশ্রু গোপন করে সঞ্জয় বলেন— কেন ? একদিন সময় চাইছ কেন ?

-নির্বাসনে যাত্রা করার পূর্বে আমাব যা-কিছু সম্পত্তি আমি প্রজাবর্গকে দান কবে যেতে চাই। আপনি শতদান উৎসবের আয়োজন করেন, পিতা।

শুনে অভিভূত হয়ে গেল প্রজাবৃন্দ, বিস্তৃত বাজাদেশে ভ্রমোঘ। সমস্ত দিন ধরে যুববাজ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ মুক্তহস্তে দান করে দিলেন। দিবসান্তে বিস্তৃতহস্তে ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। প্রণাম করলেন পিতাকে, জননীৰ পদপ্রান্তে জানান প্রগতি, রাজ-পুত্রীৰ প্রতিটি কর্মচারী, প্রতিটি ভৃত্যের কাছে বিদায় গ্রহণ করলেন। অবশেষে এসে উপনীত হলেন নিজ নিকেতনে মাত্রীৰ কাছে বিদায় নিতে। বাজাদেশের কথা এখনও কেউ তাঁকে জ্ঞাপন করতে সাহসী হয় নি তখন,

[illegible]

বিশ্বাস্তব তখন প্রত্নতত্ত্ব কবেন :

শীলবান ব্যা ও য ও হ ব ০ ০
 যি। যা পাহাও যো ।। ৮ ৬ ২ ৩ ।
 দানি ভিন্ন অণ্য কো। হানে ৮ শিণ
 নিরাপদে ক্ষেত্রে • 'নদ্র মন
 পুত্রগণে বব মেরা ওও বা। ওব
 হইবে। অতঃপর, পবিচয়া তান
 করিও যতনে, মাদ্রি, বাযে বাক্য মনে ।

এ বাজ্য হইতে আমি কবিলে প্রশ্ন
যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত না হয় কোন জন
চান তব ভর্তা হতে, ভর্তা মনোমত
নিজেই খুঁজিয়া লবে । বিরহে আমাব
না যেন শুকায়ে যায় ও বরাদ্দ তব ॥ ৬৭ ৬৮ ॥

সুস্মিতা মাদ্রী বলেন—আপনি এ-সব কী বলছেন প্রভু ? কী হয়েছে ?

(১) ফোসফোরাস সম্বন্ধিত 'জাতক'খণ্ডে ন মক পুত্র পালিত বায় লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিসহ যৌথ মহাশয় কর্তৃক
 আনুগত্য প্রদান।

(৩) পরমাণব 'হিতার' ন'ই' মতে পত্রজিহে প্রাক' স্মৃতি'।

আর সত্যগোপনের প্রচেষ্টা নিরর্থক বুঝে বিশ্বাস্তর বলেন—সকলেব কাছেই আমি বিদায় নিয়ে এসেছি, প্রিয়তমে! রাত্রি প্রভাতে আমি রাজাদেশে নির্বাসনে চলে যাব।^১ তুমি প্রসন্নমনে আমাকে বিদায় দাও, শুচিস্থিতে!

মাদ্রী এতক্ষণে আত্মস্থ হলেন, অতি দুঃখও তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটে ওঠে বিচিত্র এক হাস্যরেখা, বলেন—আমি তো দানবীব নই যুবরাজ, যে প্রার্থনামাত্রেরেই প্রার্থীকে বিদায় ‘দান’ করব।

বাজপুত্র ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বলেন—কিন্তু বিচ্ছেদ যখন অমোঘ, তখন প্রসন্নমনে বিদায় দেওয়াই তো বিধেয়?

মাদ্রী বলেন—না! আমি আপনাকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করতে পাবব না। আপনার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন যুববাহু! আপনি সম্ভাবক, বলেছিলেন আমাকে হাপ বনে বনে চলে যাবেন না।

নিম্নিত রাজপুত্র বলেন—তুমি ভুল করছ মাদ্রী! আমি তো স্বেচ্ছায় সন্ন্যাস নিয়ে বনে ফেতে চাইছি না। এ যে রাজদণ্ড!

যুক্তকরে মাদ্রী বলেন—সত্যনক্ষা করেও সে দণ্ডাদেশ পালন করতে পাবেন আপনি, যুববাহু! সেই দণ্ডের ভাগ আমাকেও গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করুন। স্বামীর সমস্ত কিছুবই অধাংশ স্বীকৃত! আমিও আপনার সঙ্গে নির্বাসনে যাব।

—কিন্তু আপনার জীবন যে দুবিসহ দুঃখের!

—না! আপনার বিবহ-যজ্ঞনা ভোগের অপেক্ষা নয়।

—কিন্তু আমাদের নাগালক সন্ধান ছুটি? তোমার ছুটি নয়নের মণি? জালী এবং কৃষ্ণাজিন?

—তাবাও অনুগমন করবে তাদের জননীরে।

—ওরা যে দুষ্কপোষ্য শিশু, মাদ্রী!

চন্দ্রল দীপশিখার মত যুক্তকরে উঠে দাঁড়ান মাদ্রী, স্থির সংযতকণ্ঠে বলেন—সত্যনিষ্ঠ যুববাহু, আপনার সমাচরণে আমি কখনও প্রতিবন্ধক হই নি। আমাকেও স্বধর্ম অনুসরণে আপনি বাধা দেবেন না, এই আমার একান্ত মিনতি।

—কী তোমার সেই ধর্ম, মাদ্রী?

—স্বামীপুত্রের সেবা।

সংযাত্মক বিশ্বাস্তর আর বাধা দেন নি।

পরদিন অশ্চর্যকর-যোজিত রাজবথে যুববাহু সম্মীক ও সপুত্রকণ্ঠা নিষ্ক্রান্ত হলেন বাজপুত্রী থেকে। অর্গলবদ্ধগাত্র যুধাতুরা পৃথতী জানতেও পাবলেন না, দ্বাবপ্রান্তে প্রণাম

(১) জাতকের কবি এখানে মাদ্রীর মুখে হিমালয়ের অতিদীর্ঘ বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। বন্ধ যেমন ‘মার্গে তাবক্ষুণু’ বলে দীর্ঘ পথের বর্ণনা দিয়েছিল ‘সমেশং মে হৃদয়’ বলে, মাদ্রীও তেমনি জাতক-কবিকে এখানে হিমালয় বর্ণনার সুযোগ দিয়েছেন।

করে গেল কারা। অমৃতপ্ত প্রজাবৃন্দ সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজপথে। এই মুহূর্তটিতে ওরা ভুলে গেছে, পূর্বদিন ঐরই বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজদরবারে অভিযোগ এনেছিল ওরাই।

নগরসীমান্তে বাধা পেয়ে বিশ্বাস্তুর রথ রক্ষা করেন। চারজন ব্রাহ্মণ অগ্রসর হয়ে এসে বলেন—শতদানের সংবাদ পেয়ে ওরা দূর দেশ থেকে আসছে। বিশ্বাস্তুর সখেদে বলেন—আজ আমি যে নিঃশ্ব ভাই! কি দিতে পারি বল, তোমাদের?

প্রার্থীদের মুখপাত্র অগ্রসর হয়ে এসে বলেন—আমাদের চারজনকে আপনার রথের চারটি অশ্ব দান করুন।

উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন বিশ্বাস্তুর। ঠিক কথা! এ-কথা তো মনে ছিল না।

অতঃপর পদব্রজে যাত্রা। মহাসত্ত্ব বিশ্বাস্তুর রাজবধু মাদ্রীকে তখন বলেন :

তুমি কোলে লও কৃষ্ণাজিনারে এখন ;

ছোট সেই লঘুভার ; জানী বড় ভার,

সেহেতু তাহার আমি লইলাম ভার ॥ ২১৮ ॥

পুত্রকন্যাকে ক্রোড়ে তুলে নিয়ে দুর্গম পথে যাত্রা শুরু হল সেই দুজন ভাগ্যহতের, রাজবৈভবের প্রাচুর্যের মধ্যে অতিযত্নে এতকাল যাঁরা বাস করে এসেছেন।

অবশেষে হিমালয়ের পাদদেশে বহু পর্বত! এখানেই বনবাসে কালাতিপাত করবেন মহাসত্ত্ব। অবাক্বিস্ময়ে মাদ্রী দেখতে থাকেন সেই ভয়ঙ্কর অরণ্যকে। স্থাপদ-সঙ্কুল এ গহন অরণ্যে কেমন করে নানুস করে তুলবেন তাঁর সেই নয়নের ছুটি মণিকে? কেমন করে বাঁচিয়ে রাখবেন ধর্মনিষ্ঠ স্বামীকে? তবু দুর্ভাগ্যের কাছে নতিস্বীকার করেন না মাদ্রী। বোধিসত্ত্ব দিবারাত্র ধ্যানমগ্ন, আর অতন্দ্র সাধনায়, ছুটি শিশুর সাহায্যে সেই গভীর অরণ্যে একটি পর্ণকুটির নির্মাণ করেন রাজবধু মাদ্রী। বিশ্বাস্তুর উদাসীন, নিম্পৃহ—আহার্য তাঁর হাতে তুলে দিলেও তিনি আহার করতে ভুলে যান, দান করে দেন খাও। অবশ্য, এ গহন অরণ্যে প্রাণীর ভীড় নেই, তবু আহার্য তো সংগ্রহ করে আনতে হবে। বিশ্বাস্তুর উপাসনা করেন, পান করেন, শিশু-সন্তান ছুটি খেলা করে বন-কুরঙ্গের সঙ্গে, আর নিরলস পরিশ্রমে রাজবধু মাদ্রী উদয়াস্ত আহার্য সংগ্রহ করেন। পার্বত্য শ্রোতস্বিনী থেকে নিয়ে আসেন পানীয় জল, ফলবান বৃক্ষ থেকে আহরণ করে আনেন বনজ ফল। দিবসান্তে কুটিরে প্রত্যাবর্তন করে দেখেন ধ্যানমগ্ন বিশ্বাস্তুর বসে আছেন নিবাত-নিষ্কম্প দীপশিখার মত, আর শিশু-সন্তান ছুটি খেলা করছে পর্ণকুটিরের অদূরে। মাদ্রীর পদশব্দে খেলা ফেলে ছুটে আসে জালী ও কৃষ্ণাজিন। সমস্ত দিন অদর্শনের পরে জননীর সান্নিধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওরা। আর কোন বাধা মানে না, আর কোন কাজ করতে দেয় না মাদ্রীকে। মাদ্রীও সমস্ত দিনের পরিশ্রমের কথা ভুলে যান—এই অন্তর্মুগ্ধ-উদ্ভাসিত সাক্ষ্য মুহূর্তটিই ওঁর দিবারাত্রির নিরলস পরিশ্রমের ফলশ্রুতি। শিশু-সন্তান ছুটিকে বুকে টেনে নেন, হাত বুলিয়ে দেন মাথায়, গল্প বলেন।

ক্রমে গভীর হয়ে আসে আরণ্যক রাত্রি। নিশাচর প্রাণীর পদধ্বনি শুনতে পাওয়া

যায় তখন। মাদ্রী আহাৰ্য বণ্টন করেন। স্বামীপুত্রের আহারান্তে অবশিষ্ট কিছু থাকলে মুখে দেন।

কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতা মন্দভাগিনী রাজবধুর ললাটে এটুকু সুখও লেখেন নি। একদিন দিবসান্তে বনান্তর থেকে আহাৰ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে মাদ্রী দেখেন কুটিরের সম্মুখে ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন বিশ্বাস্তর, তাঁর চরণপ্রান্তে হরিণ-শিশু দুটি সাথীর অভাবে নিদ্রামগ্ন।

চিন্তাধিতা হলেন মাদ্রী, কুটিরের চতুষ্পার্শ্বে অন্বেষণ করতে থাকেন; কিন্তু শিশু দুটির কলকণ্ঠ শুনতে পেলেন না কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল এ বুঝি শিশুসুলভ কোন খেলার ছল। জননীকে চমকিত করে দেবার উদ্দেশ্যে ওরা বুঝি কোন পত্রাত্মবালে লুকিয়ে আছে। উৎকণ্ঠিতা মাদ্রীর মনের কথা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন জাতককার :

পূলাবালি সব অঙ্গে মাখিয়া বাছারা
দুটিয়া আনন্দে মোরে বেষ্টি এ সময়।
আজ কেন তাহাদের দেখা নাহি পাই ?
অরণ্য হইতে এসে আসিতাম ফিরি
দূর হতে দেখি মোরে ছুটে আসি স্বরা
ধরিত জডায়ে।...তবে, আজ কোথা তারা ?
হৃদে পূর্ণ হইয়াছে স্তন্যয় মোর ;
বিপত্তি শঙ্কার মোর বুক কাটি যায়
জালী, কৃষ্ণা, অভাগীর নয়নের ধন,
দিতেছে না দেখা কেন আজ এতক্ষণ ? ॥ ৫৫২ ॥

বারংবার নাম ধরে ডাকার পরেও যখন কেউ সাড়া দিল না, তখন এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বিচলিতা হলেন মাদ্রী। সহসা তাঁর লক্ষ্য হয় নিদ্রিত হরিণ-শিশুর মুদ্রিত চক্ষুপ্রান্তে অশ্রুবিবিন্দু। যা কখনও কবেন নি তাই কবে নাসেন মাদ্রী; অকালে ধানভক্ষ করলেন যুবরাজের বালেন ওরা কোথায় ?

শান্ত্রি গবিচলিত কণ্ঠে বিশ্বাস্তর বলেন - ওবা তো নেই !

—নেই ! সে কি ! কোথায় তাবা ?

—আজ একজন ব্রাহ্মণ এসেছিল ! ভিক্ষা চাইল সে। আমি তাকে বললাম, আমি নিঃস্ব বনবাসী তপস্বী, কি দিতে পারি তোমাকে ? ব্রাহ্মণ তখন জালী আর কৃষ্ণাজিনকে নির্দেশ করে বললে এই দুটি শিশুকে আপনি দান করে দিন, ক্রীতদাসরূপে এদের বিক্রি করলে—

চীৎকার করে ওঠেন মাদ্রী—ক্ষান্ত হন যুবরাজ ! আর বলবেন না। বাকিটুকু আমাদের অনুমান করে নিতে দিন !

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছিলেন মাদ্রী, সে নিষ্ঠুর কাহিনীর বর্ণনা পাঠ করা যায় না :

জালী ও কুশাজিনার	হাত ধরি বিশ্বাস্তব	ব্রাহ্মণেবে করিলেন দান
দিলেন তাহাই তিনি	সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যাহা	ছিল তার যে দুটি সন্তান।
স্বতন্ত্রতা উভয়কে	ব্রাহ্মণেবে দান যেন	ক যেনে হৃষ্টমনে তিনি,
হেঁবি এ অদ্ভুত ত্যাগ	শিহরিল সর্বশোক	দানতেজ কাঁপিল মেদিনী ॥ ৪৬৫ ॥

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ আনিল তখন	দাত দিয়া লতা করিয়া ছেদন।
লতার আঘাতে দুজনে তাড়ায়	কান্দিল তাহাতে শিশু দুটি হায়।
বারি রজ্জুপাশে দণ্ডের আঘাতে	শিশু দুটি সেই যায় তাড়াইয়া।
এ দারুণ দৃশ্য অবিকৃতমনে	লাগিল দেখিতে বাজা ঢাড়াচয়া ॥ ৪৬৮

ঈশানচন্দ্র ঘোষ মশাই লিখেছেন।

অতঃপর কুমার ও কুমারীর দেহে যে যে স্থানে আঘাত লাগিল, সেই সেই স্থানেই চর্ম ছিঁড়িয়া গেল ও বক্ত বাহির হইল। প্রশ্নবোঝা তাড়নায় নাহি ভয় পাইয়া দিঠাপিঠি হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। অতঃপর এক বিষম স্থান দৃশ্য হইল। ব্রাহ্মণের পদতলন হইল এন মে আছাড় খাইয়া পড়িল। অমনি শিশু দুইটির বোমল হস্ত হস্তে ম করি ললাপাতা খুঁসিয়া গেল তাহারা কান্দিতে কান্দিতে সেই মহাসত্বের নিকট উপস্থিত হইল :

ব্রাহ্মণের হস্ত হতে মুক্তিলাভ করি
শিশু দুটি ফিরি গিয়া মাশ্রমে হায়,
পিতার নিকটে তাঁর মুখপানে চায়।
অথথপত্রব মত কাঁপিতে কঁ পিতা
পিতার চরণে তাঁর পদিল বন্দন।
প্রণামি করিল দান এতক বচন :
“মা নাই আশ্রমে এবে, তব বাবা তুমি
দিতেছ এ ব্রাহ্মণেব আমা দুইজনে।
ক্ষণক অপেক্ষা কর, মা আসুন ফিরি
দেখি লোক একবার জনমেব মত।
ক য শোনে ব্রাহ্মণ , অ . পব দান।

এ মহানিষ্ঠব ধন পপাসু ব্রাহ্মণ
কান্দিয়া প্রহাণ করে সন্তান ভোগায়,
বান্ধি সঙ্গে যায় এক এক গায়ে যেমন
পাপি মমাসুভাবে তুমি ওদাসীন।
কুষা তো নিতান্ত শিশু দুঃখ সে জানে না,
যুথভ্রষ্ট হবিণ পোতক যেকপ
সুস্থতবে কান্দে, বাবা কুষাও তেমনি
কান্দিতেছে, মবিবে সে না পাইলে মাকে।
তাবে শুধু থাকিবাবে দাও অনুমতি। ৪৭০—৪৭২ ॥

তাই ভাবছি, ঠিকই বলেছিলেন মাদ্রী : ক্ষান্ত হন যুবরাজ ! আর বলবেন না, বাকিটুকু আমাকে অনুমান করে নিতে দিন !

ধূলায় লুটিয়ে পড়েন মহারাজ সঞ্জয়ের আদরিণী পুত্রবধু ।

সাস্তুনা দেবার জন্য এগিয়ে আসেন বিশ্বাস্তর । ভূমিশয়া থেকে মন্দভাগিনীকে উত্তোলন করবার জন্য বাড়িয়ে দেন দুটি হাত । মাদ্রী বিহ্বলপৃষ্ঠার মত উঠে বসেন, বলেন : আমাকে সাস্তুনা দেবার কোন চেষ্টা করবেন না যুবরাজ ! স্পর্শ করবেন না আমাকে ! আমার সাস্তুনা আমি নিজেই খুঁজে নেব ।



চিত্র--৬৯

শিবি-জাতক—মহারাজের চক্ষু উৎপাটনের পরের দৃশ্য

অবস্থান—১৭২৫

মহাসত্ত্ব সংগেদে বলেন : আজ তোমার বড় দুঃখের দিন, মাদ্রী !

বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে মাদ্রীর বিশীর্ণ ওষ্ঠে । বলেন— কিন্তু আজই যে আপনার বড় সুখের দিন, প্রভু ! আজই যে আপনার জীবনের শ্রেষ্ঠ উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হয়েছে !

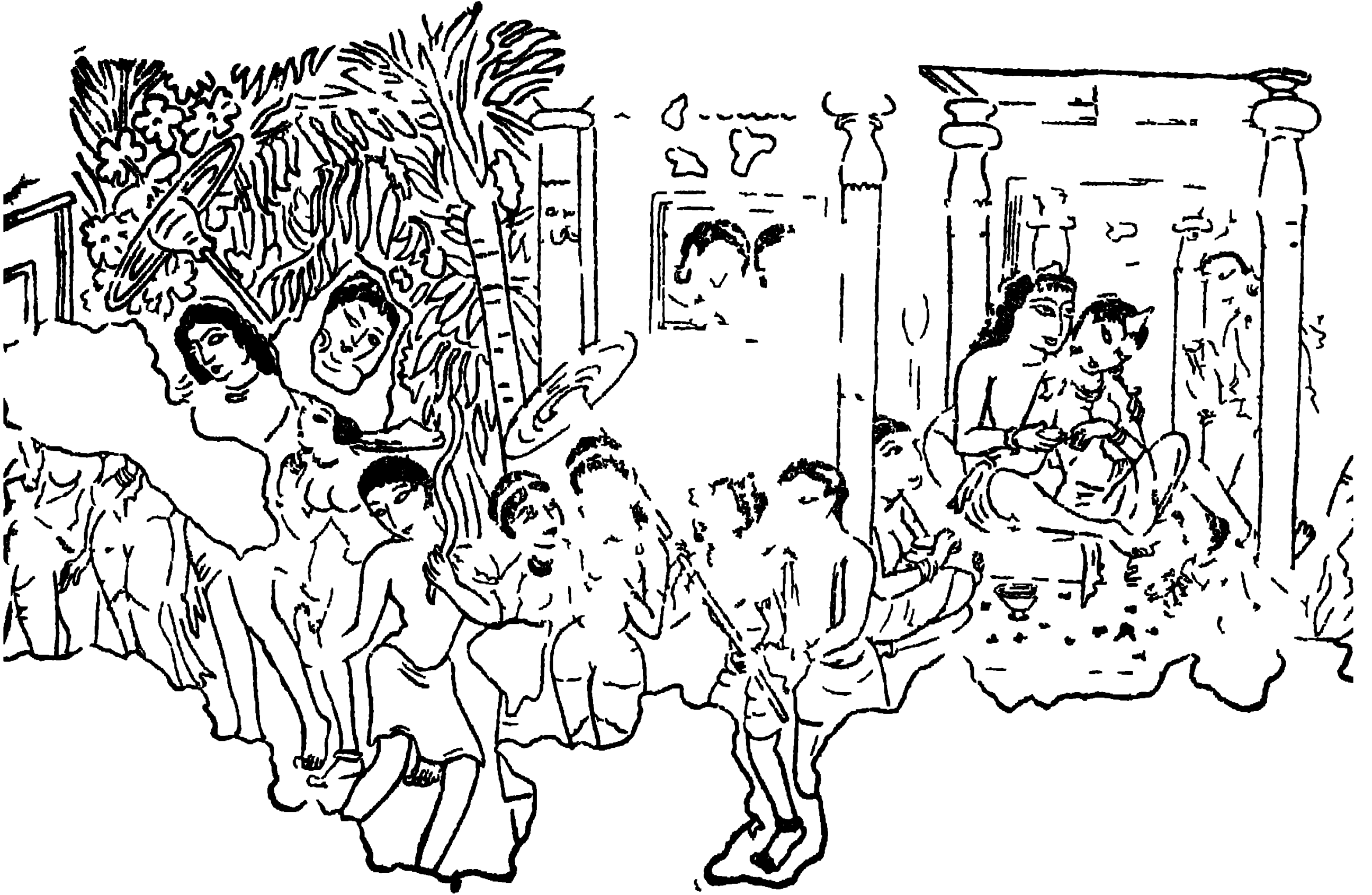
বিস্মিত বিশ্বাস্তর বলেন : কী সেই উচ্চাভিলাষ, মাদ্রী ?

—মহানুভবতায় আপনার পিতামহকে অতিক্রম করা । মহারাজ শিবি শুধু নিজের দুটি চক্ষুই দান করেছিলেন । আপনি তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন । দানের উন্মাদনায়

ইতিপূৰ্বেই অন্ধ হয়েছিলেন আপনি, আজ তত্পৰি উৎপাটন কৰেছেন আপনার ধৰ্মপত্নীৰ ছটি নয়নেৰ মণি।^১

কাহিনী-চিত্ৰ এব পৰ এগিয়ে গেছে জালী ও কৃফাজিনেৰ পথৰেখা ধৰে। এবাৰ সেই কাহিনী-চিত্ৰ এব প্ৰসঙ্গে আসা যাক :

কিন্তু কাহিনী-চিত্ৰেৰ স্বেদেও বিশ্বাস্তবেৰ পিতামহেৰ চিত্ৰটিৰ কথাই প্ৰথমে বলে নিত হয। এই চিত্ৰটিতে (১৭১৫) দেখতে পাচ্ছি ব্ৰাহ্মণকে চক্ষু দান কৰাৰ পৰে শিবিবাজাৰ অবস্থা। মহাৰাজা বসে আছেন একটি চন্দ্ৰাতপেৰ নীচে। অসীম যত্নগায় তিনি বাম হাতে চেপে ধৰেছেন নিজেৰ চোখ, কিন্তু তাঁৰ উপবেশনেৰ ভঙ্গিতে বাজাচিত মৰ্যাদাৰ অভাব নেই। মহাৰাজেৰ সন্নিবটে বাঘাছন বানী, একজন সভাপতি এবং আৰণ একজন পুৰকাৰিনী। মন্ত্ৰীৰ হস্তেৰ মুদাটি লক্ষণীয়। চিত্ৰটি বাগাব লুপ্তপায়, এব অল্পসংখ্যক



চিত্ৰ ৭০ : বিশ্বাস্তবেৰ বিদায় দৃশ্য

অবস্থান - ১৭১১ ও ১৭১২

বেখাৰ ভগ্নাংশ থেকেই চেনা যায় শিল্পীৰ দরদ-ভবা তুলিকে। এই অনবদ্য চিত্ৰটি শিল্পী মিস্ ডৰোথি লাৰ্চাৰেৰ অনুসৰণে এখানে সংযোজিত কৰলাম (চিত্ৰ ৬৯)।

বিশ্বাস্তৰ জাতকেৰ শুক বাহিৰেৰ অলিন্দেৰ বামপাৰ্শ্বে— সেখানে দেখাছি (চিত্ৰ—৭০)

(১) শাস্ত্ৰাৰ্থাৎ বুদ্ধ দৰ এই জাতিৰ কাহিন বাণী কৰাৰ পৰা শ্ৰোতৃবৃন্দ তাকে শ্রদ্ধা কৰেন—ভগবন এই কাহিনতে আপনি ভিলেন বোধিসত্ত্ব বিশ্বাস্তৰ অন্ত সকলে কে? বুদ্ধদেব উত্তরে সেই 'সমবধান' এইভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন : দেবদত্ত সেজনে ছিল জুজুক, রাজা শুদ্ধোধন ছিলেন রাজা সঞ্জয় মহামায়া ভিলেন পুৰতী, রাহুল ছিলেন জালী, অগ্ৰশাবিকা উৎপলবৰ্ণা ছিলেন কৃফাজিন এবং রাহুল-মমতী ছিলেন মাতী।

একটি মণ্ডপে মূৰ্ছাতুৰা মাদ্ৰীকে যুববাজ সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ছুজনে বসেছেন একটি পালঙ্কে। একটি ভৃত্য ভূঙ্গাব বাড়িয়ে ধবেছে যুববাজেৰ দিকে। যুববাজেৰ হাতে একটি চষক, তাতে কোন ঔষধ অথবা স্নুবা। বৰ্তমানে যুববাজেৰ আলেখাটি বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু মাদ্ৰীৰ মুখসৌন্দৰ্য প্রায় অটুটই আছে। তাৰপৰ দেখছি বিশ্বাস্তব ও মাদ্ৰী বাজপ্রাসাদ ত্যাগ কৰে যাচ্ছেন। একজন ছত্ৰধাৰিণী মাদ্ৰীৰ মাথাৰ উপৰ ছত্ৰ ববে আছে। শতদান উৎসবে একজন ভিক্ষুক এসেছে—তার হাতে একটি বক্ষিম যষ্টি। পিছনেৰ গবাক্ষে দেখতে পাচ্ছি মহাবাজ সঞ্জয় ও বানী পৃষতীকে। পুত্ৰ ও পুত্ৰবধূৰ বিদায়-যাত্ৰা দেখছেন তাঁৰা।

বিহাবেৰ ভিতৰে (১৭১১ এবং ১৭১৬-ক) দেখছি শতদানেৰ দৃশ্য। রাজপুত্ৰ একজন প্রার্থীকে নিজ ওববাৰি দান কৰছেন।...উপৰে কলিঙ্গ দেশ থেকে ছুভিক্ষ-পীড়িত প্রজাবৃন্দ এসেছে যুববাজেৰ কাছে (১৭১৬-খ)। তাৰেৰ চুল-বাধাৰ বীতি উৎকলদেশীয়।

নীচে দেখছি, নিবাসন-দণ্ড পাওয়াৰ পৰ যুববাজ এসেছেন জননীৰ মহলে (১৭১৬-গ)। নতজানু হয়ে বসেছেন তাঁৰ পদপ্রান্তে। পৃষতীৰ মুখে কাকণ্য ও বিষাদেৰ অপূৰ স মিশ্ৰণ। পাশেৰ প্যানেলে মহাবাজাৰ কাণ্ডে যুববাজ বিদায় নিতে এসেছেন। মহাবাজাৰ দক্ষিণহস্তটি অক্ষত নেই—কিন্তু তাৰ সিংহাসনে উপবিষ্ট ভঙ্গিটিতে রাজোচিত মৰ্যাদাৰ বাঞ্ছনা। দৈহিক ভঙ্গিতে তিনি কঠোৰ গ্ৰায়াধীশ, অথচ তাঁৰ ছুটি নয়নে বিষাদেৰ মূৰ্ছনা। একই আলেখ্যে দুটি বিপৰীত ভাবেৰ বাঞ্ছনায এ চিত্ৰটি অনবচ্ছ।

পানপ্রান্তেৰ অৰ-হস্তে (পিলাস্টাবে) বাজবন-মাদ্ৰীৰ কাছে এসেছেন বিশ্বাস্তব।

এখানে একটি শিল্প-চাতুৰ্য লক্ষণীয়। মাদ্ৰী ও বিশ্বাস্তব একই সভামণ্ডপে আছেন, কিন্তু ওঁদেৰ আলেখ্য দুটি প্রাচীৰেৰ একই সমতলে আকা নহ। পিলাস্টাবেৰ খাঁজে মাদ্ৰী ও প্রাচীৰে বিশ্বাস্তব যেন মুখোমুখি, অথচ দুজনেৰ মাঝখানে আসন্ন বিচ্ছেদেৰ প্রতীক এই সমকোণটি (১৭১৬-ঘ)।

এৰ পাশে অথবা নীচে সম্ভবতঃ শতদানেৰ একটি দৃশ্য ছিল সেটি নষ্ট হয়ে গেছে। পৰেৰ দৃশ্যে দেখছি, বথাকাত বাজপুত্ৰ চলেছেন সম্ভাৰ বাজপুত্ৰ দিয়ে পিছনেৰ আসনে দুটি শিশুসন্তান বথ চলেছে বাজাৰেৰ গান্ধান দিয়ে (১৭১৬-ঙ)। পাশাপাশি তিনিটি দোকান। ছন্ধ-বিক্ৰেতা তাৰ পাত্রটি বেখে বিদায়ী যুববাজৰে যুক্তকৰে নমস্কাৰ কৰছে। পৰেৰ দোকানটিতে একজন তেল-বাবসায়ী পাত্ৰে তেল ঢালছে, তৃতীয় বিপণীতে দোকানদাৰ দাঁড়িপাল্লায় কিছু পণ্যদ্রব্য ওজন কৰছে। দোকানখাল দ্বিতল-গৃহেৰ একতলায়। উপরে বাতায়নে এব অলিন্দে পুৰ্ণকাৰ্মিনীদেৰ ভীড। বথেৰ সম্মুখে চাৰজন প্রার্থী, তাৰেৰ পোশাক, শিৰস্ত্ৰাণ ও দেহাক্ৰান্তি বিভিন্ন। একজন সম্ভবতঃ মঙ্গোলীয়।

পৰেৰ দৃশ্যে দেখছি, বাজপুত্ৰ সপরিবাবে ভূতলে দণ্ডায়মান (১৭১৬-চ)। ব্ৰাহ্মণকে তিনি অশ্ব দান কৰছেন। বাজপুত্ৰেৰ হস্তে কমণ্ডলু—সৃষ্টবতঃ, তিল-গন্ধাদকে শাস্ত্র-সম্মত দান কৰছেন তিনি। এ দৃশ্যেও চাৰজন পথিক। তাৰেৰ কেউ দুঃখিত, কেউ অনন্দিত।

উপবি-লিখিত বৃহৎ প্যানেলের নীচে বস্তু পৰ্বতে বাজপুত্ৰেৰ আৰণ্যক জীবনেৰ



চিত্র ৭১

জুজুক কতক জালা ৭ কুম্ভাজিনেৰে পাননা

অবস্থান—১৭২৬ চ ও ১৭২৬ চ এৰ মধ্যবৰ্তী অংশ

৭১)। এই তিনিখানি চিত্র যেন তিনিটি বস্তুৰে সজা হৈছে। পৰ্বতৰ ওপৰত বসন্তৰ সময়ত পৰ

তিনিটি অনবদ্য চিত্র ছিল। দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিত্রগুলি প্রায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। অতি আবহাওয়াভাবে দেখা যায়। প্রথম চিত্রে ছিল, মাদ্রী গবণো ফল আহৰণ কৰিছিল। মাদ্রীকে পাশাপাশি কয়েকবার ধাক্কা হৈছে। অর্থাৎ শিল্পীৰ বক্তব্য নাজবাব এ কাজটি হয়ে পড়েছিল নিতাকন-পদ্ধতিৰ অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় চিত্রে জুজুক নামে এৰ জন লোভী নিষ্ঠুৰ ব্রাহ্মণ পণ্ডুটিৰেৰে দাবপ্ৰাপ্ত হৈছে জালী ৩৭ মাজিনকে ভিক্ষা চাইছে। (চিত্র ৭২)। তৃতীয় চিত্রে দেখা হৈছে, সেই নিদানৰ দুঃখময় সন্ধাবালৈ। এটা কুটিৰেৰে সম্মুখে ভাঙতলে বাস কৰি মাদ্রী আৰু প্ৰস্তুবাসনে এৰ সম্মুখে উপবিষ্ট, বিশ্বাস্তব (চিত্র



চিত্র ৭২

বিশ্বাস্তব মাদ্রীকে মহাদানেৰ কথা জানাচ্ছেন

অবস্থান—১৭২৬-চ ৭ ১৭২৬ চ এৰ মধ্যবৰ্তী অংশ

কাবো-উপেক্ষিতা নান্দে। ভাগ কবে 'ব পন চিত্রের মিছিল এগিয়ে চলেছে
জুজুক-এব পদাঙ্ক অনুসরণ করে। ক্রম বাত্রি গভীর হয়ে আসে। স্থাপদ-ভীত নিষ্ঠুর
জুজুক স্বয়ং বৃক্ষে আশ্রয়ণ করে, অথচ হাস্যময় শিশুটিকে ফেলে বাখে ভয়ঙ্কর অরণ্যে,
ভূতলেই ১০০০ প্রাণ ভয়ে ভীত দুটি শিশু অরণ্যে বোদন বনছে। দেবরাজ ইন্দ্র কুপাপবশ
হয়ে বিশ্বাচর্য্যব কপ ধনে আবিভূত হইয়াছেন। পিতাকে দেখতে পেয়ে
আশ্বস্ত হয় শিশু দুটি নিশ্চিন্ত ওনা বুঝিয়ে পড়ে পিতৃকপী ইন্দ্রের ক্রোড়ে।
নিশাবসানে বৃক্ষচূড় থেকে অবনোহন করে জুজুক শিশুদের কাছে শোনে, রাতে
তাদের পিতা এসেছিলেন। ভয় হয় লাভী ব্রাহ্মণব--কি জানি যদি পিতৃস্নেহ
সে পুত্রকল্যাণে যত্নে নিত চায়? অতএব বদ পবিত্র এলাকা পার হয়ে জুজুক
অন্তর চলে যায়। শিশু দুটি পলে, সে শিশু দুটিকে বিক্রী করে দিতে চায়, কিন্তু
এতটুকু শিশুকে কে খোঁজদাস করত চাইবে? পথে পথে ফিরছে ব্রাহ্মণ দেশ-দেশান্তরে,
তান সঙ্গে ফিরছে দুটি হতভাগ্য রাজার সন্তান। 'বিন্দু' অবশী, উজ্জয়িনী, কিন্তু জুজুক-
এব পত্যাশা অনুযায়ী মল্য দিতে কেউই স্বীকৃত হয় না। চিত্র-নাটকের শেষ অঙ্কে
দেখছি, এব মহাজনপদে পানেশ্বর। তারদ্বারে নগরপাল তাকে আটকেছে, বলছে—এই
দেবশিশু দুটি, তা হোঁচকার সন্তান নয়। তাহা ১০০০ জন করেও এদের?

[illegible]

ଜୀବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସାବ୍ୟସାବ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଅଛି

১. কে জান বনেছে তোমার

ॐ नमः शिवाय ॥ १० ॥ ॥ ॥

ଏ ପାଠ୍ୟରୁ କୁହା ଯାଏ, ଯଦିବାଜ,

এই দুই শিল্প, ৭৭৭ ৭৭৭ মোল দাস । ৭৭৭ ॥

(১) মিস লার্চারের ফ্রেচ লেডি হার ও 'ম কর্তৃক সংগঠিত এবং উপর্য উপর্য সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা।

: নাম জানি না, তবে সে লোকটি এই ছুটি সন্তানের পিতা।

শুনে সভাস্থ সকলে অট্টহাস্য করে ওঠে! একবাক্যে সকলে বলে,—এ সম্পূর্ণ অবিদ্যাস্ত্র কাহিনী। পিতা হয়ে সন্তানকে কেউ ক্রীতদাসরূপে দান করতে পারে?

কিন্তু মহাবাজের কর্ণকুহরে সে-কথা প্রবেশ করে না। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেছেন। সত্য বটে, পিতা হয়ে কেউ সন্তানকে দান করে না, কিন্তু এ সমাগরা পৃথিবীতে কখনও কখনও ব্যতিক্রমই যে নিয়মের পরিচায়ক। এ বিচিত্র দুনিয়ায় অসম্ভব: একটি মানুষের কথা মহাবাজ মর্মে মর্মে জানেন, যাব পক্ষে এ অসম্ভবও সম্ভব।

অমাত্যবর্গ একবাক্যে বলে —মিথ্যাচারী প্রবঞ্চক নাক্ষত্রকে শাস্তি দিন মহাবাজ।

সে-কথায় কর্ণপাত না করে মহাবাজ নগরপালকে বলেন—সেই শিশু দুটিকে সভায় নিয়ে এস প্রথমে। তাদের কথা না শুনে আমি তো একে শাস্তি দিতে পারি না।

বজাদেশে বুলিমলিন ছুটি দেবশিশু প্রবেশ করে মণি-দাপিত সভাকক্ষে। দর্শনমাত্র সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন সত্যনিষ্ঠ মহাবাজ সঞ্জয়:

তপ্ত কাঞ্চনের গায়	মুখখানি শোভা পায়
কে ঐ আসিছ হেথা? দেহের বরণ	
স্বর্ণ নিকসমোজ্জল	উক্কা মুখবৎ দীপ্ত
জান কি গোমবা (কহ) ও বার নন্দন?	
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোভা	উভয়বই মনোলোভা
উভয়েই এক রূপ আকারে প্রকাষে,	
একটি জালী ব মত	অপরটি কৃষ্ণ যেন
এল কি বাছাবা দিবে এতদিন পবে? ॥ ৬৫০-৬৫১ ॥	

অন্তঃপুর থেকে ছুটে আসেন মহাবানী। এ যে তাঁদেবই হাবানো মানিক। শিশু দুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রুতে ভেসে যান মহারাজাধিবাজ সঞ্জয় আর মহাবানী পৃষতী (১৭।১৬-১৭)।

চিত্রের পব চিত্র একে সবশেষে এত অনবদ্য মিলনদৃশ্যে জাতক কাহিনীকে শাস্বত করে বেখে গেছেন অজস্র-শিল্পী এই সপদশ গুণায়। দেখতি (চিত্র ৭৩), মহাবাজ সঞ্জয় বসে আছেন সিংহাসনে তার দক্ষিণহস্তে একটি প্রসুটিত পুষ্প। তার পাশে সিংহাসনের উপাধানের কাছে কুমারাজন। ৬-পাশে পৃষতী, তার বামে (চিত্র-৭৩-এর বাহিবে) জালী। বজাদেশে বনাগার-বক্ষক জজুক-এর প্রসারিত অঞ্চলে স্বর্ণকলস উজাড় করে দিচ্ছে। গায়নিষ্ঠ মহাবাজ স্বর্ণমূলো ক্রয় করছেন নিজ পৌত্র-পৌত্রীকে।

পববতী চিত্র দেখছি, মহাবাজের আদেশে শোভাযাত্রা করে নিয়ে আসা হচ্ছে যুবরাজ বিশ্বাস্তব এবং মাদ্রীকে। ইতিমধ্যে নির্বাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে তাঁদের। শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যুববাজের অভিষেক।

জাতকের অধিকাংশ চিত্র-কাহিনীই বিয়োগাত্মক। মাহুপোষক-জাতক, চম্পেয়া-জাতক প্রভৃতি যে কয়টি মিলনাত্মক কাহিনী আছে, সে কয়টি তাই বিশেষভাবে ভালো লাগে। সে হিসাবে বিশ্বাস্তর-জাতকে ৫ কাহিনী শেষে দর্শক স্বাস্থ্যের একটি নিখাস ফেলবার সুযোগ পান।



চিত্র ৭৩

বামে নীচে- নগবপাল জুজুক-এব পথবোধ করেছে। দক্ষিণে উপরে রাজসভায়
জুজুক-এব কাছ থেকে স্বর্ণমূলো মহাবাজ জালী ৫ কৃষ্ণাজিনকে কয় কবছেন

অবস্থান—১৭২৫৬

এ নাটক যদি কখনও মঞ্চস্থ করেন, তবে প্রযোজনাবোধে কিছু যোগ ও বিয়োগ আপনি করতে পারেন। শুধু একটি বিষয়ে অভিনয়-শিল্পীর নির্দেশ অতিক্রম করতে পারবেন না। সে হচ্ছে ঐ নির্মূল লোভী জুজুক-এব কপসজ্জা। ওর ঐ শকুনি-নাসা, ছাগলাঙ দাড়ি, ছিন্ন ছত্র আর লুক্ক দৃষ্টি এ নাটকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাই আমার একান্ত অনুরোধ, এমন কোন অভিনেতাকে ঐ ভূমিকাটি কপায়ণের অধিকার দেবেন না—স্বর্ণমূল্যের দর্শনে যাব বিরলকেশ মস্তকে সজ্জাকর কাঁটার মত চুলগুলি খাড়া হয়ে না ওঠে।

সপ্তদশ গুহায় আর একটি জাতক কাহিনী দেখেই এ পর্যায় শেষ কবর আমবা। এ কাহিনীটি হস-জাতক দ্বিতীয় গুহাতেই এ কাহিনীটি আমবা আলোচনা কবেছি। কিন্তু সে গুহায়-আকা ছবিটি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা আমবা সংযোজন কবি নি। এবার এই সপ্তদশ গুহাব সামনের বাবান্দার বমপাশে এ চিত্রটিকে অনেকটা ভালো অবস্থায় পেয়েছি, আর তাই সেটি এখানে সংযোজন কবে দিলাম (চিত্র- ৭৬)।

চিত্রের দক্ষিণদিকে দেখা, রাজ-শিকারী দু'জানক দুটি স্বাক্ষর কবে আনাছে। তাব মাথার উপর অগ্ন্যাত্ত পলায়নপব হংসবলাকা। নামদান রাজদবনাব। কাশীবাজ কং আছেন সিংহাসনে, ঠিক তাব গিড়নেই বানী স্বেমাদনী তাব মাথায় বাজছত্র।

মার পাশেই একজন চামববাদিনী। রাজার সন্মুখে একজন অমান। এবং আশে-পাশে আরও কয়েকজন নবনাবা। রাজদম্পতির সন্মুখে দুটি আসনে দুটি বাজহস। বাধসহ এবং তাব প্রধান সেনাপতি। রাজ কং নবনাব হংসব মৃদাগুলি লক্ষণীয় প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, নৃত্যশিল্পে যখন নিমিত্ত ২৮ কং নিমিত্ত বাধনা আছে, অজ্ঞতা চিত্রের বিভিন্ন চরিত্রও তমনি শুধুমাত্র হংসব নাম নানা নানা ২৮ কং বাধা কবে।



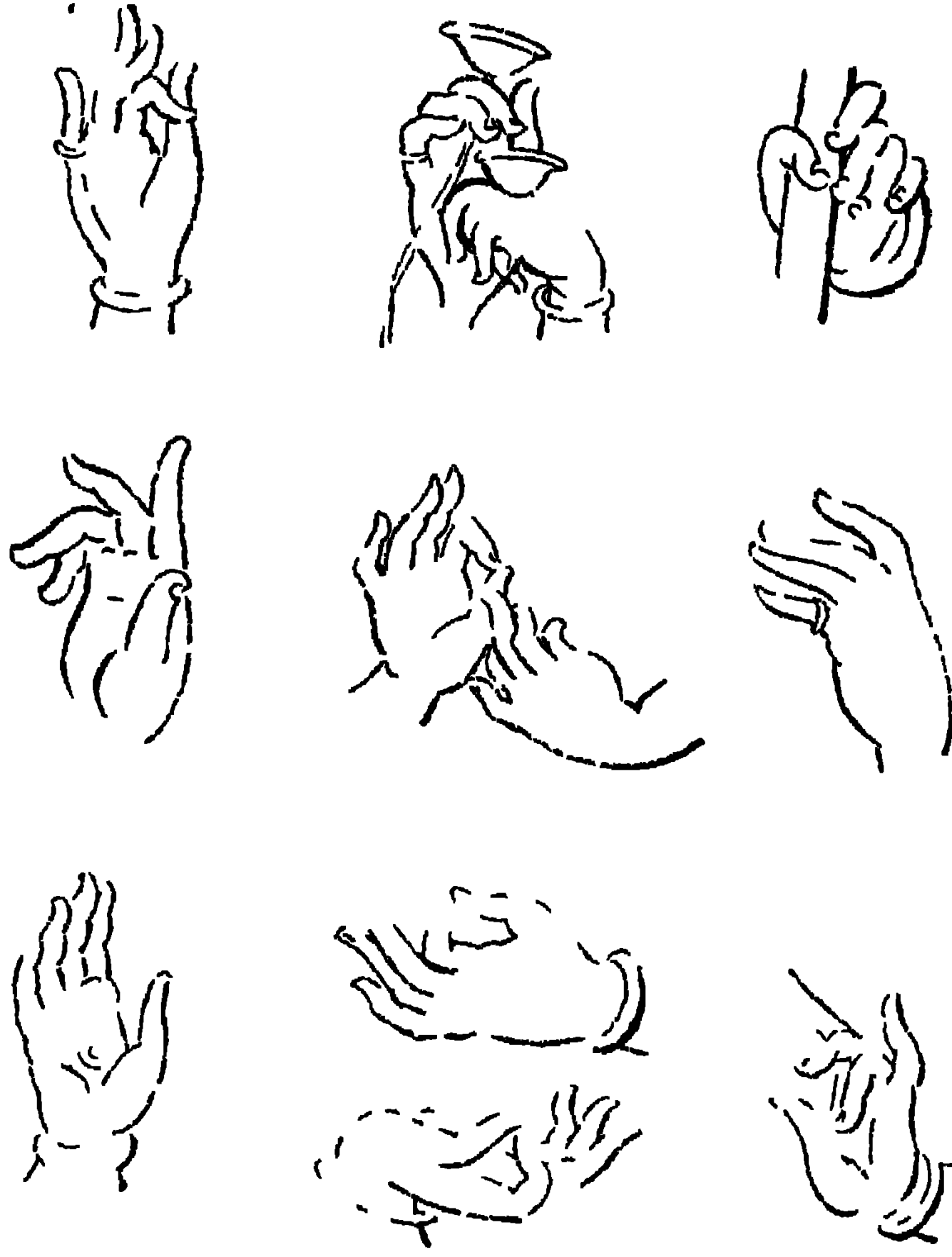
চিত্র ৭৬

হস-৫।৩ক

অবস্থান - ১৭ . ১৬ ১১৩

তাব ভাষা বুঝতে হলে বীতিমত গবেষণা করতে হবে। অজ্ঞতার বিষয়ে বিশেষজ্ঞ জন গ্রিফিথ বলেছিলেন, “অজ্ঞতার শিল্পী গৌক শিল্পের আদর্শের কোন ধার ধারেন না, তাই শবীর-সংক্রান্ত মাপজাপেব নিখুঁত কপায়ণে তাঁকে কখনও ত্রুটিগ্রস্ত হতে হয় নি। মানসচক্ষে বাস্তব দৃশ্য বা বস্তুকে তিনি যে ভাবে প্রত্যক্ষ কবেছেন,

অনায়াসভঞ্জে তাই কপায়িত কবেছেন। টানা টানা নয়নযুগলকে আবণ্ড দীর্ঘায়ত কবাব প্রচেষ্টা যেন সব শিল্পীবই একটা সাধারণ বাতিক, যদিও কোন ইংবাজ দর্শকেব-



চিত্র ৭১

ব্যঞ্জনানাম্য হাতের মুদ্রা

১ চিত্র ৭১ ১ ১ ১ ১ ১

তোথে প্রাচ্যযুগের নাট্যকর্মীরা এ আমন-পাঁতি হয়ে এসেব বিচিত্র হস্তচাক্ষুঃ বোপ কবি আবণ্ড বাডাবাড়ি বলে মনে হুবে। হাতের মুদ্রায় আভিজাত্যের ব্যঞ্জন বিমূর্ত হয়ে ওঠে। ভাবতীয়া জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যাব প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, তার কাছেই এ অঙ্গুলিমুদ্রাব বক্তব্য সোচ্চার। সংক্ষেপে বলতে পারি, ব্যঞ্জনানাম্য মণিবন্ধ, হাতের তালু ও কবাজুলি আজও ঐভাবেই মনের ভাব ব্যক্ত কবে--কখনও প্রার্থনায়, কখনও বাধাদানে, কখনও আমন্ত্রণে, কখনও সাস্তুনায়, কখনও বা সোহাগ জানাতে।

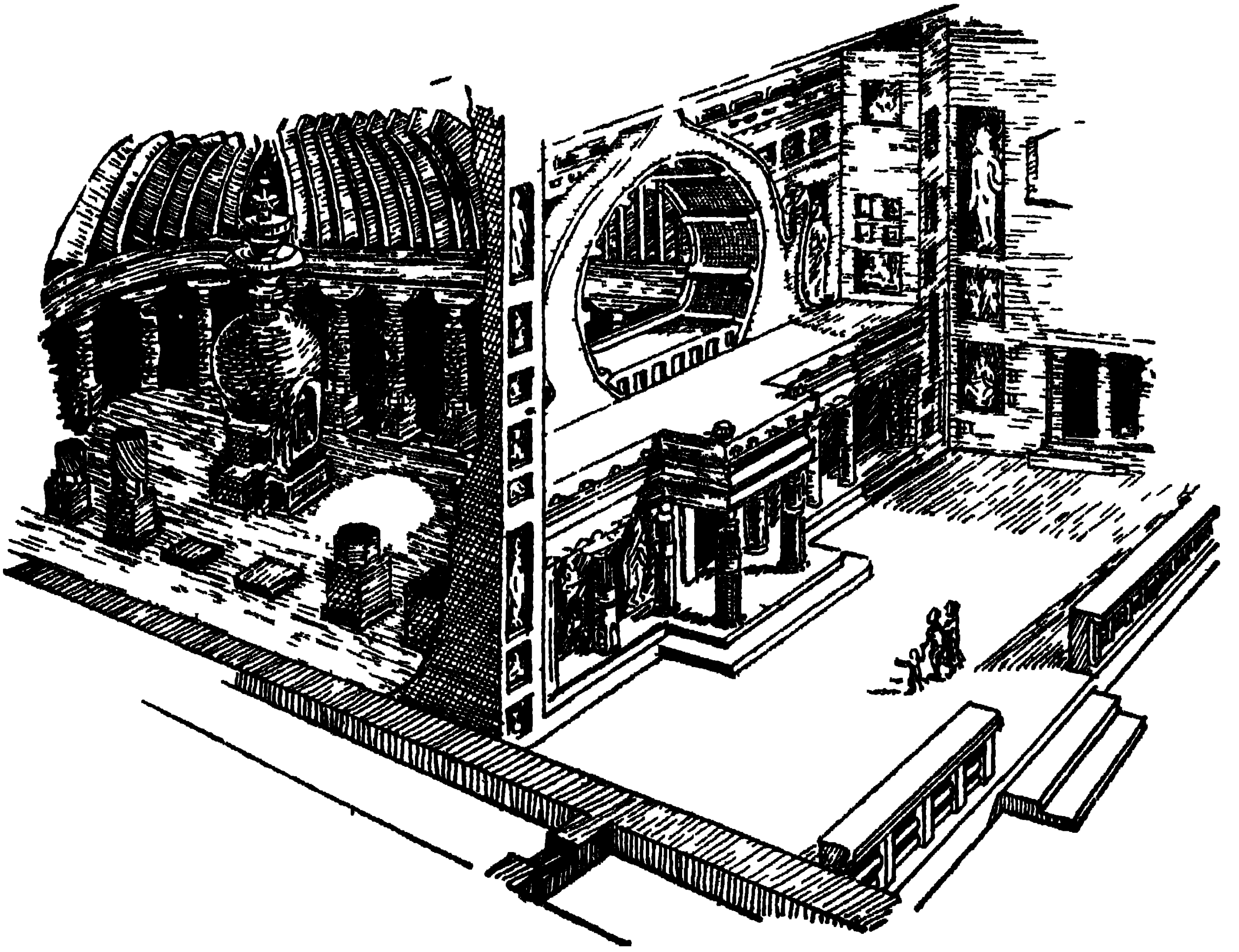
অজ্ঞতার বিভিন্ন চিত্র থেকে কয়েকটি হাতের মুদ্রা এখানে সংযোজিত কবেছি (চিত্র—৭৫-এ)।

সপ্তদশ গুহা দর্শনের পর আমবা আবার অবশিষ্ট গুহাগুলিতে পবিক্রমা শুরু কবতে পারি। অষ্টাদশ গুহায় দর্শনীয় বিশেষ কিছু নেই। ভগ্নাবস্থায় পাড আছে সেটি। এব পব অবস্থিত মহাযান-যুগের চৈত্যা উনবিংশতি গুহা।

উনবিংশতি শৃংখলা-চৈতোর দুটি চিত্র এখানে সন্নিবেশিত করা গেল। চিত্র—৭৬-এ সম্মুখের অংশ (ফাসাদ) এবং কিছুটা ভিতরের অংশ দেখা যাচ্ছে। এ-জগৎ কল্পনায় পর্বত-গাত্রেব খানিকটা অংশ অপসারিত করে নিতে হয়েছে। সূর্যগবাক্ষ-পথে ববিবশ্মি কেমনভাবে ভিতরে প্রবেশ করে, তাও দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিতরের হল-কামরাব বামদিকস্থ স্তম্ভগুলিকে জমির সমান্তরালে কল্পনায় কেটে ফেলা হয়েছে। তাতে দুটি সুবিধা হয়েছে।

উনবিংশতি বিহার

প্রথমতঃ, পিছনদিকে অবস্থিত স্থপটিকে আমবা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, দ্বিতীয়তঃ, স্তম্ভগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় কতিত হওয়ায় স্তম্ভেব গঠন-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সহজে ধারণা করা যাচ্ছে। অর্থাৎ, কোন অংশ চৌকোণা, কোন অংশ



চিত্র—৭৬

উনবিংশতি চৈতোর ফাসাদ ও অভ্যন্তরভাগ

গোলাকৃতি, কোথায় আটকোণা তা দেখা যাচ্ছে। স্তম্ভশীর্ষগুলিকে সংযুক্ত করে যে বীম বা কড়ি (আর্কিট্রেভ) আছে, সেটিকেও দেখা যাচ্ছে। আর সেই বীমেব উপর অবস্থিত সাবি সারি খিলান-আকারের বীম কিভাবে ছাদের ভার বহনের ভান করছে, তাও অস্বাভাবিক কল্পনা। আগেই বলেছি, স্তম্ভগুলি ছাদের ভার বহন করছে না। ফলে, স্তম্ভের উপর ঐ আর্কিট্রেভ এবং তার উপর অবস্থিত ঐ খিলানগুলির কেউই ছাদের ভার বহন করছে না।

কাঠের কাঠামো বা কফ ট্রাসেস অনুকরণে প্রস্তর-শিল্পী প্রথা-মার্কিন এগুলি খোদাই করে গেছেন মাত্র। মিঃ পার্সি ব্রাউন বলেছেন, ‘ওদের হাত ছেনি-হাতুড়িতে নিযুক্ত থাকলেও ওদের মনে বয়ে গেছে সেই আদিম কবাত-বাটালির যুগের স্মৃতি।’ আমার কিন্তু মনে হয় নি যে, সেইটিই একমাত্র কারণ। আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা বলে যে, কোন স্থাপত্য-কর্মের (engineering structure) ভাববহনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করলেই স্থপতিবিদের কর্তব্য শেষ হয় না,—তাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গৃহবাসীর মনে হয় যে, সেটি ভেঙে পড়বে না। গৃহবাসীর মানসিক শান্তির জন্য অনেক স্থপতিবিশিষ্ট আধুনিক বাড়ীর কাঠি-লিভার বাবান্দার নীচে বীমের (ভাববাহী নয়) আভাস দেখান। আমার মনে হব, অজস্রার স্থাপত্য-শিল্পী এই কারণেও এই স্তম্ভ ‘বামহণি’ খোদাই করেছিলেন।

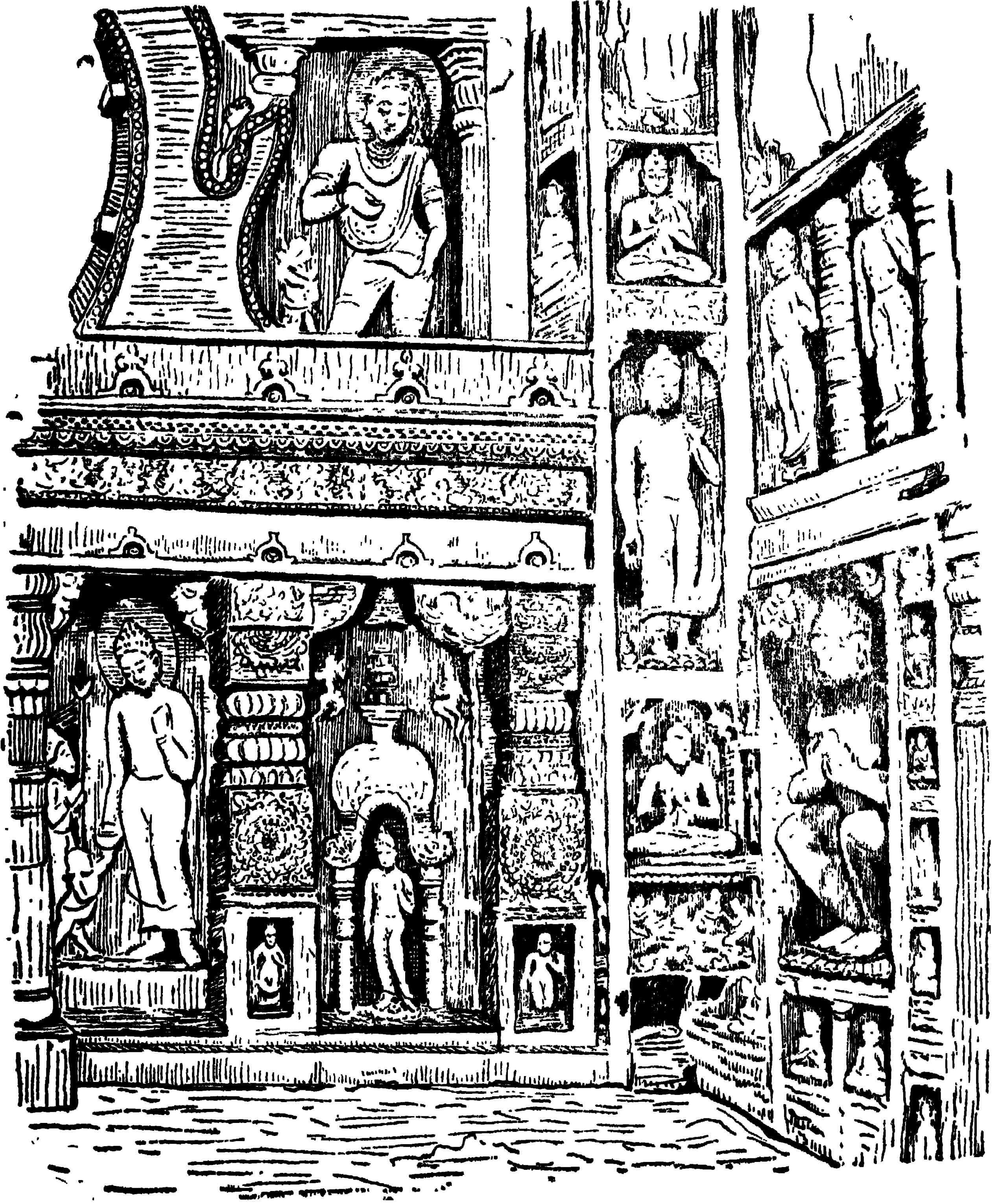
সে যাই হোক, আশা করি, প্রান ও এলিভেসানের বদল অথবা নিছক ফটোগ্রাফের পরিবর্তে এই কাল্পনিক চিত্রটির মাধ্যমে এই গৃহ-মন্দিরের স্বরূপটা ভাল বোঝা যাচ্ছে।

প্রবেশ-পথের আংশিক সম্মুখ-চিত্র দেখা হয়েছে চিত্র-৭৭-এ। আধখানা আঁকা হয়েছে ভাস্কর্যের খুঁটিনাটি ভাল করে বোঝাবার উদ্দেশ্যে। সূর্যগবাক্ষের একটু ইঙ্গিত হয়েছে উপরের দিকে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, চিত্র-৭৬-এর কোন অংশটি চিত্র-৭৭-এ বড় করে দেখানো হয়েছে।

উনবিংশতি চৈত্যের সম্মুখে যে পশ্চিম চকর, সেখানে সম্ভবতঃ পূর্বে আরও একটি প্রবেশ-তোরণ ছিল। বর্তমানে যেটি প্রবেশ-তোরণ তার সম্মুখে আছে একটি ছোট বাবান্দা, ইংরেজীতে যাকে বলে ‘পোর্টিকো’। তার দু’পাশে দুটি স্তম্ভ। চিত্র-৭৬-এ সে দুটিকে আমরা আগেই দেখেছি। পোর্টিকোর পূর্বে একটি আলন্দ, তার বাহিরের দিকে এক-সানি স্তম্ভ, ভিতরের দিকে পবিত্র-গাত্র খোদাই-করা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি। মাঝখানে প্রবেশ-পথের ঠিক উপরে অশ্বশূন্যকৃতি সূর্যগবাক্ষ। তার স্বরূপও আমরা ইতিপূর্বে (চিত্র-৪৭-এ) ভাল করে দেখেছি। প্রবেশ-পথ দিয়ে এবার গৃহ-চৈত্যের ভিতরে আসা গেল। দেখছি, দু’পাশে দুই-সানি স্তম্ভ, সবসময়ে পনেরটি। মাঝখানে, প্রবেশ-পথের বিপরীত প্রান্তে—স্তম্ভ। স্তম্ভশীর্ষে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ ও গন্ধর্বে মূর্তি খোদাই করা। স্তম্ভটির বর্ণনা ইতিপূর্বেই চিত্র-৫৬-এ করা হয়েছে। এ চৈত্যও কিছু কিছু চিত্র এক সময়ে ছিল, বর্তমানে কিছুই দেখা যায় না।

এবার প্রবেশ-পথের সম্মুখ-দৃশ্যটির, যাকে বলে গৃহ-চৈত্যের ‘ফাসাদ’, তার বর্ণনা করি। সূর্যগবাক্ষের দু’পাশে দুটি গন্ধর্ব-মূর্তি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, মূর্তি দুটি ভারসাম্য বা ‘সিমিট্রি’ বক্ষা করছে বাট। কিন্তু একটি অপবর্তিত ঠিক বিপরীত ভঙ্গি (mirror image) নয়। যে-কোন সাধারণ শিল্পী প্রতিসাম্যের খাতিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্থাপন একই বকম করতেন, এ-মূর্তি ডানদিকে হেলে থাকলে ও-মূর্তি বাঁদিকে হেলে থাকত, কিন্তু অজস্রার জ্ঞাত-শিল্পী তা করেন নি। আরও লক্ষণীয়, বাঁদিকের মূর্তিটি নাবীমূর্তি, অথচ ডানদিকের মূর্তিটি (যেটি চিত্র-৭৭-এ দেখা যাচ্ছে) পুরুষের। এই গন্ধর্ব-মূর্তিদ্বয়ের উপরে ও নীচে

জমির সমান্তরাল ছটি কড়ি (frieze)। সেখানে ছোট ছোট সূর্যগবাক্ষ-অনুসরণে অলঙ্করণ। তার নীচে, দক্ষিণদিকে (চিত্র—৭৭) দেখছি, একটি স্তূপের ভিতর দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি। চৈত্য-



চিত্র—৭৭

উনবিংশতি চৈত্যের ফাসাদের অংশ

অভ্যন্তরস্থ মূল স্তূপের সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুব বেশী। বৈসাদৃশ্যও বড় কম নয়। ভিতরের স্তূপে বুদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণ প্রতীসাম্য-মূলক (চিত্র—৫৬), অথচ এখানে তাঁর দক্ষিণহস্তে বরদানের ভঙ্গি

বামহস্ত বুকেব কাছে। হমিকাব পরিকল্পনাতেও বৈপবীত্য আছে। এই তুপ-বুদ্ধেব দু'পাশে দুটি অলঙ্কৃত অধ-স্তম্ভ বা পিলাস্টার। অধ-স্তম্ভেব ওপাশের কুলুঙ্গিতে দেখছি, বুদ্ধদেবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন যশোধরা ও রাজল। সপ্তদশ গুহাব শ্রেষ্ঠ চিত্র গোপা-রাজল ও বুদ্ধদেবেব (চিত্র—৬৭) সঙ্গে এই ভাস্কর্যটি তুলনীয়।

বস্তুতঃ, সমগ্র ফাসাদটি বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, নাগ, গন্ধর্ব, কিম্ব মূর্তিতে আগাগোড়া মোড়া। ফুল-সতা-পাতাব বাহাবই বা কত। সমস্ত কাককার্যই পাথব-কেটে কবা—ছেনি-হাতুড়িব চাতুর্য, বঙ-তুলিব নয়। মুগ্ধবিশ্বাসে দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায় আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। শেষ গুপ্তযুগেব শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্যেব অত্যন্ত নিদর্শন এই ফাসাদটি।

বিংশতি বিহাবটিব সম্মুখেও দুটি স্তম্ভ ও দুটি অধ-স্তম্ভ। অলিন্দেব ছাদে কাঠেব কড়ি-ববগাব অন্তবন। এই গুহায় বাবোটি গর্ভ-গুহা আছে। মূল গর্ভ-গুহায় আছে

দ্বিংশতি বিহাব
মুখ্যিঃ ধর্মচক্রমূত্রা, চরণতলে হবিন-শিশু। গর্ভ-গুহাব দক্ষিণে
কেটি খাদাই-ববা মতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাজা ও রানীব
মতি। বাণাব হাঃ চতুর্দশে একটি পাখা, বাজাব উপর তিনি দেহভাব তান্ত্র কবতে
উদাত্ত। তার চুল-বাধান কাগদটি লক্ষ্য কববাব মত।

একাবিংশতি বিহাবেব সম্মুখেও অলিন্দটি ভেঙে পড়েছে। তবু যে দুটি স্তম্ভ এখনও দাঁড়িয়ে আছে, তাঃ মতি সুন্দর নকশা কাটা কলকান কাজ দেখতে পাওয়া যায়। উপবেব 'যিঃ' নাগব দ্রঃ ও রানীব মতি খাদাই ববা হল-কামরাটি প্রায় বর্গক্ষেত্র। দৈর্ঘ্য ৫১ ফুট, প্রস্থ ৫১ ফাঃ সম্মুখে দ্বাদশটি স্তম্ভ, সেগুলিব অলঙ্করণ দ্বিতীয়

একবিংশতি বিহাব
বিহাবেব অন্তবন এই গুহাটিও শ্রোষ্ট্রান্তব ষষ্ঠ শতাব্দীতে
খাদিত গুহাব ভিত্তি চোদ্দটি গর্ভ-গুহা আছে, কেন্দ্রীয় গর্ভ-
মন্দিরে বুদ্ধমতি - পদ্মাসন, ধর্মচক্রমূত্রা।

দ্বাবিংশতি বিহাবটি মধ্য শতাব্দীঃ সম্মুখেও অলিন্দটি ভেঙে পড়েছে। দু'পাশে দুটি অধ-সমাপ্ত গর্ভ-গুহা। বেদ্য গর্ভ-গুহায় বসন্তপদ উপবিষ্ট বুদ্ধমতি। এই গুহাব

দক্ষিণ প্রাচীরে গুনবান একটি বুদ্ধমতি—পদ্মাসন, ধর্মচক্রমূত্রা।
দ্বাবিংশতি বিহাব
উপরে এক-দানি মাণ্ডমাবুদ্ধ। এই গুহায় কিছু কিছু প্রাচীর-চিত্রেব

নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে তার পালোদ্ধাব কবা অসম্ভব।

ত্রয়োবিংশতি বিহাবটিও সমসাময়িক। এখানে, অলিন্দে দেখতে পাচ্ছি কাককার্য-খচিত চারটি গুণকায় এবং দুটি অধকায় স্তম্ভ। সেগুলিব স্তম্ভমূল চতুর্দশ, মধ্য অংশ গোলাকাব, উপরে আমলক ও গ্রাবাকাস। আকাবে এটি একবিংশতি বিহাবেব প্রায়

সমান। এখানেও গুহাব অভ্যন্তরে দ্বাদশটি স্তম্ভ। বিহাবটি
ত্রয়োবিংশতি বিহাব
অসমাপ্ত। মূল গর্ভমন্দিরে কোন মতি নেই। সম্ভবতঃ, অসমাপ্ত
অবস্থায় এটি পবিত্যাক্ত হয়েছিল, মতিটিকে রূপায়িত কবাব পূর্বেই।

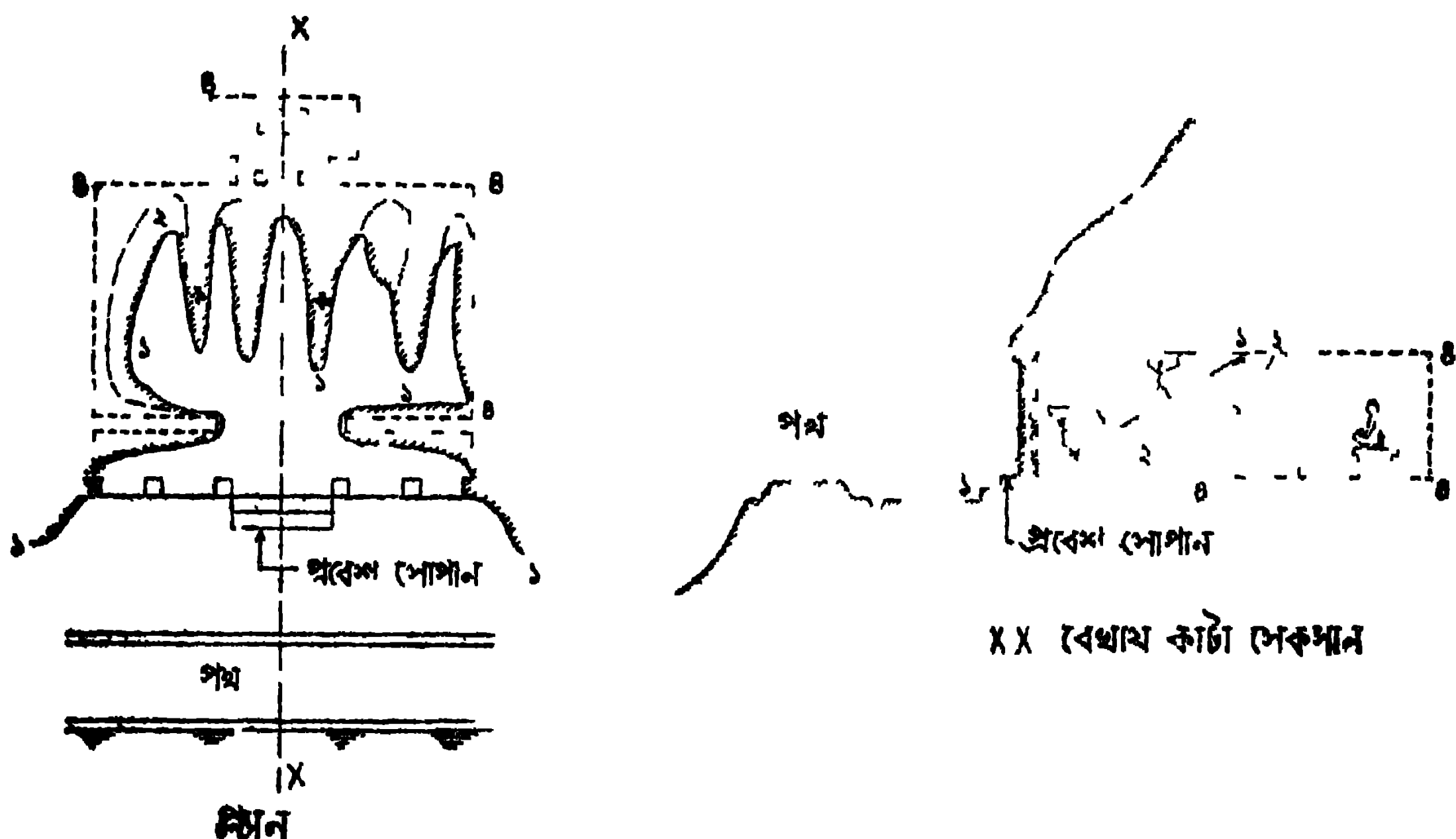
আপনি যদি ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক বা ঐ জাতীয় কিছু হন, তাহলে চতুর্বিংশতি

বিহারটিকে আপনি এড়িয়ে যেতে পাবেন। বস্তুতঃ, এ অসমাপ্ত বিহারে দর্শনীয় কিছুই নেই। কিন্তু বাস্তবিক অথবা স্থপতির দিকে যদি আপনার য়োক থাকে, তবে বলব চতুর্বিংশতি বিহারটি আপনার পক্ষে অবশ্যদ্রষ্টব্য।

চতুর্বিংশতি বিহার

কারণ, এটিকে ভালভাবে নিরীক্ষণ করলে আপনি বুঝতে পাববেন, কিভাবে বৌদ্ধ ভ্রমণের দল এই সারি সারি গুহা-মন্দিরগুলিকে রক্ষা করত কবেছিলেন। এই বিহারটি অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পরিত্যক্ত, কিন্তু শেষ হলে এটি হত অজস্রাব সর্ববৃহৎ বিহার - $৭৫ \times ৭৫'$ ।

কেমন করে এই গুহা-মন্দিরগুলি ক্রমশঃ খনন করা হত, তা বোঝানো ব চেষ্টা করা হয়েছে চিত্র—৭৮-এ। সাধারণ বাড়ীর কাজ শুরু হয় বনিয়াদ থেকে, শেষ হয় ছাদে। কিন্তু কৃত্রিম গুহাব কাজ শুরু হয় উপরদিকে এবং ক্রমশঃ শেষ হয় নীচে এসে। ইট-কাঠ-পাথরের বাড়ী ক্রমশঃ গড়ে ওঠে। সে হিসাবে কৃত্রিম গুহাব কাজ গড়ে 'নামে'! এখানেই খনন করা হয় স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশ, কৃত্রিম থাম ও সিলিং! চিত্র ৭৮-এ সেকুলার গলিভেসনে দেখাচ্ছি ১-১-১ রেখায় খনন করা হয়েছে। বস্তুতঃ, এই অবস্থাতেই কাজটি পরিত্যক্ত হয়। দেখা যাচ্ছে, কিভাবে সিলিং খোদাইয়ের নকশা করা হয়েছে ক্রমশঃ উপরের অংশ, স্তম্ভশীর্ষ, সিলিং, যাবতীয় নকশার তালিকা দেওয়া করা হয়েছে গেলে, তখন গুহাব গভীরতা বাড়ানো হত। অর্থাৎ, কাজটি পরিত্যক্ত না হলে, তবে ১-২-১ রেখায় খনন করা হত। এইভাবে ক্রমশঃ প্রগতি, ১-১-১ রেখায় খনন করা হত। ক্রমশঃ ১-২-১ রেখায় প্রগতি, ১-১-১ রেখায় খনন করা হত।



চিত্র ৭৮

গুহা কিভাবে খনন করা হয়েছিল

এবার চিত্র ৭৮-এ অঙ্কিত প্ল্যানটিকে দেখা যাবে। যে অবস্থায় গুহাটি পরিত্যক্ত হয়েছে, তাব প্ল্যান মোটা কালিতে আঁকা হয়েছে, ১-১-১ রেখায়। শেষ হলে গুহাটির প্ল্যান হত ৪-৪-৪ রেখায়। এখানে লক্ষণীয়, অসমাপ্ত অবস্থায় ক-চিহ্নিত কতকগুলি

প্ৰাচীৰ খোদাই কৰতে বাকী বৰে গেছে। প্ৰথম অবস্থায় এগুলি ইচ্ছা কৰেই খনন কৰা হত না। শেষ পৰ্যায়ে এই প্ৰাচীৰগুলি ভেঙে ফেলা হত। চতুৰ্বিংশতি হুহা অৰ্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় যখন পৰিতাক্ত হয়, তখনও এই প্ৰস্তর-প্ৰাচীৰগুলি ভেঙে ফেলা হয় নি। প্ৰথম অবস্থায় এই প্ৰাচীৰগুলি ছেঁড়ে যাওয়াৰ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। বিভিন্ন গলিপথে যখন শিল্পীৰ দল কাজ কৰা তখন, তখন একজন কাৰিগৰেৰ ছেনি-হাতুডিৰ আঘাতে ছিটকে-যাওয়া পাথৰেৰ ঢুকুৱায় যাত পান্ধবতী শিল্পী আহত না হন, তাই এ বাবস্থা।

পঞ্চবিংশতি বিহাৰটিতে এখন যাওয়াৰ নাস্তা নেই। এটি প্ৰায় পঁচিশ ফুট লম্বা ও চওড়া বৰ্গক্ষেত্ৰ। সম্মুখ-ভাগে তিনিটি প্ৰবেশ-দ্বাৰ ছিল। এটিও পঞ্চবিংশতি বিহাৰ অসমাপ্ত অবস্থায় পৰিতাক্ত।

ষড়বিংশতি হুহাটি একটি চৈত্ৰ। অজ্ঞায় নিৰ্মিত শেষ চৈত্ৰ, ষ্ট্ৰোভুৰ সপ্তম শতাব্দীতে নিৰ্মিত। ফাসাদেৰ সম্মুখে বিস্তীৰ্ণ চত্বৰ। সম্মুখস্থ তাম্ৰ ও পোটিকো-টি ভেঙে গেছে। ভিত্তি বা প্ৰস্তৰ অংশে এৰ-সাবি বামন মূৰ্তি খোদাই কৰা। ফাসাদেৰ বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন মূৰ্তিৰ দৃষ্টি খোদিত। চৈত্ৰ-গৰাণ্ণেৰ দু'পাশে দুটি

ষড়বিংশতি বিহাৰ উপবিষ্ট বুদ্ধমূৰ্তি। তাৰেৰ দু'পাশে দুটি বুদ্ধমূৰ্তি-বৰদামূৰ্তি।

তাৰেৰ দুই পাশে পুনৰায় দুটি বুদ্ধদায়ক বুদ্ধমূৰ্তি প্ৰায় বৃদ্ধি ফুট দীৰ্ঘ। চৈত্ৰ-গৰাণ্ণেৰ সৰসমেত হাটোৰটি স্তম্ভ জাতি প্ৰবেশ পথে দুটি গলদ্বাৰ-বহুল পাৰ্শ্বকান। স্তম্ভ স্তম্ভশীৰ্ষৰ বাকোটে সন্দৰ দুটি নাৰায়ণ। অনাগ্ৰা স্তম্ভগুলি এৰে স্তম্ভৰ, অন্যভাগ গোলাকৃতি, নকশা-কাটা ও পল-গোলা। শীৰ্ষদেশ আমলক, অধ-পাৰ্শ্ব মৰোপৰি দু-মুখা ব্ৰাহ্মণ। স্তম্ভেৰ উপৰেৰ বৰ্জটিত (যাক পাৰ্শ্বাত্ম ভাষাৰ বৰ্জ tufoium) বুদ্ধমূৰ্তি ও নানান প্ৰাণীৰ নকশা।

প্ৰৱেশ-দ্বাৰেৰ নিপনৌ দিগন্ত দৰ্শন মন ১১৬২ না উত্তিপূৰ্ণ কৰা হয়েছে (১৮০০-১৮১১)। প্ৰৱেশ দ্বাৰেৰ পৰা প্ৰৱেশ দ্বাৰেৰ পৰা ১০০০ দূৰত প্ৰৱেশ গাত্ৰে খোদিত। দ্বিতীয় হুহায় যে মহামানৱেৰ জন্মদশাটি দেৱে এসোছি, তাৰ মানৱ-স্বৰূপেৰ শেষগীতা ওখানে বিমূৰ্ত। বিশাল গাৰ দিক বাক প্ৰৱেশ-দ্বাৰেৰ যাবতীয় ভাস্কৰ্যেৰ মধ্যে এটি প্ৰথম বুদ্ধদেৱ তাৰ দক্ষিণ পাৰ্শ্ব পৰা বৰে পৰিও। পৰা দক্ষিণ-পশ্চিম মাথাৰ নীচে। মাথাৰ ভাবে উপাধানটি যেন স্তম্ভ বৰে গেছে। মহামানৱেৰ দেৱেৰ দুই প্ৰাণে দুটি শালবৃক্ষ। উপৰে এক-সাবি দেৱতাৰ মূৰ্তি তাৰা আনন্দ কৰাছেন, বাজ্যপ্ত বাজাচ্ছেন,

মহামানৱকে সমস্তানে স্বৰ্গে গান্ধৱান জানাও যেন নেমে এসেছেন বুদ্ধদেৱেৰ মণাপৰিনিবাণ আকাশপথে। বুদ্ধদেৱেৰ সম্মুখে দৰ্শকেৰ দিকে পিছন ফিৰে বসে

আছেন এক-সাবি ভক্ত। তাৰা বসেছেন ভূমিশয়ায়। তাৰা বেদনায় আধুত, রোক্তমান, শোকাহত। যে পালশে তিনি শয়ন কৰেছেন তাৰ কাছ নিৰ্বাপিত-শিখা দীপ-সমষ্টি একটি দীপাবাব এৰ কিছু ফুল ছড়ানো। মহামানৱেৰ পদপ্ৰাণে ভিক্ষু

আনন্দ । বুদ্ধদেবের কাছ থেকে শেষদান নিতে হচ্ছে তাঁকে—তাঁর ভিক্ষাপাত্র ও যষ্টি ।
দক্ষিণহস্তের তালুতে ভিক্ষু আনন্দ মাথা বোখেছেন, বিষাদখিন্ন মনোহত মূর্তি তাঁর ।

অত্যাশ্চর্য যত্ন নিয়ে অজস্র-শিল্পী এই মহান্ দৃশ্যপটটি রূপায়িত করেছেন। বুদ্ধদেবের পায়ের নখ থেকে দীপাধারটি পর্যন্ত সজীব ও সুন্দর। কিন্তু এ ভাস্কর্যের মূল আবেদন সামগ্রিক মহানুভবতায়।

কাল-হিয়ান তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে গৌতমবুদ্ধের মহানিবাণ প্রসঙ্গে বলেছেন :

কুশীনগৰেৰ উত্তৰে দুইটি শালবৃক্ষেৰ মধ্যৱৰ্তী স্থানে হিন্দাবতী (গঙক ৭) নদীতীৰে উত্তৰ দিকে মুখ কৰি এই যুগাবতাৰ মহাপৰিনিৰ্গণ লাভ কৰেন।

এখানে দেখছি ছুটি শালবৃক্ষ, দেখছি তিনি উদ্ভব দিকে মুখ কবেই শযে আছেন বটে।

এই চৈত্যে আবহ একটি ভাস্কর্যের নিদর্শন লক্ষণীয়। মাত্র কতক বুদ্ধদেবের তপস্যা-ভঙ্গের প্রচেষ্টা ও মাবের পবাজয়। একই বিষয়-বস্তু নিয়ে একটি দ্বন্দ্ব (অবস্থান ১১০) আমবা প্রথম গুহায় দেখে এসেছি। এখানে সেই দৃশ্যটি বড়-ছোট পদবিঃঃ ছেনি-শত্ৰুডিঃঃ ঢংকোণ। তপস্যাঃঃ বুদ্ধদেব নামে আছেন কল্পঃঃ, ভূমিঃঃমুদায়, (বাণিবুদ্ধ-

বুদ্ধ ও মান
 তলে। তার নাচে মা'বেব 'গুন বখা 'ক, ব'হা ও বঙ্গ, তাকে
 প্রলোভিত করছে। তা'দেব বস'নেব অ'ভা'হা ও 'ষ'ণেব প্র'চ'য

উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। তাদের সঙ্গে এসেছে আবু দুজান সহচরী। আবু দাউদও দণ্ডায়মান। মহাসন্ন্যাসীকে শত্রুসৈন্য চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, তাদের মধ্যে দুজন আবাব হস্তপৃষ্ঠে যুদ্ধ করছে। শিল্পী হযতে ওদের মধ্যে গিৰিমেখলবাহিনকে পুনরায় দেখাতে চেয়েছেন কাবণ, আবাব মানকে দেখা যাচ্ছে একই দৃশ্য, দলিলাদিও নক্সাদেও পদতাল-পরভূত মাঝ।

এই গুহা-চৈতব্য ভাস্কর্য পমাজ ফাঃ মন বলাউন- বনভুদবেব বহুদায়কন
মন্দিবেব ভাস্কর্যব সাজে এই ষড়বিংশাঃ গুহা-চৈতব্য অবস্থিত ভাস্কর্য নিদর্শনব সাদৃশ্য এক
বেশী যে, বশ নিশ্চিতভাবে নোনা যায় পশ্চিম-ত বঃ ম শিল্পাদিঃ মধ্যমঃ দায় বাক
কবেছিলেন।

এই গুহাব পৰ আৰও চাৰিটি গুহাব জাহ্নবী দেখাও পাওৱা গৈছে। সপ্তবিংশতি
বিহাবটিও অসমাপ্ত। অষ্টবিংশতি গুহাখন বৰ্ত্তমানে যাওয়া যায়
না। এটিও অসমাপ্ত অবস্থায় পৰিত্যক্ত হৈছিল। হয়তো শেষ
হলে এটিও একটি চৈত্যাব কপ নিত। ঊনত্রিংশতি বিহাবটিও

ছুৰ্গম । সেটি আমাৰ দেখা হয় নি ।

সপ্তবিংশতি—উন
ত্রিংশত বিহব

One of the most interesting results obtained from studying of the sculptures in this cave is the almost absolute certainty that the Great Temple of Borobuddor in Java was designed by artists from the West of India. The style of execution of the figure sculptures in the two temples resemble each other so nearly that we might almost fancy that they were carved by the same individual.

Cave Temples of India by Fergusson & Burgess. London, 1880.

ত্রিংশতি গুহা-মন্দিরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার একটি কাবণ আছে। অজস্কাব বিষয়ে যত প্রামাণিক গ্রন্থ আছে, তাতে এই গুহাটির উল্লেখ নেই। ফার্গুসন, বার্জেস, গ্রিফিথ, হ্যাবি হ্যাম এ-বিষয়ে নীবব, পাসি ব্রাউন-সাহেব তাব গ্রন্থেব^১ পৰিশিষ্টে অজস্কা-গুহাব যে কাল-নিদেশক সূচী দিয়েছেন, সেখানেও এ গুহাটির নামোল্লেখ নেই। তাব কাবণ এই যে, এই গুহাটি আবিষ্কৃত হযেছে মাত্র বছর দশেক আগে এব এক ঘটনাচক্রে।

১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দেব জানুয়ারি মাসে একদিন প্রবল বর্ষণে ষোড়শ বিহাবের সম্মুখস্থ পথটিতে একটি ধস নামান আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পাবত্যা পথটিকে রক্ষা কববাব উদ্দেশ্যে অতঃপর পুরাতত্ত্ব-বিভাগ একটি ধস-বোধী প্রাচীর (retaining wall) গেথে দেবাব ব্যবস্থা কবেন। এল ইট-বালি-সিমেন্ট। এই প্রাচীরেব বনিয়াদ খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ অতর্কিতে বেবিযে পড়ল এবটা ফাঁপা অংশ। কুলিব সন্দাব গিয়ে ধান পড়ল পুরাতত্ত্ব-বিভাগেব কমচারীকে বেট বার্ডিয়ে দিতে হাব, না হলে এদেব পড়তাব পোষাচ্ছে না।

ধমকে ওঠেন কমচারী এই দুদিন আগে তুমি নেট মেনে নিয়ে সহি দিয়েছ, আজ নেটে পোষাচ্ছে না বললে শুনব কেন?

হাত দুটি কচলে কুলি-সন্দাব বলে—তখন কি জানতাম গুজুব, ভিতবে অতবড় ফোকব? অতখানি ভবাট কবতে হবে।

আৎক ওঠেন কমচারী নি বললে? ফোকব .বাথায়

অবুস্থলে ছুটে গেলেন তিনি খবর .গল বড়ব ওব বাহে। হেড-অফিস থেকে ছুটে এলেন সবাই বহল পড়ে কুলি-সন্দাবেব দেয়াল গাথাব কাজ। শুক হয়ে গেল খনন-কায। একে একে দেব হায পড়ল একটি গুহা, একটি মপ এব সর্বশেষে আবিষ্কৃত হল একটি অপূব হীনযানী গুহা। অভ্যন্তরভাগ প্রায় .২ ফট বর্গক্ষেত্র। এখানে একটি

শিলালিপি পাওয়া গেছে আজও যাব পাঠ্যাকান কবা যায় নি।
নিশ্চিতি বিবাব

গুহাব কাচ্চ হীনযানী কাযদায় খোদিত দুটি প্রস্তব-শয্যা। সম্মুখ-ভাগে একটি অলিন্দও এককালে ছিল বলে অনুমান কবা যায়। এটি বিহাব না চৈত্য? গুপেব অস্তিত্ব বাল এটি চৈত্য, কিন্তু চতুর্দান পবিনল্পনা ও প্রস্তব-শয্যা ইঙ্গিত কবে এটি বিহাব। সম্মুখ-ভাগে একটি সুস্তেব গাঙ্গ নবন চৈত্যেব অমুকপ কয়েকটি অক্ষব খোদাই কবা।

সবচেয়ে আশ্চর্যেব কথা, এই গুহাব প্রবেশ-পথটি ১৯ ইঞ্চি লম্বা ইট দিয়ে বন্ধ কবা ছিল। কবে এটি বন্ধ কবা হয়েছিল? কেন নিঃসন্দেহে এটি হীনযানী যাবাব। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর, অর্থাৎ অজস্কাব প্রাচীনতম গুহাদলেব অন্তর্ভুক্ত। পববর্তী কালে এর ঠিক উপবেই ষোড়শ বিহাবটি খনন কবা হয়েছিল বলেই কি মহাযানী বৌদ্ধবা এব প্রবেশ-পথটি ইট দিয়ে বন্ধ কবে দিয়েছিলেন? কিন্তু তাহলে সমস্ত ফোকরটাই বা বন্ধ করেন নি কেন? ভিতরে ফাঁপা অংশ বেখে শুধু প্রবেশ-পথটাই বা বন্ধ কবলেন কেন?

ইতিহাস এ প্রশ্নেৰ আজও জবাব দেয নি।

অজন্তাবাসেৰ মেঘাদ আমাৰ শেষ হয়ে এল। যাৰাৰ দিন সকালে বসেছিলুম বাগাচা নদীৰ ধাৰে মীৰ্জা ইসমাইলেৰ সঙ্গে গুহা-মন্দিৰেৰ দ্বাৰ তখনও খোলে নি, শুক হয় নি যাত্ৰীদেৰ ভীড়। কথা প্ৰসঙ্গে ইসমাইল সাহেব বলেন—ইযাজদানী বলেছেন, The artist, to enhance the emotional effect of the scenes, has delineated Madhu with all the charms of youth and beauty which he could imagine

শুনে আমি বালছিলুম বোৰ কবি সেটাই একমাত্র কাব্য নহ। ককণ কাহিনীটিকে শ্ৰদযগ্ৰাহী কবাব উদ্দেশ্যেই শিল্পী মাদ্ৰীকে অপকণা সুন্দৰী কৰে চিত্ৰিত কৰেন নি। সম্ভৱতঃ কাব্যটি আৰও গভীৰে নিহিত।

উনি বলেন—কি বলম?

বলি -পালি ভাষা আমি জানি না, কাল বাএ মূল জাতকেৰ আঙ্গবিক অনুবাদ পড়ছি নুম। পড়ে আমাৰ মনে হাযছে, জাতককাৰ বিশ্বাস্তবেৰ মহানুভবতা প্ৰচাবে এতই মুখৰ যে, মাদ্ৰী-চবিত্ৰটিৰ অন্তৰ্গত বেদনাৰ কথা বলবাৰ সময় স্বতঃই স্বল্পভাষ হায পড়েছেন। মাদ্ৰীৰ প্ৰসঙ্গ সেখানে অতি অল্পই আছে।

ইসমাইল সাহেব হেসে বলেন—আপনি এ গল্প আপনাৰ বইয়ে লোকাৰ সময় নিশ্চয় জাতককাৰেৰ এ ক্ৰটি স শোণন কৰে নেবেন।

আমি বলি—কথাটা ঠিক হল না ইসমাইল সাহেব। জাতককাৰেৰ বসবোৰেৰ অৱস্থা প্ৰতি ইঙ্গিত কৰছি না আমি। মহৎ সাহিত্যেৰ বোৰ হয় এই লক্ষণ। আপনি বাংলা ভাষা জানেন না, না হলে একটা উদাহৰণ দিতুম। বাণভট্ট অথবা বাণমীকিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এ-জাতীয় অভিযোগ এনেছিলেন স্বয়ং বৰীন্দ্রনাথ। গত যুগেৰ মহাকাব্যৰ উপেক্ষা কৰা হাযে এ-যুগেৰ মহাকাব্য পত্ৰলেখা আৰু উৰ্মিলা চৰিত্ৰেৰ মৰ্যাদা মিটিয়া দিতে লেখনী বাৰণ কৰেছিলেন।

উনি বলেন—এখানে কি বলতে চাইছেন?

আমি বলতে চাই, জাতককাৰ মাদ্ৰী-চবিত্ৰটি চিত্ৰণে যে অবহেলা, যে উপেক্ষা দেখাযায, তাতে ক্ষুণ্ণ হাযেই অজন্তাৰ শিল্পী সেই কাব্যো-উপেক্ষিতাৰ আলেখ্য আঁকবাৰ সময় সৌন্দৰ্যেৰ পৰিপূৰকে মিটিয়ে দিতে চেয়েছেন মাদ্ৰীৰ অপ্ৰাপ্ত মৰ্যাদা।

ইসমাইল বলেন—তা তো বুঝলাম, কিন্তু অজন্তাৰ শিল্পী স্বয়ং যে চবিত্ৰটিৰ প্ৰতি অৱহেলা কৰেছেন, উপেক্ষা কৰেছেন, তাৰ মৰ্যাদা তাহলে কে মেটাবে?

কাৰ কথা বলছেন আপনি?

ভেবে দেখুন। নাগরানী সূমনা খুঁজে পেয়েছে চম্পয়্যরাজকে, মাদ্ৰী ফিবে

পেয়েছে তার স্বামীপুত্রকে, সীবলীর স্বপ্ন সার্থক হয়েছে পরজন্মে, মহাজনকের পুত্রকে জঠরে ধারণ করেছে সে। জন্ম-জন্মান্তরে বোধিসত্ত্ব এগিয়ে গেছেন পরম পরিণতির দিকে—শেষ জন্মে তিনি বুদ্ধ লাভ করেছেন, তাঁর মহাপরিনির্বাণ হয়েছে। কিন্তু বাবুজি, আমার যশোধরা মায়ের পরিণতি কি? অজ্ঞতা গুহার তাঁকে শেষবার দেখেছি কপিলাবস্তুর প্রাসাদ-তোরণে মহাভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে—জেনেছি তারপর উপেক্ষিতা অবহেলিতা রাজবধু নিদারুণ অভিমানে পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন পিতার কাছে, তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন পিতৃধন প্রার্থনা করতে। তাঁর সে ছেলে আর কিরে আসে নি! তাঁকে মূর্ত্যুহীন অবস্থায় রেখে রাজা শুদ্ধোধন ছুটে গিয়েছিলেন শ্মশ্রুধারামে। ব্যস্, তারপর তাঁর কথা বলতে ভুলেছেন শিল্পী! বাবুজি, আমি মুসলমান,—বুদ্ধদেবকে আমি মহামানব হিসাবে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার যশোধরা মাকেও কম শ্রদ্ধা করি না। অজ্ঞতার শিল্পীদের দেখা পেলে আমি বলতাম—গৌতমবুদ্ধের মহানুভবতা প্রচারে তুমি এতই মুগ্ধ যে, আমার মা-যশোধরার পরিণতি দেখাতে ভুলে গেলে তুমি!

আমি অবাক হয়ে দেখি, বলিরেখাক্রান্ত বুদ্ধের মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে! তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা পান্টাবার জন্য আমি বলি—আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন। ফর্দাপুর গ্রাম তো অজ্ঞতা গুহা থেকে মাত্র তিন মাইল। এ গ্রামে লোকজনের বাস নিশ্চয়ই তিন-চারশ' বছরের। অথচ ওরা জানত না এত কাছের এই গুহা-মন্দিরগুলির অস্তিত্ব?

মীর্জা ইসমাইল ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন নিজেকে, বলেন—ওরা জানত না ধরে নিচ্ছেন কেন?

—তাহলে বাইরের ছনিয়া এতবড় খবরটা জানতে পারল না কেন?

—জানবে কেমন করে? এটাকে তো ওরা মস্তবড় কোন খবর মনে করেনি। ওদের বিশ্বাস এ খুবই স্বাভাবিক। ক্যানিংহ্যাম সাহেব ফর্দাপুর গ্রামে খোঁজখবর করেছিলেন। গাঁওবুড়ো তাঁকে বলেছিল—ও গুহার কথা তো আমরা বরাবরই জানি। আমাদের খুড়ো-জ্যাঠা-বাপ-পিতামো সবাই জানত।

সাহেব কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—ওই গুহার মধ্যে অমন সব ছবি কারা ঐকে গেছে জানবার কৌতূহল হয় নি তোমাদের?

সাহেবের অনভিজ্ঞতার হেসেছিল গাঁওবুড়ো, বলেছিল—জানব না কেন? সবই তো জানি। ওগুলো তো ছবি নয়, ওগুলোর পিছনে মস্ত এক কাহিনী আছে।

অতঃপর গাঁওবুড়ো সাহেবকে শুনিয়েছিল সে ইতিকথা:

অনেক—অনেকদিন আগে—সে কত কুড়ি বছর আগেকার কথা তা বলতে পারব না; কিন্তু তখন আকাশের পাখী আর গাছ-পাখর-নদী-ফুল, সব মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারত। স্বর্গের দেবদেবীরা স্বর্গবাসের একঘেষে মিতে ক্লান্ত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে এসে ধর্না দিলেন একদিন, বললেন—প্রভু, একরাতের জন্য আমাদের মর্ত্যে গিয়ে বনভোজন করে আসবার অনুমতি দিন। ইন্দ্র বলেন,—তা যাও, কিন্তু হুঁশিয়ার! মনে

যেখ, সকালের আলো কোটার আগেই, প্রথম পাখীর ডাক শোনার আগেই, সকলকে স্বর্গে
কিরে আসতে হবে। তা না হ'লে স্বর্গের দরজা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু।
দেবদেবী-গন্ধর্ব-কিন্নর-অপ্সরার দল খুশীমাল হয়ে ওঠে। দলে দলে ওরা হাওয়ার ভেসে
ভেসে নেমে এল মর্ত্যে। এই বাগোড়া নদীর গুহাগুলি দেখতে পেয়ে তারা স্থির করে,
খেয়াল-খুশিতে এখানেই কাটিয়ে দেবে একটা পৌষালী ছুটির দিন। ওরা বাগোড়ায়
নেমে স্নান করে এল। গাছের শুকনো পাতা কুড়িয়ে এনে খিচুড়ি বানালো। মহা
আনন্দে কেটে গেল একটা দিন আর একটা রাত। কিন্তু গুহার অন্ধকারে ওরা ভুলে গেল
পূব-আকাশের দিকে নজর রাখতে। ওদের অজান্তে ক্রমে কর্ষা হয়ে এল পূব-আকাশ,
তারের ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে—অন্ধকার গুহার ভিতর ওরা জানতেও পারল না।
শেষ বেশ সবাইকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠল ভোরের কুকড়ো! বাস্! বন্ধ হয়ে গেল
স্বর্গের সোনার দরজা! আটক পড়ে গেলেন ওরা। যে যেখানে যেভাবে ছিলেন ঘন্টী
হয়ে পড়লেন গুহার দেওয়ালে—কেউ ছবি, কেউ শ্রেফ পাথর!

কাহিনী শেষ করে মীর্জা ইসমাইল বলেন—কী মূর্থ ছিল ওরা!

আমি বলি—এ গল্প শুনে কিন্তু ওদের মূর্থামির কথাটাই আমার সর্বাগ্রে মনে
পড়ে নি। আমি ভাবছিলাম—কী সুন্দর উপকথাটি। ভাবছিলাম, যদি ওদের মতো সরল
বিশ্বাসে এ কাহিনী মেনে নিতে পারতুম।

ক্র কুণ্ঠিত হয় ইসমাইল সাহেবের। বলেন—আপনি বিশ্বাস করতে চান এ
আষাঢ়ে গল্প?

বলি—ইসমাইল সাহেব, বিশ্বাস করি এ-কথা তো আমি বলি নি। কিন্তু এই
অজ্ঞতা-চিত্রের রসোপলব্ধির জন্য আপনি আমি তো অনায়াসে মেনে নিয়েছি—জন্মমাত্র
বিশ্বাস্তর মায়ের কাছে দানের সামগ্রী চায়, মেনে নিয়েছি বোধিসত্ত্বের সঙ্গে যুগীর মিলনে
ঋতুশ্রু পুত্রের জন্ম হতে পারে, স্বীকার করে নিয়েছি বড়দত্ত হস্তীর অস্তিত্ব, বিশ্বাস করেছি
সুতোসোম-জাতকের অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা। কিংবদন্তীটিকেও মেনে নিলে যদি
রসের রাজ্যে লাভবান হই, তবে একেই বা স্বীকার করে নেব না কেন?

অনেকক্ষণ ইসমাইল সাহেব কোন জবাব দিলেন না। তারপর দূর-দিগন্তের দিকে
তাকিয়ে বলতে থাকেন—বাবুজি, তাহলে আপনাকে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা বলি।
এ-কথা আজও কাউকে বলি নি—জানতুম কেউ বিশ্বাস করবে না। বলবে পাগলা বুড়োর
ক্যাপামি। আপনাকেও আমি এ-গল্প বিশ্বাস করতে বলছি না—মনে করুন এ-ও এক
আষাঢ়ে গল্প। দেখুন, একে মেনে নিলে যদি রসের রাজ্যে লাভবান হতে পারেন।

উপলব্ধুর বাগোড়া নদীর প্রবহমান স্রোতের দিকে তাকিয়ে অশ্রুমনস্কের মতো বৃদ্ধ
মীর্জা ইসমাইল অতঃপর বলতে থাকেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা:

এখানে যখন আমি প্রথম চাকরি নিয়ে আসি, তখন আমার জোয়ান ধরম। জাতক-
কাহিনীগুলি তখনও জানি না, মেজর গিল, গ্রীকিং, লেডী হেরিংহামের নামও শুনি নি।

তিনকূলে আমার কেউ নেই, কলে এখানেই পড়ে থাকতুম সারা বছর। ছবিগুলি দেখে আর সকলের মতো আমিও অবাক হয়েছিলুম প্রথমটায়। তারপর সহকর্মীদের মুখে একে একে শুনলুম জাতকের কাহিনীগুলি। আগে চিত্রের চরিত্রগুলিকে যে চোখে দেখতুম, এর পর থেকে অণু চোখে ওদের দেখতে শুরু করলুম। ওদের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের ভাগ নিতে শুরু করি সেই সময় থেকেই। প্রতিটি চিত্রের হাতী, বাঘ, হরিণ, রাজহংস, সাপ, পাহাড়, নদী—প্রতিটি অঙ্গুরী, কিয়র, গন্ধর্ব—জাতক-বর্ণিত নরনারীর সঙ্গে আমার মিতালি হল। ওদের ভালবেসে ফেলি ক্রমে। ছেলেবেলা থেকেই ছবি আঁকতে ভালো লাগত। সরকারী কাজের অবকাশে ওদের ছবি আঁকতে শুরু করি। পাতার পরে পাতা, খাতার পরে খাতা ভরে গেল ছবিতে। সবই পেন্সিল স্কেচ। একটা মানুষের জীবন তো বড় কম নয়, শেষে আর কপি করবার উপযুক্ত নতুন ছবি পাই না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই নতুন ছবির সন্ধানে।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটল যার ব্যাখ্যা আমি আজও দিতে পারি না। অনেকদিন আগেকার কথা, তবু সেদিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। সেটা ঘোর বর্ষাকাল। সেদিন একটিও যাত্রী আসে নি। আমার সহকর্মীরা কেউই আসে নি গুহা-মন্দিরে। সকাল থেকে বর্ষা হচ্ছে ক্রমাগত। তবু নেশার ঝাঁকে স্কেচ-বই বগলে আমি এসেছিলাম গুহায়। হঠাৎ প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হওয়ায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম দশ নম্বর গুহা-মন্দিরে। বসে আছি তো বসে আছি, বৃষ্টি ধামার নাম নেই, শেষে ক্লান্ত হয়ে পাথরের মেজেতে শুয়ে পড়ি। এ গুহায় কোন ছবি নেই। চারদিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু আঁকিবুঁকি। গত দেড়-দুশ' বছর ধরে নানান জাতের মানুষ নানান ভাষায় রেখে গেছে তাদের অপকীর্তির স্বাক্ষর। ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ি। নিশ্চয় দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি আমি—ঘুম ভাঙল একেবারে পড়ন্ত বেলায়। না, ঘুম ভাঙল বলাটা বোধ হয় ঠিক হল না। হয়তো ঘুম আমার সত্যিই ভাঙে নি—আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, ঘুম ভেঙে চম্কে উঠে বসেছি। ঘুমের ভিতর স্বপ্নই হ'ক, অথবা জাগরণেই হ'ক, দেখলাম আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—বর্ষার জলে উপলমুখর কলনাদিনী বাগোড়া অনর্গল প্রলাপ বকে চলেছে। এদিকে সূর্যগবাকের পথে বাঁকা হয়ে গুহার প্রবেশ করেছে এক ঝলক রোদ—পূবের দেওয়ালে পড়েছে সেই সোনালী আলো। হঠাৎ নজরে পড়ল, আমার সম্মুখে গুহার প্রাচীরের যে অংশটা অস্তসূর্যের স্পর্শে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেখানে সমস্ত প্রাচীর জুড়ে একটা বৃহদায়তন চিত্রাবলী। স্তম্ভিত হয়ে যাই আমি;—কী আশ্চর্য, এ ছবি তো কই আগে কখনও দেখি নি। শুধু তাই নয়, রঙে আর রেখায় এমন উজ্জ্বল ছবি তো অজস্তার কোথাও নজরে পড়ে নি আমার। স্তব্ধবিশ্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি তাকিয়ে থাকি সেই চিত্রটির দিকে। অদ্ভুত সেই প্যানেলটি বড় বড় হস্তিধ্বজের অরণ্য আবাস...রাজসভা...মূর্তীভূরা রানী...রানীর এলায়িত তনুকে ধরে আছেন রাজা...পার্বত্য...কিষ্কর...সস্তামগুপ! তন্ময় হয়ে দেখতে থাকি চিত্রগুলি। আমার চোখে যেন

পলক পড়ে না। ক্রমে তিল তিল করে অপসারিত হল অন্তঃসূর্যের শেষ আলোকরশ্মি। একেবারে নিভে গেল সন্ধ্যায়। দিগন্ত-জোড়া অন্ধকারে ঢেকে গেল বাগোড়া উপত্যকা।

ঠিক সেই সময়েই তন্ময় ভাবটা কেটে গেল আমার। যেন বাস্তবজগতে ফিরে এলাম ফের। অথবা বলতে পারেন ঠিক তখনই স্বপ্নদর্শন শেষ হল আমার। মোট কথা, বাহাজগৎ সম্বন্ধে সচেতন হওয়ামাত্র নজরে পড়ল গুহার ভিতরটা সম্পূর্ণ অন্ধকারের গর্ভে বিলীন। গুহামুখ থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশে ফুটে উঠেছে সপ্তর্ষির চিরন্তন জিজ্ঞাসা। পায়ে পায়ে চলে আসি নিজের ডেরায়। আচ্ছন্ন ভাবটা তখনও আছে কিন্তু। বাসায় ফিরে এসেই ফের বার করি স্কেচ-বই। গুহায় দেখা ছবিটি তখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। খাড়া করলুম সেখানা আমার ছবির খাতায় সারারাত জেগে।

পরদিন সকালে সহকর্মী বন্ধুকে সেখানি দেখাতে সে বলে—এখন থেকে কি অজ্ঞতা-স্টাইলে এমন মন-গড়া ছবিই আঁকবে?

আমি বলি মন-গড়া ছবি নয় ভাই, এ ছবি দশ নম্বর গুহার দেখে এঁকেছি।

বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বলে—মায়ের কাছে মাসীর গল্প? দশ নম্বর গুহা আমি চিনি না?

ওর সেই অটুহাসে যেন অভিজ্ঞান ফিরে আসে আমার। তাই তো! এ ছবি আমি কাল কেমন করে দেখলুম? বছর দশেক আছি অজ্ঞতায়—দশ নম্বরে যে কোন ছবি নেই তা আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে? তাহলে?

তখনই দৌড়ানুম দশ নম্বর গুহার দিকে। আশ্চর্য! সমস্ত দেওয়াল জুড়ে শুধু সারি সারি স্বাক্ষর! আঁকিঝুঁকি! দেবনাগরি, ইংরাজি, মারাঠি, ওড়িয়া। আমি কি তাহলে স্বপ্ন দেখেছি কাল? এত স্পষ্ট? বসে রইলুম সেখানে। সমস্ত দিন। সে দিনটি ছিল মেঘমুক্ত হাস্যকরোজ্জ্বল। যেন আমার দুর্দশা দেখে রুষ্টি-ধোওয়া গাছের পাতাগুলি ঝিক্‌মিক্‌ করে হাসছে। পড়ন্ত বেলায় ঠিক তেমনি করে সূর্যগবাক্ষের পথে বাঁকা হয়ে গুহা-মন্দিরে প্রবেশ করল অন্তঃসূর্যের কোঁতুহল; কিন্তু যেন আমাকে দেখে থমকে গেল। যেন সচেতন আমাকে দেখে প্রথামাফিক সে কর্তব্যকর্ম করে গেল শুধু—উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পূর্বপ্রাচীর। তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ জ্বালা করছে কিন্তু সেই আঁকিঝুঁকি ছাড়া কিছুই দেখতে পেলুম না। নিজের পাগলামিতে নিজের উপরেই বিরক্ত হয়ে উঠি ক্রমশঃ। তবু উঠে যেতে পারি না। ক্রমে তিল তিল করে সরে গেল সূর্যের শেষ আলো। মানুষের অত্যাচারে ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত মুখে পূর্বপ্রাচীর অন্ধকারের যবনিকা টেনে দিল।

মোহগ্রস্তের মতো ফিরে এলুম অস্নাত অভুক্ত একটি দিন ঐ গুহার ভিতর ব্যর্থ প্রতীক্ষায় কাটিয়ে। পরদিন, তার পরদিন—কিন্তু না, সে চিত্রটিকে আর দেখতে পেলুম না একবারও। মনকে বোঝাই স্বপ্নই দেখছিলুম তাহলে।

এই ধারণা নিয়েই খুলী হয়ে থাকতুম আমি; কিন্তু একটা ঘটনায় আবার গুলিয়ে গেল সব। প্রায় বছরখানেক পরের কথা। আঁকিওলজিকাল অফিস থেকে বড়সাহেব

এসেছেন কাজ পরিদর্শনে। আমাকে খুব স্নেহ করতেন; তিনি বলেন—কই ইসমাইল, কি কি নতুন ছবি আঁকলে ইতিমধ্যে? তাঁকে দেখাই আমার স্কেচ-বই। সেই ছবিখানি তাঁকে দেখাতেই বলেন—মেজর গিলের স্কেচ কোথায় পেলে হে?

আমি বলি—মেজর গিল কে?

সাহেব হেসে বলেন—যাঁর ছবি দেখে নকল করেছ এখানা।

আমি অবাক হয়ে বলি—এখানা কিসের ছবি?

—দশ নম্বর গুহার পূর্বপ্রাচীরে ষড়দন্ত-জাতকের ছবি। প্রায় একশ' বছর আগে এ ছবি অক্ষত অবস্থায় দেখেছিলেন মেজর গিল, কপি করেছিলেন তিনি। অফিসের আলমারি থেকে একটি প্রাচীন এ্যালবাম বার করে ছবিখানি দেখালেন আমাকে! স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি! কি আশ্চর্য! যে ছবি আমি এঁকেছি ছবছ সেই ছবি।

আমি কাউকে কিছু বলি নি! জানতুম, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না। ভাববে চালবাজি। ভাববে, মেজর গিলের ছবি দেখে নকল করে মিছে কথা বলছি আমি। কিন্তু কেমন যেন একটা নেশায় পেয়ে বসল আমাকে। মনে হল, অজন্ম গুহার এ চিত্রগুলি তো শুধু রঙ আর রেখায় আঁকা নয়—এ যে জন্ম-জন্মান্তরের সাধনার ফলশ্রুতি। বংশানুক্রমিক ভাবে বৌদ্ধ শ্রমণের দল ধ্যানের মগ্নে এদের পেয়েছিলেন—ধ্যানের জগতে এরা অবিনশ্বর। ধ্যানের জগতে খুঁজলে তাদের দেখা পাওয়া যায়। স্বপ্ন আমি দেখি নি—সেদিন ফোন্ মগ্নে জানি না আমি সূক্ষ্মশরীরে উপনীত হয়েছিলাম সহস্রাব্দীর ওপারে কোন একটি কালে! কয়েকটি খণ্ডমুহূর্তের জন্য আমার চৈতন্যময় সত্তা উপস্থিত হতে পেরেছিল সেই অতীত যুগে—প্রত্যক্ষ করেছিল রঙে ও রেখায় সমুজ্জল সত্তা-সমাপ্ত সেই ষড়দন্ত-জাতকের চিত্রটিকে! ধর্মে আমি মুসলমান—মূর্তিপূজায় আমি বিশ্বাস করি না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধ যে একজন মহামানব ছিলেন, এ-কথা তো মানি। আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা করি অজস্র শিল্পীকে। শিল্পীর কি জাত আছে? বিধর্মী বলে কি আমাকে কুপা করা হবে না?

তাই যদি হবে, তাহলে সেই অন্তিমূর্ত্য-উদ্ভাসিত সাক্ষ্য মুহূর্তে সহস্রাব্দীর যবনিকা কেন সরে গেল আমার দৃষ্টির সামনে থেকে?

অদ্ভুত এক পাগলামিতে পেয়ে বসল আমাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি বসে থাকি শূন্য দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে। মনে মনে বলতুম—হে অজ্ঞাতশক্তি, তুমি আমার দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে দাও এই মহাকালের যবনিকা, আমাকে দেখাতে দাও সেই হাজার বছর আগেকার চিত্র-সম্ভার! সহস্রাব্দীর ক্ষতচিহ্ন-লাঞ্ছিত এ ধ্বংসাবশেষ নয়, আমাকে দেখাও রঙে ও রেখায় সমুজ্জল সেই সত্তা-সমাপ্ত চিত্রাবলী। এই সময়েই বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি যোগাড় করে পড়তে শুরু করি। মিষ্টসিঁজম্ সম্বন্ধে যেখানে যা-কিছু লেখা হয়েছে খুঁজে পড়ি। ক্ষুধিতপাষণ গল্পটিও এই সময়ে পড়ি। রাত্রে বই পড়ি, আর দিনের বেলা বসে থাকি শূন্য প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে। দিন আসে, দিন যায়—কিন্তু আর একটি দিনের তরেও এমন কোন ঘটনা ঘটল না। আহার নাই, নিদ্রা নাই, শরীরের প্রতি যত্ন নাই—

পাগলের মতো আমি মগ্ন হয়ে রইলুম আমার সাধনায়। সহকর্মীরা এই সময়েই ধরে নিল আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে।

জানি এ আমার পাগলামি, তবু একদিন মনে হল কৃষ্ণ রাজকুমারীর চিত্রটিতে বেন অতি সূক্ষ্ম কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বেন কেউ আমার অলক্ষ্যে ওর ওষ্ঠপ্রান্তে, চোখের কোণায় দু-একটু তুলির সূক্ষ্ম টান দিয়ে গেছে। বিরহিণী কৃষ্ণ রাজকুমারীকে এতদিন দেখেছি বিবাহের প্রতিমারূপে—এখন মনে হল, তার দৃষ্টিতে লেগেছে কৌতুকের ছিটে, ওষ্ঠপ্রান্তে বেন ফুটে উঠেছে অশ্রুট হান্তরেখা। ও বেন এতদিনে একজন দোসর খুঁজে পেয়েছে। সেই দোসরও বেন এই অন্ধগুহায় ওরই মতো কিসের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণে চলেছে।

সহকর্মী বন্ধুকে বলি—কৃষ্ণ রাজকুমারীর আলেখ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ ইতিমধ্যে?

বন্ধু রাগ করে বলে—হ্যাঁ। রাজকুমারী নয়, রাজকুমারের। তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে।

তারপর আর একদিন। সেদিনও আকাশ জুড়ে নেমেছে পাহাড়ী বর্ষা। যাত্রীরা কেউ আসে নি। সহকর্মীরা কেউ বার হয় নি ঘর ছেড়ে। পূবরাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল তবু নেশার বোঁকে আমি এসে হাজির হনুম গুহা-মন্দিরে। প্রথম গুহাটিতে পৌঁছাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি একেবারে। ছুটির দিন, কাজ নেই। ঘরে বসে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে এই নির্জন গুহাই আমার ভালো। দেখছি চারদিকে চেয়ে চেয়ে—বুদ্ধের প্রলোভন চিত্র, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, চম্পেয়া-জাতক, যুযুধান ষণ্ডদ্বয়—দেখলুম চেয়ে কৃষ্ণ রাজকুমারীর দিকেও। যে যেমন ছিল সে তেমনি আছে—ভোরের কুকড়ো ডেকে ওঠায় বন্দী হয়ে পড়েছে সবাই। দেখে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে ছবিগুলো—শুধু ঐ কৃষ্ণ রাজকুমারীর ওষ্ঠপ্রান্তে বেন মনে হয় এসে লেগেছে অতি ক্ষীণ একটা কৌতুকের আভাস। না, ওষ্ঠপ্রান্তেও নয়—মেদিনী-নিবদ্ধ দৃষ্টির প্রান্তে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়াল নেই। ঘুম ভাঙল যখন তখন গভীর রাত। বাহিরের বর্ষণ থেমে গেছে, ছেঁড়া মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে শুক্লা ছাদশীর চাঁদ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে বাগোড়া উপত্যকা। অত্যন্ত দুর্বল লাগছে শরীর। উঠে বসব এমন শক্তি নেই। স্থির করি, বাকি রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দেব। আবার ঘুমিয়ে পড়ি আমি।

এই পর্যন্ত বলে মীর্জা ইসমাইল থামলেন।

আমি বলি—তারপর?

—বলছি; কিন্তু কিভাবে বললে আপনাকে বোঝাতে পারব তা বুঝে উঠতে পারছি না।

আমি অপেক্ষা করতে থাকি। একটু চুপ করে থেকে বললেন—না, স্বপ্নই দেখেছিলুম।

আবার উনি চুপ করে যেতে বলি—কি স্বপ্ন?

আমার প্রশ্ন ঠাঁর কানে গেল না। গল্পের পূত্র তুলে নিয়ে কের বলতে থাকেন—
সমস্ত দিন এ গুহার বসে বসে পেরেছি ভিজে-মাটির সঙ্গে মেশানো বন-তুলসী আর
মৌরীকুলের গন্ধ। মনে হল, এবার বেন তার সঙ্গে এসে মিশেছে ধূপ-ধুনো-অগুরু-চন্দনের
সৌগন্ধ। মনে হল, দশ নম্বর গুহার দিক থেকে ভেসে আসছে একটি ক্ষীণ সমবেত কণ্ঠের
প্রার্থনা সঙ্গীত। বেশ বুঝতে পারছি প্রবল অর এসেছে আমার। মাথাটা অত্যন্ত ভার,
সর্বান্তে বেদনা—কিন্তু সে বোধকে অতিক্রম করে অনুভব করছি কী যেন একটা অদ্ভুত
রূপান্তর ঘটছে আমার। অরতপ্ত ভূমিশ্যালীন এ দেহটি ত্যাগ করে আমি যেন অতীতের
যুগে ফিরে চলেছি উদ্ভ্রান্ত পথিকের মতো। ধীরে ধীরে চোখ মেলে উঠে বসি।

গুহার ভিতর দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে! তারই আলোর প্রতিকলিত হয়েছে
গুহাচিত্রগুলি। সেগুলির দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম আমি। সব যেন বদলে
গেছে! কী আশ্চর্য! সব চিত্রই স্থির, নিম্প্রাণ, অচল—কিন্তু তারা যেন পূর্ব মুহূর্তেই
সব সচল ছিল! যেন, আমি ষড়ক্ষণ ঘুমাচ্ছিলাম ততক্ষণ ওরা সঙ্গীত হয়ে পড়েছিল, যে
মুহূর্তটিতে চোখ মেলে তাকিয়েছি আমি, অমনি যে যেমন ছিল আবার স্থির হয়ে গেছে।
বুদ্ধের প্রলোভন চিত্রে দেখছি—মারের তিন কণ্ঠা লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফিরে যাচ্ছে—
শিব-জাতকে মহারাজ শিব তুলাদণ্ডটি নামিয়ে রেখেছেন ভূতলে, প্রণাম করছেন তিনি
ছদ্মবেশী ধর্মরাজকে। ষণ্ডহয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে, আবার খোস মেজাজে গায়ে-গা
দিয়ে শুয়ে আছে ওরা স্তম্ভশীর্ষে! আমার ঠিক সম্মুখে সেই কৃষ্ণ রাজকুমারীর অনবচ্ছ
চিত্রটি—কিন্তু তার সম্মুখবর্তিনী সেই অর্ধা-খালা-হাতে সহচরীটি অন্তর্হিত। সেখানে
দেখছি এক রাজপুত্রের চিত্র। তার মাথায় হীরা-পান্না-পোখরাজের মুকুট, তার কণ্ঠে
মুক্তার শতনরী। কৃষ্ণ রাজকুমারীর মূর্তি আর বিবাদখিন্ন নয়, পরমপ্রাণির আনন্দে
প্রোজ্জ্বল; তাঁর দৃষ্টি আর মেদিনী-নিবন্ধ নয়, সলজ্জে তিনি তাকিয়ে আছেন ঐ রাজপুত্রের
দিকে। রাজপুত্রের মুখাকৃতি মনে হল আমার অত্যন্ত পরিচিত। কোন্ গুহার কোন্
প্রাচীরের কোন্ মুখাকৃতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে মনে করতে পারছি না, অথচ মনে হচ্ছে
এ আমার অত্যন্ত চেনা, অত্যন্ত পরিচিত।

হঠাৎ অনুভব করি গুহার আমি একা নই। গুহার অপরপ্রান্তে কে একজন আমার
দিকে পিছন ফিরে ক্ষীণ দীপালোকে কি করছেন। এগিয়ে গেলুম তাঁর দিকে। স্পষ্ট
কিছুই দেখতে পেলুম না, তবু মনে হল, আমার দিকে পিছন ফিরে দেওয়ালে তুলির টান
দিচ্ছিলেন যিনি তাঁর পরিধানে গৈরিক কাষায়, তাঁর মস্তক মুণ্ডিত, তাঁর দেহ থেকে যেন
একটা অপাধিব জ্যোতিঃ বের হচ্ছে।

পদশব্দে যেন তিনি পিছন ফিরে তাকালেন, যেন ধ্যানভঙ্গ হল তাঁর। অহরত-
গোলা বাটি থেকে খানিকটা তরল রঙ পড়ে গেল মাটিতে।

আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম তাঁকে। নীরবে তিনি যেন একটি হাত কাড়িয়ে
দিলেন আমার মাথার উপর, আশীর্বাদের ভঙ্গিতে।

বলি—প্রভু, আপনাকে চিনেছি। আপনাকে প্রণাম !

স্মিত হাসলেন তিনি।

কি জানি কেন তাঁকে দেখেই আমার মনের মধ্যে জেগে উঠল সেই বিক্ষুব্ধ প্রশ্নটা। বললুম—আপনি আমাকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন প্রভু, তবু বলব, আপনার বিকল্পে আমার অভিযোগ আছে! শাস্ত্র সমাহিত দৃষ্টিতে কোতূহল ফুটে ওঠে।

আমি বলতে থাকি—সকলের পরিণতি আপনি দেখিয়েছেন, কিন্তু আমার যশোধরা মায়ের শেষ কথাটা বলতেই বা কেন ভুল হল আপনার? এমন মহিমময়ী মাতৃমূর্তির উপসংহার নেই কেন অজ্ঞাতায়? তিনি কি ক্ষোভে হুঃখে আত্মহত্যা করেছিলেন? তাই যদি করে থাকেন তো সে-কথাই বা বলে গেলেন না কেন আপনি?

একটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে দিয়ে তিনি আমাকে খামতে বললেন। ক্ষান্ত হলাম আমি। উনি উঠে দাঁড়ালেন, হাতের ইঙ্গিতে তিনি আমাকে আদেশ করলেন তাঁকে অনুসরণ করতে। জ্বরের উত্তাপে আমার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে, তবু অসীম আগ্রহে আমি টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম তাঁর পিছন পিছন। বাহিরে তখন আবার ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি নেমেছে। গাঢ় কালিমায় ঢেকে গেছে দিক দিগন্ত। অগ্রবর্তী পথপ্রদর্শককে আমি দেখতে পাচ্ছি না—তবু পদশব্দ লক্ষ্য করে মস্তমুগ্ধের মতো তাকে অনুসরণ করে চলেছি। মনে হচ্ছে কত মকপ্রাস্তুর, নদনদী অতিক্রম করে যুগ-যুগান্তর ধরে চলেছি আমরা দুজন। যেন সে চলার আর শেষ নেই।

সহসা অগ্রবর্তী বৌদ্ধ শ্রমণ শুরু হলেন। আমিও দাঁড়িয়ে পড়ি। এ কোথায় এসেছি? সহসা আকাশ বিদীর্ণ করে বিদ্যুৎ চমক দিল, সেই ক্ষণপ্রভার আলোয় দেখলুম আমরা এসে দাঁড়িয়ে আছি উর্বাংশতি গুহা মন্দিরের প্রবেশদ্বারে। বিদ্যুতের আলোয় দেখলুম অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন মহাশিল্পী—তিনি তাঁর দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে প্রবেশ-তোরণের একটি বিশেষ স্থান নির্দেশ করছেন। কী আছে ওখানে? পায়ে পায়ে আমি এগিয়ে গেলুম সেদিকে; কিন্তু ঘন মেঘে আধার হয়ে গেছে দিক দিগন্ত। নিরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। ঠিক তখনই সশব্দে বজ্রপাত হল কোথাও। আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ি পাষাণ বেদীতে। মীর্জা ইসমাইল আবার খামলেন।

আমি বলি—তারপর?

—তারপর আর কিছু নেই। বন্ধুদের কাছে শুনেছি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পরদিন সকালে তারা আমাকে আবিষ্কার করেছিল উনিশ নম্বর গুহার সামনে। এ-কথা জেনে-ছিলাম দু মাস পরে, আওরঙ্গাবাদ হাসপাতালে। ডবল নিমুনিয়া হয়েছিল আমার। বাঁচব এ আশা ছিল না।

বলি—অদ্ভুত গল্প তো?

ইসমাইল বলেন—হ্যাঁ নিছক আষাঢ়ে গল্প। কিন্তু বাবুজি, কদাপুরের গাঁওবুড়োর মতো যদি আমি বলি, এ কোন গল্প নয়, এ আমার জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা?

আমি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলি—সে তো বটেই। আপনি সতাই স্বপ্ন দেখেছিলেন সে বাত্রে, তবু বলব স্বপ্নটা বড় অদ্ভুত।

কিন্তু পৰদিন আনাকে ওবা অতদূরে ঐ উনিশ নম্বৰেব সামনে দেখতে পেল কি কবে? সেটা তো আৰ স্বপ্ন নয়?

—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। যুমেৰ ঘোৰে মানুষেব এবকম অনেকদূৰ হেঁটে যাওয়াব নজির আছে। তাকে বলে

বাধা দিয়ে উনি বলেন—জানি, সোমনামবলিসম্।

ঠাণ্ড পাছাডেব উপৰ থেকে, অৰ্থাৎ গুহা-সমতলেব পথ থেকে ক যেন আমাব নাম ধৰে ডাকল। উৰ্ব্বমুখে চেয়ে দেখি কুণ্ড-স্পেশালেব সেই মোসামশাই। যাঁব লোখাব বাৰ্থেব উপৰ আপাব বাৰ্থে উঠে উপবণ্ডালা-সাজাব আত্মপসাদ লাভ কৰেছিলাম, তিনিই এখানে আমাব কয়েকশ' ফুট উপবে উঠে ডাকছেন। অৰ্থাৎ কুণ্ড-স্পেশাল পৌছে গেছে ঐ তো মাসিমা, ঐ দেশপ্ৰিয় পাকেব নানিলী দাদি।

সংক্ষিপ্ত বিদায় জানাতে গেলুম ইসমাইল সাহেবেব

হেসে উনি বলেন, বাবুজি, গল্পটা আমাব শেষ হয়েছিল, বাৰি ছিল সামান্য উপসংহাৰ। কিন্তু তা আমি বলব না। শুধু এটুকু বলব, সৃষ্টি হয়ে আমি আবার এসে দাঁড়িয়েছিলুম সেই উনিশ নম্বৰ গুহাব প্ৰবেশপথে। কী দেখতে চেয়েছিলেন সেই মহান অজন্তা শিল্পী? নির্দেশিত মূৰ্তিটি খুঁজে পেতে কষ্ট হয় নি আমাব স্বপ্নই বলুন, আৰ গল্পই বলুন, আমাব এতদিনেব সমস্যাৰ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলুম ঠিকই।

কৌতূহলী হয়ে বলি—কী দেখেছিলেন বলুন তো?

—বাবুজি, আৰ দেবি কৰবেন না—ঐ দেখুন ওঁবা আপনাকে খুঁজছেন।

যুক্তকবে নমস্কাৰ কৰে বুদ্ধ ইসমাইল ধীবে ধীবে চলে গেলেন। আমি এলুম নিজেব দলে। ফকিব কুণ্ড বলেন, আপনাব পণ্যকট লাঞ্চ বয়ে বেড়াছি মশাই, খেয়ে নিন।

কিন্তু খাওয়াব কথা তখন কে শোনে। আমি হনহনিয়ে চলে আসি উনিশ নম্বৰ গুহাব প্ৰবেশপথে। নির্দেশিত মূৰ্তিটি খুঁজে বাব কবতে আমাবও খুব অসুবিধা হল না। প্ৰবেশপথেব ডানদিকে (চিত্র-৬১-ৰ বামপ্ৰান্তেব ঐকা মূৰ্তিটি) দেখলুম সেই বিলিফ কাজ। বুদ্ধদেব—গোপা ও বাহুল। আশ্চৰ্য, এ মূৰ্তিটিব যে বিশেষ বাঞ্ছনা তা তো আগে লক্ষ্য কৰি নি!

পৰিকল্পনা ঠিক সেই সপ্তদশ গুহাব বিশ্ব-বন্দিত স্ফেদ্রাটিব (চিত্র-৫৩) অন্তৰ্গত। প্ৰভেদ এই যে, সেটি প্ৰাচীৰচিত্ৰ, এটি পাথৰেব বিলিফ কাজ। তাৰও সামান্য একটি প্ৰভেদ আছে—সে পাৰ্থক্য এত ক্ষীণ যে মীৰ্জা ইসমাইল সাহেবেব বহুস্থ-ঘন ইঞ্জিতটুকু না জানা থাকলে নজবেই পড়ত না। মহাভিক্ষুব সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যশোধৰা আৰ বাহুল। ইতিপূৰ্বে দেখেছিলাম মা যশোধৰাব অন্তৰেব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মূৰ্ত্ত হয়েছিল তাঁব দুটি হাতেব কবাজুলিব মুদ্ৰায় (চিত্র-৫৪)। এবাব দেখছি, সন্তান সন্তকে জননীব মনে আৰ

কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নেই। বাহুলকে তিনি আর স্পর্শ কবে নেই। তাঁর দুটি হাত যুক্ত হয়েছে নমস্কাৰেৰ ভঙ্গিতে। গৌতমবুদ্ধ তাঁৰ কাছে আৰ গৃহত্যাগী যুববাজ নন—তিনি মহা-কাৰুণিক, মহাসত্ত্ব। এবাৰ কান পাতলে শুনে তে পাব তাঁৰ প্ৰাৰ্থনামন্ত্ৰ—“মহাকাৰুণিকো নাথো হিতায় সববপাণিনঃ প্ৰবেত্তা পানমী সব্বা পত্তো সম্বোধিমুক্তমম্ ॥”

ম' যশোধৰাৰ হাতে এবাৰ দেখাছি একটি সন্ন্যাসদণ্ড। ভিক্ষুণী হয়েছেন তিনি।

দণ্ডেৰ উপৰে ধৰ্মেৰ একটি নিশান। সন্ন্যাসদণ্ডেৰ শীৰ্ষে ত্ৰিশূলাকৃতি তিনটি ফলক। না, শৈব ত্ৰিশূল নয়। বৌদ্ধ ধৰ্মানুসাবে একে বলে ত্ৰিবল্ল। মুক্ত নীলাকাশেৰ দিকে নিৰ্দেশ কৰে ত্ৰিশূলেৰ তিনটি ফল। জানিয়ে দিছে সিদ্ধাৰ্থ-জায়া যশোধৰাৰ জীৱনেৰ উপসংহাৰ—বুদ্ধঃ শবঃ গচ্ছামি, ধৰ্মঃ শবণঃ গচ্ছামি। সঙ্ঘঃ শবণঃ গচ্ছামি।

*

*

*

*

ফেবাৰ পণে ভাবছিলুম তাজস্তাৰ অনেক-কিছুই দেখা হল, আৰাৰ অনেক-কিছুই বইল অজানা-অদেখা। মীৰ্জা ইসমাইলেৰ দীঘদিনেৰ সমস্যাৰ সমাধান তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন স্বপ্নে, কিন্তু আমাৰ মন এ স্বপ্নদিনে যে প্ৰশ্নটি জেগেছে তাৰ জবাব আমি খুঁজে পাই নি। কোন চিত্ৰটিৰ প্ৰেমে বুদ্ধ মীৰ্জা ইসমাইল পড়ে আছেন এই অজন্তাগুহায়। পাগলা মেহেবালিৰ মাতা আটকা পড়েছেন পাথৰে উদ্ভাস্ত প্ৰেমে। সে কি ঐ মদালসা কৃষ্ণা অপ্সৰা? সে কি সিবলী, সুমনা, নাগবালা হবান্দাতী, প্ৰসাধনবতা বাজকতা, নিবাববণা স্নানার্থিনী, অনিন্দ্যকান্তি মাদ্ৰী, মৰণাহতা জনপদল্যাগী? না কি সে ঐ প্ৰায় মুচে-যাওয়া কৃষ্ণা বাজকুমাবী? কৃষ্ণা অপ্সৰাকে দেখিয়ে তিনি বলেছিলেন মোহময়ী, মদালসা, মাদ্ৰীৰ প্ৰসঙ্গে অন্তৰোধ কৰেছিলেন আমাৰ গ্ৰন্থ যেন জাওকবাৰেৰ অবহেলাৰ প্ৰতিকাৰ কৰি, সীবলীৰ কথায় জানিয়েছিলেন—ৰূপ ছিল ঐ মন্দাগিণীৰ অভিলাষ। কিন্তু প্ৰতীক্ষাবতা কৃষ্ণাবাজকুমাবীৰ পসঙ্গে তিনি কিছু বলেছিলেন কি? জবেৰ ঘোৰে তিনি ঐ কৃষ্ণা বাজকুমাবীৰ সন্মুখে দেখেছিলেন একটি বাজকুমাবেৰ। বলেছিলেন, বাজপুত্ৰেৰ মুখাকৃতি ওঁৰ অতি পৰিচিত মনে হয়েছিল। কিন্তু কোন প্ৰাচীৰেৰ কোন চিত্ৰটিৰ সঙ্গে বাজপুত্ৰেৰ সাদৃশ্য আছে তা তিনি মনে কৰতে পাবেন নি। যে কথাটা তিনি স্বীকাৰ কৰেন নি সেটা কি এই যে, ঐ বাজপুত্ৰেৰ অতি-পৰিচিত মুখচ্ছবি ঐনি অজন্তাগুহাৰ কোন প্ৰাচীৰে দেখেন নি, দেখেছেন দৰ্পণে? জানি না।

অজন্তাৰ অনেক-কিছুই অল্পক্ৰ, গজাত, বহুশ্ৰম। এটুকুও অজানা বয়ে গেল আমাৰ কাছে। তা থাক। তব তপ্প আমি। এ কয়টি দিন অজানা অচেনা অতীত যুগেৰ বৌদ্ধ শ্ৰমদেৰ সঙ্গে হাসি-অশ্ৰু এ মহাসম্মানে হমেছি আৰ কেঁদেছি। বসেৰ অমৃতসমুদ্রে অবগাহনস্থান কৰেছি পৰমানন্দে। যাবাৰ বেলাত তাই খুলী মনেই বলে যাব—

এই ভালো আজ এ সঙ্কমে কাল্লাহাসিৰ গঙ্গা যমুনা

টেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভৰেছি, নিয়েছি বিদায়।

হে অপকপা অজন্তা। তোমাকে প্ৰণাম।

